ওডেসা ফাইল

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

ভাষান্তর / সৌরীন রায়

পরিবেশক / কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট । কলকাতা-১২

THE ODESSA FILE

By Frederick Forsyth

প্রথম প্রকাশ / নেতাজী জন্ম-জয়ন্তী ১৩৭২

পত্রপুট

প্রকাশিকা / সান্ত্বনা দে, ২।৩এ, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন। কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০১২

ব্লক / টাইপোগ্রাফিক আর্টস, ৫৪/১বি পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০০০৯

আমার দাদা
মণীন্দ্রমোহন রায়
ও
আমার ছোট ভাই
সোমেন রায়কে

পত্রপুট প্রকাশিত এই অনুবাদকের অন্যান্য বই

নেপথ্যে শ্বাপদ (আগাথা ক্রিস্টি)

আতঙ্ক, সেই সঙ্কেত (অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন)

শৃগালের শেষ প্রহর (ফ্রেডরিক ফরসাইথ)

অন্যতম অনুবাদক :

দি কার্পেটব্যাগার্স (হ্যারল্ড রবিন্স)

মূল রচনা :

ওয়াটারগেট কলঙ্ক

এক

১৯৬৩-র ২২শে নভেম্বরে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মৃত্যুসংবাদ যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিন সে সময় তাঁরা কোথায় কি করছিলেন। ডালাস-সময় অনুসারে ১২টা ২২-এ আঘাত হানা হয়েছিলো তাঁর ওপরে; তিনি যে মৃত সেই সংবাদ প্রচার হয়েছিলো সেই সময় অনুসারেই বেলা দেড়টায়। নিউইয়র্কে তখন আড়াইটে, লণ্ডনে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, আর হাম্বুর্গে এক হিম-ঠাণ্ডা তুষারবর্ষণরত রাত সাড়ে আটটা।

শহরের উপকণ্ঠ অডর্ফ থেকে মায়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলো পিটার মিলার। মা থাকেন আলাদা বাড়িতে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিয়ম করে পিটার গিয়ে তাঁকে দেখে আসে। তাতে সপ্তাহান্তে মায়ের কি প্রয়োজন সেটাও জেনে নেওয়া হয়, আবার সপ্তাহে একদিন করে মায়ের দেখাশোনা করবার কর্তব্যও পালন হয়। অবশ্য মায়ের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে পিটার হয়তো টেলিফোনেই তাঁর খবরাখবর নিতো। কিন্তু তা যখন নেই তখন তাকে গাড়ি নিয়েই যেতে হয়। মাও হয়তো সেইজন্যেই বাড়িতে টেলিফোন রাখেন না।

নিত্যদিনের মতো আজও তার গাড়ির রেডিও খোলা ছিলো। নর্থ ওয়েস্ট জার্মান বেতারকেন্দ্র থেকে বাজনার মূর্ছনা শুনতে শুনতে অডর্ফওয়েতে এসে পড়লো সে। বেশীক্ষণ হয়নি, সবে মিনিট দশেক হলো মায়ের ওখান থেকে রওনা হয়েছে। হঠাৎ কিন্তু তালভঙ্গ হলো···বাজনা থেমে গেছে। ব্যস্তত্রস্ত ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ফুটে উঠলো ঃ 'শুনুন, একটি জরুরী ঘোষণা; প্রেসিডেণ্ট কেনেডি মৃত।···আবার জানাচ্ছি, প্রেসিডেণ্ট কেনেডি মৃত।'

দারুণ চমকে রেডিওর দিকে তাকালো পিটার। ভুল স্টেশন ধরা নেই তো, যারা আজেবাজে গুজবটুজব ছড়ায়! নাঃ, ঠিকই আছে।

চাপা নিঃশ্বাস ফেলে ব্রেক চাপলো পিটার, "জিসাস্!"

ডান ধারে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে দেখে সম্মুখের গাড়িগুলো

একে একে পেছনের লাল আলো আরো উজ্জ্বল করে ছড়িয়ে ডান দিকের ফুটপাত ঘেঁষে আশ্রয় নিচ্ছে। যেন নিমেষের মধ্যে রেডিও শোনা আর গাড়ি চালানো ছুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন একটা করলে আর একটা সম্ভব নয়।

রেডিওতে হালকা বাজনার রেশমাত্র নেই। তার বদলে বাজছে গম্ভীর ফিউনরল্ মার্চ। মাঝে মাঝেই সেই বাজনা থামিয়ে দিয়ে টেলিপ্রিন্টারে সদ্য-আগত খবরের টুকরোগুলো সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে জানা গেলো…ছাতখোলা গাড়ি করে তাঁর ডালাস সিটি পরিভ্রমণ …স্কুল বুক ডিপসিটরির জানলায় রাইফেলধারী। কিন্তু গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ নেই।

মিলার নিজে একজন সাংবাদিক। তাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এই মুহূর্তে খবরের কাগজ অফিসে কি ভীষণ বিশৃঙ্খলা। চারদিকে নিশ্চয়ই দারুণ তাড়া। বিশেষ প্রভাতী সংস্করণ বের করতে হবে; শোক-বার্তা লিখতে হবে; বিশ্বের বড় বড় নেতারা যে সব শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন সেগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে টাইপসেট করতে হবে; স্থানীয় প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। তার ওপর আছে টেলিফোন, জ্যাম হয়ে গেছে লাইনগুলো, সবাই জানতে চায় আরো, আরো, আরো খবর।

মনে হলো দৈনিক সংবাদপত্রের অফিসের কাজটায় বহাল থাকলে ভালোই হতো। কিন্তু তিন বছর আগে সে পাট চুকে গেছে। তখন থেকেই সে ফ্রিল্যান্স। জার্মানীর আভ্যন্তরীণ সংবাদ আহরণ করে করে ফিচার লেখে; বিশেষ করে ক্রাইম, পুলিস এবং আণ্ডারওয়ার্লড নিয়ে। মা ওর এই পেশা কিন্তু মোটেই সুনজরে দেখেন না; যত সব বদলোকের সঙ্গে মেলামেশা। পিটার যতই তাঁকে বোঝাক যে আজ সে দেশের মধ্যে বেশ একজন নাম-করা অনুসন্ধানী-রিপোর্টার, মা কিছুতেই মানতে রাজী নন। রিপোর্টারের পেশা নাকি তাঁর ছেলের যুগ্যিই নয়।

রেডিওর সংবাদ শুনতে শুনতে তার মনে চকিতে নানা ভাবনা খেলে যায়। নতুন ধরনের কোন 'অ্যাঙ্গেল' পাওয়া যায় কি: জার্মানীর ভেতরেই যেটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নতুন কিছু লেখা যায়, মূল বিষয়টির পাশে

চিত্তাকর্ষক সংবাদ হয়ে উঠবে যেটা ?…বন সরকারের প্রতিক্রিয়া তো বন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধিরাই পাঠাবেন, কেনেডির গত জুন মাসে বার্লিন সফরের টুকরো টুকরো বিবরণ বার্লিন থেকে ওঁরা চয়ন করে জানাবেন। ভালো কোন সচিত্র ফিচারের কথাও মনে পড়ছে না যা আবার নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে জার্মান সচিত্র পত্রিকাগুলোকে বিক্রী করা যায়। ওরাই তো তার বড় খদ্দের।

জাগুয়ার গাড়ির নরম গদিতে পিঠ এলিয়ে মিলার আয়েস করে একটা রথ-হাণ্ডল সিগারেট ধরালো। কালো তামাকের বিশ্রী কটু গন্ধে গাড়ি ভরে গেলো। এই সিগারেট খাওয়ার জন্যেও তাকে মায়ের কম বকুনি শুনতে হয় না!…

রেডিও শুনতে শুনতে একসময়ে সিগারেট শেষ হলো। জানলার কাঁচ খুলে শেষটুকু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাটন টিপতেই এক্স-কে. ১৫০ এস. মডেল জাগুয়ারের ৩'৮ লিটার ইঞ্জিন গরগরিয়ে উঠলো। যেন খাঁচায় বন্ধ জাগুয়ারের নিরুদ্ধ আক্রোশ। হেডলাইট দুটো জ্বালিয়ে, চট্ করে পেছনে দেখে নিয়ে, অডফ´ওয়ের ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিকে গিয়ে মিশলো মিলার।

স্ট্রেসম্যান স্ট্র্যাসের মোড়ে ট্র্যাফিক লাইটের লাল আলো। থেমে পড়লো জাগুয়ার। দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কানে গেলো ওঁয়াও-ওঁয়াও-ওঁয়াও শব্দে সাইরেন বাজাতে বাজাতে পেছন থেকে এসে একটা অ্যাম্বুলেন্স লাল আলোর সামনে দিয়ে ডান দিক ঘুরে ডেইমলার স্ট্র্যাসে ছুটে গেলো। মিলারের যেন হঠাৎ কি মনে হলো, তার জাগুয়ারও সে চালিয়ে দিলো অ্যাম্বুলেন্সের পিছে পিছে কুড়ি মিটার ব্যবধান রেখে।

তখনই মনে হয়েছিলো, এ কি পাগলামি, সিধে বাড়ি ফিরলেই হতো। কিন্তু কিছু কি বলা যায়! অ্যাম্বুলেন্স মানেই বিপদ, আর বিপদের পেছনে হয়তো থাকবে কোন সংবাদ। অকুস্থলে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর পায় কে! স্টাফ-রিপোর্টারেরা তো যখন আসেন তখন সব সাফসাফাই হয়ে যায়। হয়তো রাস্তায় মস্তবড় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বা জাহাজ-ঘাটে ভীষণ আগুন, কিংবা হয়তো কোন দালানটালান পুড়ছে যার ভেতরে রয়ে গেছে কোন শিশু। গাড়ির গ্লোব-কম্পার্টমেণ্টে সব সময়েই

তার ছোট্ট ইয়াশিকা ক্যামেরাটাও রাখা থাকে ফ্ল্যাশসুদ্ধু। চোখের সামনে কখন কি ঘটে যায়, কে বলতে পারে!

সরু সরু বিশ্রী রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে আল্টনা রেলওয়ে স্টেশনকে বাঁ ধারে রেখে নদীর দিকে এগুলো অ্যাম্বুলেন্স। উঁচু ছাতওলা মার্সিডিজ গাড়ি। বোঝা যাচ্ছে গোটা হাম্বুর্গ শহরের রাস্তাঘাট তার ড্রাইভারের নখ-দর্পণে। পাকা হাতও বটে লোকটার, কারণ জাগুয়ারের মতো অত শক্তিমান এবং সুদৃঢ় সাসপেনশনের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিলার বেশ টের পাচ্ছিলো যে বৃষ্টিভেজা নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে যেতে যেতে তার গাড়ির পেছনের চাকা দুটো প্রায়ই পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

মেঙ্কের অটোপার্টসের গুদামের পাশ দিয়ে দুটো আরো রাস্তা পেরিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালো। নোংরা পাড়া। গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে বাঁকা রেখায়। রাস্তায় যেটুকু আলো আছে তাও এখন ঝাপসা। দু ধারে খোপ খোপ জীর্ণ কোঠাবাড়ি। যেখানটায় এসে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়ালো, সেখানে ইতিমধ্যেই পুলিসের একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার ছাতের নীল আলোটা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ভূতুড়ে ছায়া ফেলছে দরজার পাশে জমে থাকা ভিড়টার ওপর।

লম্বা-চওড়া একজন দীর্ঘদেহ পুলিস, গায়ে বর্ষাতি, ভিড়টাকে ধমক দিয়ে সরে যেতে বললো, যাতে অ্যাম্বুলেন্স বাড়িটার দরজার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। মার্সিডিজটা তখন দরজার ফোকরের সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ড্রাইভার ও আর একজন অনুচর গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নেমে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিক দিয়ে উঠে একটা খালি স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এলো। সার্জেন্টের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তারা দুজনেই দুদ্দাড় করে ওপরতলায় চললো।

প্রায় বিশ গজ আগে উল্টো পাশে তার জাগুয়ার থামিয়ে মিলার পারি-পার্শ্বিক বোঝবার চেষ্টা করে। দালানফালানও পড়ে যায়নি, আগুনও না, বিপদের বেড়াজালেও কোন শিশু আটকা পড়েনি। হয়তো নিতান্তই কোন হার্ট অ্যাটাক। গাড়ি থেকে নেমে ঢিলেঢালাভাবে হাঁটতে হাঁটতে মিলার ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সার্জেন্টের কড়া হুকুমে বাড়িটার

দোর থেকে প্রায় অর্ধবৃত্ত হয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো। দরজা থেকে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিকে যাবার পথটা ফাঁকা।

মিলার শুধোলো, "ওপরে গেলে আপত্তি আছে ?"

"একশো বার আছে। আপনাকে তো কেউ ডাকেনি মশায়।"

"আমি প্রেস," হাম্বুর্গ সিটির প্রেসকার্ডটা উঁচিয়ে ধরে মিলার।

"আর আমি পুলিস," সার্জেন্টটা উল্টো ঝাড়ে, "কেউ ওপরে যাবে না। একে তো সরু সিঁড়ি তায় আবার নড়বড় করছে। অ্যাম্বুলেন্সের লোকগুলো এক্ষুণি নীচে নেমে আসবে।"

যেমন বিশাল দেহ সার্জেন্টের তেমনি মেজাজ। ওকে টপকায় সাধ্য কার!

"কি হয়েছে ?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"উঁহুঁ, কোন বিবৃতি দিতে পারবো না। পরে থানায় খোঁজ নেবেন।"

সাদা পোশাক পরা একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজায় এসে দাঁড়ালো। ফোকসওয়াগেন পুলিস-গাড়িটার ঘূর্ণ্যমান আলোর রেখা এসে তার মুখে পড়তেই মিলার চিনতে পারে। এককালে তারই সহপাঠী ছিলো, হাম্বুর্গ সেনট্রাল হাই স্কুলে। এখন হাম্বুর্গ পুলিসে কাজ করে, জুনিয়র ডিটেক্‌টিভ ইন্সপেক্টর, কর্মস্থল আল্‌টনা সেনট্রাল থানা।

"এই, কার্ল!"

নাম ধরে কে ডাকছে শুনে ইন্সপেক্টর মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। পুলিস-গাড়ির আলো আবার ঘুরে আসতেই দেখতে পেলো মিলার দাঁড়িয়ে রয়েছে হাত উঁচু করে। বন্ধুকে দেখেই হাসির রেখা ফুটে উঠলো মুখে, খানিকটা আনন্দে আবার খানিকটা বা বিরক্তিতে। সার্জেন্টের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠলো, "ঠিক আছে সার্জেন্ট, ও নিতান্তই গোবেচারা।"

সার্জেন্ট দরজা থেকে হাত নামায়। সঙ্গে সঙ্গে সাঁত করে মিলার ভেতরে ঢুকে গেলো। কার্ল ব্রাণ্ডটের হাত ধরে কষে ঝাঁকানি দিয়ে দিলো একটা।

"তুই এখানে কি করছিস ?"

"অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে পেছনে চলে এলাম।"

"শালা শকুনি! করিস কি আজকাল ?"

"ওই সেই কর্ম, খুঁটি ছাড়া সাংবাদিক।"

"হুঁ···দেখেই বুঝেছি খাসা আছিস। ছবির ম্যাগাজিনগুলোতে তো প্রায় হামেসাই তোর নাম দেখি।"

"জীবিকা, বুঝলি।···কেনেডির খবর শুনেছিস?"

"হ্যাঁ···ভয়ঙ্কর কাণ্ড! ডালাস শহর তোলপাড় করে ফেলেছে এতক্ষণে। ভাগ্যি আমার এলাকায় হয়নি!"

বাড়িটার সামনের ঘরের দিকে মিলার ঘাড় ঢুকিয়ে দিলো। ন্যাংটো একটা বাল্ব থেকে নিষ্প্রভ আলো এসে দেওয়ালের কুঁকড়ে যাওয়া ওয়াল-পেপারে হলুদ আভা ছড়িয়েছে।

"আত্মহত্যার কেস, গ্যাসে। দরজার তলা দিয়ে গন্ধ আসাতে, পড়শীরা আমাদের খবর দিয়েছে। কেউ দেশলাই জ্বালায়নি ভাগ্যি, সমস্ত জায়গাটা একেবারে গ্যাসে ভরে ছিলো।"

"ফিল্ম-স্টার নয়তো?" মিলার শুধোয়।

"হ্যাঁ, এই সব জায়গায় তো ওনারাই থাকেন!···ধুর, নেহাতই একটা বুড়ো লোক। অ্যাদ্দিন মরেই ছিলো। আজ নতুন করে সত্যি সত্যিই মরলো। রোজ রাত্তিরেই এরকম এক-আধটা কাণ্ড ঘটে।"

"তা বুড়োটা মরে যেখানেই যাক না, এখানকার চেয়ে কিছু খারাপ অবস্থায় থাকবে না, কি বল্?"

ইন্সপেক্টর হাসলো শুধু। সিঁড়িতে খচমচ শব্দ হতেই মুখ ঘুরিয়ে দেখলো স্ট্রেচার নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের লোক দুটো নামছে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ে, "জায়গা ছেড়ে,···জায়গা ছেড়ে,···ওরা নামছে।"

সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টাকে ঠেলে আরো একটু দূরে সরিয়ে দেয়। অ্যাম্বুলেন্সের লোক দুটো রাস্তায় এসে পড়লো, মার্সিডিজের পেছন দিকে চললো তারা। ব্রাণ্ডট ওদের পিছু পিছু এগুতে মিলারও সেদিকে যায়। মরা মানুষটাকে দেখবার ওর কোনই আগ্রহ ছিলো না, শুধু ব্রাণ্ডটকে ও নীরবে অনুসরণ করতে গেলো মাত্র। অ্যাম্বুলেন্সের প্রথম লোকটা গাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে স্ট্রেচারের সম্মুখভাগটা মেঝের ওপর রাখতেই, দ্বিতীয়জন ওটা ভেতরে ঠেলে দিতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাণ্ডট হাঁই হাঁই করে উঠলো, "দাঁড়াও, দাঁড়াও।" মরা লোকটার মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে

দিতে দিতে কাঁধের ওপর দিয়ে মিলারকে বললো, "নিয়মরক্ষা, বুঝলি। রিপোর্টে তো লিখতে হবে যে শবদেহ নিয়ে আমি অ্যাম্বুলেন্সে গিয়েছিলাম, তারপর মর্গে।"

মার্সিডিজের ভেতরে আলোটা উজ্জ্বল। আত্মঘাতী লোকটার মুখের ওপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেকেণ্ড তুয়েকের জন্যে। দেখেই মনে হলো এমন কুৎসিত বৃদ্ধ মুখ এর আগে কখনো দেখিনি। গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় অবশ্য চামড়া কুঁচকে গেছে, ঠোঁটে নীলচে রঙ লেগেছে, তবুও লোকটা যখন বেঁচে ছিলো তখনো নিশ্চয়ই কিছু সুদর্শন ছিলো না। শুধু কয়েকটা লম্বা চুল মাথায় সেঁটে আছে, তা বাদে মাথাটা একেবারে ন্যাড়া-মুড়ো। চোখ তুটো বন্ধ। মুখটা শুকনো আমসি। বাঁধানো দাঁতের পাটি তুটো না থাকায় তু গালে গভীর গর্ত, একেবারে মুখের ভেতর অবধি। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেন বিভীষিকা ফিল্মের কোন প্রেত। ঠোঁট তুটো যেন নেই-ই, তায় আবার তুটোতেই লম্বালম্বি ভাঁজ। দেখেই মিলারের মনে পড়লো একবার সে আমাজন অববাহিকায় প্রাপ্ত একটা কুঁকড়ে যাওয়া নরমুণ্ড দেখেছিলো, যেটায় স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা ঠোঁট তুটো জুড়ে লম্বালম্বি সেলাই দিয়ে দিয়েছিলো।...সবচেয়ে বীভৎস হলো লোকটার মুখের তু পাশে রগের কাছ থেকে মুখ পর্যন্ত তুটো লম্বা গভীর করে টানা ক্ষতচিহ্ন।

চট্ করে একবার মৃতদেহের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ব্রাণ্ডট আবার কম্বল টেনে দিলো লাশটার মুখে। অ্যাম্বুলেন্সের লোকটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়তেই, সে স্ট্রেচারটাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে, দরজা লক করে ঘুরে গিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসলো। অ্যাম্বুলেন্স রওনা দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও পাতলা হয়ে এলো। যারা তখনো দাঁড়িয়েছিলো তাদের দিকে চেয়ে সার্জেণ্ট হাতটাত নেড়ে হুঙ্কার ছাড়লো ঃ "যাও এখন...সব খতম।...বাড়ি-ফাড়ি নেই তোমাদের ?"

ব্রাণ্ডটের দিকে তাকিয়ে মিলার ভুরুজোড়া উঁচিয়ে তুললো।

"অপূর্ব।"

"হুঁ, ঘাটের মড়া !...যাক, তোর কোন লাভ হলো না।"

"নাঃ, কিস্সু না। তুই-ই তো বললি রোজ রাত্তিরেই এমন এক-আধটা

পাওয়া যায়, তবে ? আজ রাতে তো কেউ এদের লক্ষ্যই করবে না, কেনেডি মরেছে না ?"

ইন্সপেক্টর ব্রাণ্ডট হাসে, তামাশার হাসি।

"তোরা, কাগজওলারা একেবারেই পাষণ্ড !"

"না, তুই-ই বল্ ? কেনেডির মৃত্যুসংবাদ লোকে পড়বে, না এর মরার খবরটা ? পয়সা দিয়ে তো তারা কাগজ কেনে।"

"হ্যাঁ, তা সত্যি। আচ্ছা, আমি এখন থানায় চললাম। পরে দেখা হবে, পিটার।"

দুজনে হাত মিলিয়ে যে যার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলো। মিলার আল্টনা স্টেশনে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বড় রাস্তা ধরে জাগুয়ার চালিয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছলো হান্সা স্কোয়ারে। এখানেই ওর গাড়ি রাখার গ্যারেজ, মাটির নীচে। আরো দুশো গজ দূরে একটা অট্টালিকার ছাতে ওর ভাড়াটে ফ্ল্যাট।

পুরো শীতকালটা ভূতল গ্যারেজে গাড়ি রাখতে হলে বহু টাকা লাগে। তবু পিটার কিন্তু এই বড়লোকিটুকু ছাড়ে না, যেমন ছাড়ে না বেশি ভাড়ার ওই ফ্ল্যাটটা। ঘরটা ওর ভীষণ পছন্দ, অত উঁচু থেকে স্টাইণ্ড্যামের জনবহুল বুলেভাটা কি সুন্দর দেখায়। পোশাক-পরিচ্ছদ বা খাওয়াদাওয়ার ওপর তার তেমন মন নেই, কিছু একটা হলেই হলো। অবশ্য উনত্রিশ বছর বয়স, প্রায় ছ ফুট লম্বা দেহ, এলোমেলো বাদামী চুল, ঘননীল চোখ, মেয়েরা ওকে দেখলেই মজে। কাজেই পোশাক-আশাকে কি যায় আসে ! ওর এক বন্ধু তো একবার হিংসার চোটে বলেই ফেলেছিলো : 'তুই শালা মঠে গিয়েও পাখী মারতে পারিস !' শুনে হেসেছিলো অবশ্য, তবে ভালোই লেগেছিলো। কথাটা খাঁটি।

জীবনে তার তিনটি উন্মাদনা : স্পোর্টসকার, রিপোর্টারের পেশা আর সিগ্রিড। অবশ্য কখনো কখনো ওর মনে হয়েছে যে জীবনে যদি স্পোর্টসকার আর সিগ্রিডের মধ্যে কোন একটাকে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তবে সিগ্রিডকে নিশ্চয়ই নতুন প্রেমিক খুঁজে নিতে হবে। কথাটা মনে হতে লজ্জাও পেয়েছে সে, তবু অবধারিত সত্য।

গাড়ি রেখে গ্যারেজের আলোতে জাগুয়ারটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কতবার দেখেছে তবু আশ মেটে না। কতদিন রাস্তাতে দাঁড়ানো অবস্থাতেও গাড়িটাকে বার বার দেখেছে। হয়তো কোন পথিক সেই সময় মিলারের পাশে এসে বলেওছে, 'কি সুন্দর গাড়ি, না?' বুঝতেও পারেনি গাড়ির মালিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে।

ফ্রিল্যান্স রিপোর্টারদের পক্ষে অবশ্য এরকম একটা গাড়ির মালিক হওয়া অসাধারণ ব্যাপার। বিশেষত সেই মডেলের জাগুয়ার, ইংল্যাণ্ড থেকে যা আমদানি এবং যার স্পেয়ারপার্টস হাম্বুর্গের মতো শহরেও পাওয়া দুষ্কর।···কি ভাবে যে গাড়িটা কিনতে পেরেছিলো সেটাই এক বিচিত্র কাহিনী। কপালে থাকলে বোধহয় সবই সম্ভব।···বসেছিলো নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটবার জন্যে। বেশ ভিড়, অপেক্ষা করতে হচ্ছিলো। সময় কাটানোর জন্যেই হাতে তুলে নিয়েছিলো একটা পত্রিকা, পপ-স্টারদের নিয়ে নানান রকম গুজবে ঠাসা। এইসব পত্রিকার পাতা ও সাধারণত কখনো উল্টেও দেখে না। তবে নাপিতের দোকান বলে কথা! মাঝ পাতায় দু পৃষ্ঠা জুড়ে ছিলো চারজন বাবরি-চুলো ইংরেজ যুবকের কাহিনী, যারা চড়চড় করে ধূমকেতুর মতো যশের উঁচু চূড়ায় উঠে আন্তর্জাতিক তারকা বনে গেছে। ছবিটার একেবারে ডান দিকের মুখটা, যার মস্ত নাক, তার কাছে বিশেষ অর্থবহ না হলেও অন্য তিনটে মুখের আদল কিন্তু তার স্মৃতির বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়লো। যে দুটো গানের রেকর্ড এই বিট্‌ল্‌-চতুষ্টয়কে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, সেই গান দুটোও···'প্লিজ প্লিজ মি' এবং 'লাভ মি ডু'···ওর মনে অনুরণন না তুললেও মুখ তিনটে ওকে ভাবিয়ে তুললো। দুটো দিন ধরে মনে যেন আসে-আসে অথচ আসে না। তারপর মনে পড়লো।—দু বছর আগে, ৬১ সালে, রিপারবানের ছোট্ট ক্যাবারে, গান গাইতো ওই তিনটে মুখ।—আরো একটা দিন লাগলো রেস্তোরাঁটার নাম মনে করতে। কারণ ওই পানশালাটায় তার যাতায়াত ছিলো না। নেহাত স্যাঙ্ক্‌ট্‌ পাউলির দলের খবর জোগাড় করতে কোন এক পাতাল-নায়কের মোলাকাতের উদ্দেশ্যে ওখানে সে একবার গিয়েছিলো। মনে পড়ে গেলো নাম—'স্টার ক্লাব'। তড়িঘড়ি গেলো সেখানে। ৬১-র খাতাপত্তর

হাঁটকে ওদের নাম খুঁজে পেলো। তখন ওরা ছিলো পাঁচজন; যে তিনজনের ছবি ও দেখেছে তারা এবং অন্য দুজন—পিট বেস্ট ও স্টুয়ার্ট সাটক্লিফ। তাড়াতাড়ি চললো সেই ফটোগ্রাফারের দোকানে, যে ইম্পেসারিও বার্ট কেম্পফার্টের হয়ে ওদের প্রচার ছবিগুলো তুলতো। প্রত্যেকটা ছবির স্বত্ব-স্বামিত্ব কিনে নিলো। লিখলো অপূর্ব ফিচার-কাহিনী 'হাম্বুর্গ কেমন করে বিট্‌ল্‌দের আবিষ্কার করেছিলো।' জার্মানীর প্রায় প্রত্যেকটা পপ-মিউজিক আর ছবির ম্যাগাজিন ওর কাহিনী কিনে নিলো, বিদেশেও প্রচার হলো প্রচুর। সেই টাকায় কিনলো জাগুয়ারটাকে এক ব্রিটিশ আর্মি অফিসারের কাছ থেকে। তারপর নিতান্ত কৃতজ্ঞতাবশতই যেন কিছু বিট্‌ল্‌-রেকর্ডও কিনেছিলো, কিন্তু সেগুলো শোনে শুধু সিগি।

গাড়ি রেখে ফ্ল্যাটে চলে এলো। মধ্যরাত তখন। মায়ের ওখানে সন্ধ্যা-বেলায় প্রচুর খেয়েছিলো, তবু খিদে পেয়ে গেছে। ডিম ফেটিয়ে স্ক্র্যাম্বলড্‌-এগ্‌স্‌ বানিয়ে নিলো এক প্লেট। নীরবে সেটা উদরস্থ করে রেডিও খুললো। কেনেডি, কেনেডি, কেনেডি···এখন শুধু জার্মান দৃষ্টিকোণ থেকে কেনেডি-নিধনের পর্যালোচনা কারণ ডালাস থেকে নতুন কোন সংবাদ নেই, সেখানে পুলিস এখনও আততায়ীকে খুঁজছে। পশ্চিম বার্লিনের গভর্নিং মেয়র, উইলি ব্রাণ্ডট, আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে কেনেডির ভূয়সী প্রশংসা করলেন···আরো বহু শ্রদ্ধাঞ্জলি পড়া হলো যার মধ্যে ছিলো চ্যান্সেলর লুডউইগ এরহার্ডের শোকবার্তা, প্রাক্তন চ্যান্সেলর কনরাড অ্যাডেনয়েরের বাণী, যিনি গত অক্টোবরের ১৫ তারিখে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

রেডিও বন্ধ করে শুতে গেলো পিটার মিলার। সিগি বাড়ি থাকলে বেশ হতো। মন খারাপ হলেই বিছানায় ওর পাশে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ে। শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে সময় লাগে না। তারপরেই আসে সহবাসের তৃপ্তি; বিষণ্ণতা দূর হয়ে মন স্বচ্ছ হয়ে যায়; প্রশান্ত স্বপ্নহীন নিদ্রায় রাত কখন কেটে যায়। অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে মিলারের অমন ঘুম সিগি মোটে বরদাস্ত করতে পারে না। সহবাসের পরেই আলোচনা করতে ও ভাল-বাসে—কবে আমরা বিয়ে করবো, ছেলেমেয়ে হবে···ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে যে ক্যাবারেতে ও কাজ করে সেটা ভোর চারটের আগে বন্ধ হয় না। শুক্রবার রাতে তো আরো দেরি হয়। সপ্তাহান্তের ছুটির আগের সন্ধ্যায় রিপারবানে মফস্বলের লোক আর ট্যুরিস্টদের গিজগিজে ভিড়। রেস্তোরাঁর দামের চেয়েও দশগুণ দামে তারা শ্যাম্পেন কিনে দিতে রাজী যে কোন মেয়ের জন্যে যার ফ্রক খাটো আর স্তনযুগল উঁচু। আর সিগির ফ্রক তো হ্রস্বতম আর স্তনযুগ উচ্চতম।

তাই নীরবে আরো একটা সিগারেট টেনে শুয়ে পড়লো মিলার। ঘুমিয়ে পড়লো প্রায় রাত পৌনে দুটোয়। স্বপ্ন দেখলো আল্‌টনা বস্তিতে গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মরে যাওয়া একটা বুড়ো লোকের বীভৎস মুখ।

পিটার মিলার মাঝরাতে যখন হাম্বুর্গে বসে বসে ডিম ফেটিয়ে খাচ্ছিলো, তখন কায়রো শহর থেকে একটু দূরে পিরামিডগুলোর কাছে একটা বাড়ির সুসজ্জিত লাউঞ্জে বসে পাঁচজন লোক বেশ তারিয়ে তারিয়ে মদের গেলাসে চুমুক মারছিলো। বাড়িটা একটা রাইডিং স্কুলের সংলগ্ন। সময় তখন রাত একটা। লোক পাঁচজন চর্বচোষ্য ডিনার সেরে মজাসে মাইফেল জমিয়েছিলো। প্রাণে বড় ফুর্তি আজ। ঘণ্টা চারেক হলো সুখবরটা এসেছে ডালাস থেকে—আঃ, আর পায় কে!

এদের মধ্যে তিনজন জার্মান আর বাকি দুজন মিশরীয়। রাইডিং স্কুলের মালিকের বাড়ি এটা; কায়রো সমাজের ছাঁকা মানুষগুলোর প্রিয় আড্ডাখানা। আশেপাশে প্রায় সাত হাজার জার্মান থাকে,—কলোনিতে। তারাও এখন শুতে গেছে, এই বাড়ির মেমসাহেবও। কর্তাটি তো অতিথি-সেবক, অতএব তিনি রয়ে গেছেন এই পাঁচজনের একজন হয়ে।

বন্ধ জানলার পাশে গদি-আঁটা ইজিচেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে আছে হ্যান্স অ্যাপলার। আগেকার দিনে ডঃ জোসেফ গোয়েবল্‌সের নাৎসী প্রচার-মন্ত্রকের ইহুদী-বিশেষজ্ঞ। প্রায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় থেকেই মিশরে বসবাস; জার্মানী থেকে লুকিয়ে এখানে একে তুলে নিয়ে এসেছিলো ওডেসা। অ্যাপলার আর এখন অ্যাপলার নেই, মিশরীয় নাম নিয়ে হয়ে গিয়েছে সালা জাফর। ইহুদী-বিশেষজ্ঞ হিসাবে মিশরীয় প্রশিক্ষা-দপ্তরে

কাজ করে। তার হাতে এখন হুইস্কির গেলাস। বাঁ পাশে যে বসে আছে সেও একজন গোয়েবল্‌সের প্রাক্তন চেলা, নাম লুডউইগ হাইডেন। প্রশিক্ষা-দপ্তরে সেও কাজ করে। ইতিমধ্যে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে মক্কা থেকে একবার ঘুরে আসার পর নাম হয়ে গেছে এখন আল হাজ। নতুন ধর্মের ওপর শ্রদ্ধাভরে হাতে মদের গেলাস না নিয়ে নিয়েছে শুধু কমলার রস। দুজনই গোঁড়া নাৎসী।

মিশরীয় দুজনের একজন হলো কর্নেল সামসেদিন বাদরেন; মার্শাল আবদেল হাকিম আমীরের ব্যক্তিগত সহকারী। মার্শাল আমীর পরে মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৬৭ সালের ছ'দিনের যুদ্ধের পর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল বাদরেনের ভাগ্যেও জুটেছিলো অসীম লাঞ্ছনা। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা।···আজকের রাতের দ্বিতীয় মিশরীয়টি হলো ইজিপ্সিয়ান সিক্রেট ইনটেলিজেন্স বিভাগ, মউখবরাতের প্রধান, কর্নেল আলি সামির।

ডিনারে ষষ্ঠ অতিথিও একজন ছিলেন। আসলে তিনিই ছিলেন সেই সন্ধ্যার মুখ্য অতিথি। কিন্তু কায়রো সময় অনুসারে রাত সাড়ে নটায় কেনেডির মৃত্যুসংবাদ যেই এলো অমনি তিনি ঝটিতি রওনা হয়ে গেলেন কায়রোর দিকে। ভদ্রলোক মিশরের জাতীয় পরিষদের স্পীকার, আনোয়ার আল সাদাত; প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, পরে নাসেরের স্থলে তিনিই প্রেসিডেন্ট হন।

হ্যান্স অ্যাপলার গেলাস উঁচিয়ে তোলে।—"তাহলে···ইহুদীপ্রেমিক কেনেডি মরলো। বন্ধুগণ, আমি টোস্ট করছি।"

"কিন্তু আমাদের গেলাস যে খালি," কর্নেল সামির আপত্তি জানায়।

"আরে, দাঁড়ান—।" তাড়াতাড়ি করে গৃহকর্তা পাশের টেবিল থেকে স্কচের বোতল নিয়ে এসে সবায়ের গেলাসে ঢালেন।

কেনেডিকে ইহুদীপ্রেমিক আখ্যা দেওয়ায় এদের পাঁচজনের কারো ভুরুই উঁচু হলো না। ১৪ই মার্চ ১৯৬০ তারিখে ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট ডয়াইট আইসেনহাওয়ার, ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন এবং জার্মানীর চ্যান্সেলর কনরাড অ্যাডেনয়ের নিউইয়র্ক

শহরের ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে গোপনে মিলেছিলেন। দশ বছর আগে এরকম একটা জমায়েত কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু ১৯৬০ সালে অকল্পনীয় না হলেও, ওই মিটিঙে যা ঘটলো সেটা তখনো অকল্পনীয়। সেই কারণেই ওই মিটিঙের ফলাফল জানতে দশ বছর সময় লেগে গেলো। এমন কি ১৯৬৩-র শেষভাগে ওডেসা এবং কর্নেল সামিরের মউখবরাত যখন ব্যাপারটা প্রেসিডেন্ট নাসেরের গোচরে এনেছিলো, তখনো তিনি ওই খবরে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

নেতা দুজন সেদিন একটা চুক্তিসম্পাদন করেছিলেন, যার ফলে পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে বিনা শর্তে বছরে পাঁচ কোটি ডলার ঋণ দেবে। তবে বেন-গুরিয়ন কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন যে টাকা থাকা এক কথা কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা বা সেগুলো সরবরাহের কোন নির্ভরশীল সূত্র পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য আরেক কথা। ছ মাস পরে ওয়ালডর্ফ-চুক্তি অনুসরণ করে আরেকটা চুক্তি হলো, জার্মানী এবং ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্রাঞ্জ-জোসেফ স্ট্রাউস ও শিমন পেরেসের মধ্যে। সেই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর দেওয়া ঋণের টাকায় জার্মানী থেকেই অস্ত্রশস্ত্র কিনতে পারবে ইস্রায়েল।

অ্যাডেনয়ের জানতেন যে এই দ্বিতীয় চুক্তি নিয়ে ভীষণ বাদপ্রতিবাদের ঝড় উঠতে পারে, তাই তিনি কিছুদিন নীরব থাকলেন। ৬১-র নভেম্বরে নিউইয়র্কে প্রেসিডেন্ট জন ফিজগেরাল্ড কেনেডির সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হলো, তখন কেনেডি কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁকে চাপ দিলেন। আমেরিকা থেকে সরাসরি কোন অস্ত্রশস্ত্র ইস্রায়েলে যায় তা চান না কেনেডি, অথচ তিনি চান যে ইস্রায়েল যেন অস্ত্র সরবরাহ পায়, অন্য যেখান থেকেই হোক। ইস্রায়েলের প্রয়োজন—ফাইটার বিমান, ট্রান্সপোর্ট প্লেন, হাউইৎ-জার ১০৫ মিলিমিটার গোলা, সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক, সশস্ত্রবাহিনী পরি-বহনের জন্যে সুরক্ষিত গাড়ি, কিন্তু সবার ওপরে ট্যাঙ্ক।

সবগুলোই ছিলো জার্মানীর কাছে, হয় ন্যাটো-চুক্তি অনুসারে মার্কিন-মুল্লুক থেকে কেনা, নয়তো জার্মানীতেই তৈরি মার্কিন লাইসেন্সে।

কেনেডির চাপে স্ট্রাউস-পেরেস চুক্তি পালন ত্বরান্বিত হলো।

৬৩-র জুনের শেষাশেষি জার্মান ট্যাঙ্কগুলো হাইফাতে আসতে শুরু

করলো। খবর আর চেপে রাখা সম্ভব হলো না। ৬২-তেই কিন্তু ওডেসা জানতে পেরেছিলো, তাদের অনুচরদের মারফত কায়রোতে জানিয়েও দিয়েছিলো ইজিপ্সিয়ানদের।

৬৩-র শেষে পটভূমি বদলাতে আরম্ভ করলো। ১৫ই অক্টোবর প্রস্তরদৃঢ় চ্যান্সেলর, 'বনের ধূর্ত শৃগাল' কনরাড অ্যাডেনয়ের পদত্যাগ করে অবসর নিয়ে নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন লুডউইগ এরহার্ড; অর্থনৈতিক যাদুকাঠির তিনিই জনক, অতএব জনমত তাঁরই স্বপক্ষে কিন্তু বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে বড়ই দুর্বল তিনি, বড়ই অস্থিরচিত্ত।

অ্যাডেনয়েরের সময়েও পশ্চিম জার্মান মন্ত্রিসভার কোন এক আভ্যন্তরীণ উপদল থেকে সরব প্রতিবাদ উঠেছিলো; বলা হচ্ছিলো ইস্রায়েলি অস্ত্রচুক্তিটি স্থগিত রাখা হোক, জার্মানী থেকে তাদের যেন কোনরকম অস্ত্র সরবরাহ না করা হয়। বৃদ্ধ চ্যান্সেলর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রূঢ় বাক্যে বিপক্ষকণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন; এমনই প্রতাপ ছিলো তাঁর যে তাঁর সময়ে তারা আর কখনো গলা উঁচু করেনি।

এরহার্ড কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইতিমধ্যেই লোকে তাঁকে 'রবারের সিংহ' খেতাব দিয়েছে। তিনি গদিতে বসতে না বসতেই আবার নীরব কণ্ঠগুলো সোচ্চার হলো। বলা হলো যে আরব দুনিয়ার সঙ্গে সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার খাতিরে ইস্রায়েলি অস্ত্রচুক্তি স্থগিত রাখা একান্ত কর্তব্য। এরহার্ড দোটানায় পড়লেন। চুক্তিটির স্বপক্ষে সবকিছু ছাপিয়ে ছিলো শুধুমাত্র জন কেনেডির দৃঢ় মনোভাব—ইস্রায়েল যেন জার্মানীর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র পায়।

আর এখন,—সেই কেনেডি গুলির আঘাতে বিগতপ্রাণ। নভেম্বরের ২৩ তারিখে এই তিনপ্রহর রাতে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: নতুন প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন কি জার্মানী থেকে এই ব্যাপারে মার্কিনী চাপ তুলে নেবেন? বনের দুর্বলচিত্ত চ্যান্সেলরটি যদি এই চুক্তি পালন না করেন তবে কি তিনি নীরব থাকবেন? কায়রোর বড় আশা ছিলো যে তিনি নীরব থাকবেন, কিন্তু বস্তুত পরে দেখা গিয়েছিলো যে তিনি তা থাকেননি।

কায়রোর উপকণ্ঠে সে রাতের সেই আনন্দোৎসবে অতিথিদের গেলাস

ভরে দিয়ে গৃহকর্তা নিজেরটাতেও কিছু ঢেলে নেন। নাম তাঁর উলফগ্যাং লুট্‌জ ; জন্ম ১৯২১ সালে ম্যানহাইমে ; জার্মান বাহিনীর তিনি প্রাক্তন মেজর ; প্রচণ্ড ইহুদী-বিদ্বেষী ; ১৯৬১-তে কায়রোতে এসে নিজেই রাইডিং অ্যাকাডেমিটি খুলেছেন। কায়রোর প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে আছে তাঁর গভীর আঁতাত, নীলনদের ধারে প্রবাসী এই জার্মান মহলে, বিশেষ করে নাৎসী গোষ্ঠীর সঙ্গে, তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতা।

হাসি-হাসি মুখে ঘরের সবায়ের দিকে একবার তাকিয়ে নেন তিনি। কেউ কিন্তু বুঝতে পারে না যে তাঁর হাসিটা ঝুটা। অথচ সত্যিই তাই। আসলে তিনি নিজেও ইহুদী ; জন্ম যদিও ম্যানহাইমে তবু বারো বছর বয়সে, সেই ১৯৩৩ সালে, প্যালেস্টাইনে চলে এসেছেন। তাঁর নাম ছিলো জেয়েভ ; ইস্রায়েলি বাহিনীতে তিনি রাভ-সেরেন (মেজর) ছিলেন। তৎকালে মিশরে তিনিই ছিলেন ইস্রায়েল ইনটেলিজেন্সের মুখ্য নায়ক। পরে ১৯৬৫-র ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে বাথরুমে পাওয়া গেলো একটা রেডিও-ট্র্যান্সমিটার। গ্রেপ্তার করা হলো তাঁকে। বিচার চলার পর ২৬শে জুন ১৯৬৫-তে তাঁকে চিরজীবনের জন্যে সশ্রমদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৬৭-র যুদ্ধের পর যখন হাজার হাজার মিশরীয় যুদ্ধ-বন্দী বিনিময় হলো তখন তিনি ছাড়া পেয়ে সস্ত্রীক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ তারিখে দেশে ফিরলেন লদ এয়ারপোর্টে।

কিন্তু যে রাতে কেনেডি নিহত হয়েছিলেন সে রাতে এ সবই ছিলো ভবিষ্যতের গর্ভে।···সেই মুহূর্তে তিনি শুধু চারটি হাসি-হাসি মুখের দিকে চেয়ে গেলাস উঁচিয়ে ধরলেন। মনে মনে তিনি তখন ভীষণ অধীর। ডিনার টেবিলে এদের একজন এমন একটা কথা উচ্চারণ করেছে যেটা ভীষণ জরুরী,···কখন এরা যাবে, বাথরুমে গিয়ে ট্রান্সমিটার খুলে সংবাদ পাঠাতে হবে···সময় বয়ে যাচ্ছে !

তবুও হাসি-হাসি মুখে টোস্ট করলেন তিনি, 'ইহুদীপ্রেমীরা নিপাত যাক !···সিয়েগ হাইল !'

পরদিন সকালে নটার একটু আগে পিটার মিলারের ঘুম ভেঙে গেলো।

মস্ত খাটজোড়া পালকের গদি ; পাশ ফিরতেই সিগির ঘুমন্ত শরীরের উত্তাপ এসে লাগে দেহে। আরো কাছে ঘেঁষে এলো যতক্ষণ না সিগির নিতম্ব তলপেটের কোল জুড়ে চেপে রইলো। সঙ্গে সঙ্গে রম্য কামনায় শরীর হলো উৎক্ষিপ্ত।

সিগি তখনো গাঢ় ঘুমে অচেতন। সবে চার ঘণ্টা হলো সে ঘুমিয়েছে। বিরক্তিতে বিড়বিড় করে উঠে ভটাম্ করে ও পাশ ফিরে প্রায় খাটের ধারে চলে গেলো। ঘুমের মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, "আঃ, সরো!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিৎ হয়ে শুলো মিলার। হাতটা উঁচু করে তুলে চোখ ছোট্ট করে সেই আলো-আঁধারিতে ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করে। তারপর খাটের উল্টো পাশ দিয়ে নেমে পড়ে। তোয়ালের বাথরোবটা টেনে গায়ে জড়িয়ে পা টিপে টিপে চলে আসে বসার ঘরে। জানলার পর্দা টেনে ফাঁক করে দিতেই নভেম্বরের ইস্পাত-ধূসর আগ্রাসী আলো এসে ঘরে চলকে পড়ে। মুহূর্তের জন্যে ওর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পিট পিট করে চোখ দুটোকে আলোয় সহজ করে নিয়ে নীচে স্টাইণ্ড্যামের দিকে তাকায়। শনিবারের সকাল, ভেজা-ভেজা মসৃণ কালো রাস্তায় গাড়ির প্রবাহ অনেক কম। হাই তুলে আবার চলে এলো ভেতরে ; চলে গেলো রান্নাঘরে কফি বানিয়ে নিতে। দিনের অগণন কফি-কাপের মিছিল হলো শুরু। মা এবং সিগি দুজনেই ওকে বকে এত কফি আর সিগারেট খাওয়ার জন্যে, ওই দুটোতেই যেন ওর জীবনধারণ।

রান্নাঘরে বসে বসে দিনের প্রথম সিগারেট আর প্রথম কাপ কফি খেতে খেতে পিটার মনে মনে খতিয়ে দেখলো কোন বিশেষ কাজ আছে কিনা আজ···নাঃ, কিছুই নেই। প্রত্যেকটা খবরের কাগজ আর প্রত্যেকটা পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে শুধু প্রেসিডেন্ট কেনেডি। কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে এই-ই চলবে। তাছাড়া কোন সংবাদ-কাহিনীও নেই হাতে যে তদন্ত করবে। তার ওপর আবার শনি-রোববারে কারো দেখাও পাওয়া যায় না অফিসে। বাড়িতে গিয়ে হানা দিলে তারা বিরক্ত হয়। সম্প্রতি ওর একটা ক্রমশ-প্রকাশ্য সিরিজও শেষ হয়েছে, লোকে নিয়েছেও খুব। রিপারবান নিয়ে লিখেছিলো, হাম্বুর্গের অর্ধ মাইল জুড়ে যে পাপের

রাজ্য···নাইট ক্লাব, বেশ্যাবাড়ি আর নানা অপকর্ম···যেন সোনার খনি ; লিখেছিলো কেমন করে ক্রমাগতই সেখানে এসে জুটছে পারি, অস্ট্রিয়া ও ইতালী থেকে দুর্বৃত্ত সর্দারেরা। লেখাটার পয়সা এখনো পায়নি। ভাবলো পত্রিকা অফিসে গিয়ে আজ পয়সার জন্যে তাড়া দিলে হয়। পরক্ষণেই মনে হলো, থাকগে, দেবে তো ওরা বটেই, শুধু শুধু তাড়া দেওয়া কেন। এই মুহূর্তে পয়সার তেমন অভাবও তো নেই। তিনদিন আগেই ব্যাঙ্ক থেকে হিসাবপত্রের কাগজ এসেছে ; ব্যালেন্স আছে পাঁচ হাজার মার্ক (১০,০০০ টাকা) ; কিছুদিন তো চলেই যাবে।

কাপ ধুতে গিয়ে সিগির মাজা ঝকঝকে সসপ্যানে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে নিজেকেই ভেঙচে ওঠে ঃ 'কি রে সৃ-শালা, কপালে অশেষ দুঃখ বুঝলি, এত কুঁড়ে হলে চলে !'

দশ বছর আগে মিলিটারি সার্ভিসের শেষে সিভিলিয়ান কেরিয়ার-অফিসার ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'জীবনে আপনি কি হতে চান ?'

'অভাব থাকবে না, কিচ্ছু না করে ঘুরে বেড়াবো।'

আজ এই উনত্রিশ বছর বয়সে ঠিক ওরকমটি না হলেও (হয়তো ওরকম কোনদিন হবেও না) উচ্চাশা হিসাবে ওর সেই কামনায় জঙ ধরেনি এখনো।

ট্রান্সিস্টার নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। দরজা সাবধানে বন্ধ করে দিলো যাতে সিগির ঘুম না ভাঙে। দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে ধারাস্নান করতে করতে রেডিওর খবর শুনলো। বিশেষ খবরের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট কেনেডিহত্যার জন্যে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে। কেনেডিহত্যা ছাড়া অন্য কোন খবরই ছিলো না রেডিওতে।

স্নান সেরে রান্নাঘরে গিয়ে আবার কফি বানালো, এবারে দু কাপ। কাপ দুটো শোবার ঘরে খাটের ধারে ছোট্ট টেবিলে রাখলো। তারপর রোব খুলে ফেলে সিগির বালিশের পাশে গিয়ে বসলো। ওর ফুরফুরে সোনালী চুলের গুচ্ছ বালিশে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

মেয়েটির বয়স এখন বছর বাইশ। স্কুলে ছিলো তুখোড় জিমন্যাস্ট। সিগি বলে যে সে অলিম্পিকে অনায়াসেই যেতে পারতো, যদি না হতচ্ছাড়া বুক

এগুলো না। তখন সবে বসন্তকাল। ক্যাবারে যখন বন্ধ হলো মেয়েটি এলো গায়ে একটা ধোসকা-মতো বিশ্রী ডুফেল কোর্ট চড়িয়ে। মিলার বোঝে এটা ওর ইচ্ছাকৃত অ-সাজ।

সেদিন ছজনে শুধু কফি খেলো আর চললো নানা কথাবার্তা। মনের উদ্বেগ কেটে গেছে কাজেই কথার ফোয়ারা ছুটলো। মিলার শুনলো ওর নাকি ভালো লাগে পপ মিউজিক, আর্ট, আলস্টারের পাড় ধরে বেড়ানো, ঘরকন্না আর ছোট ছেলেমেয়ে। তার পর থেকে নিয়ম করে সপ্তাহের ছুটির দিনটাতে ও মিলারের সঙ্গে বেরুতো; ডিনার খেতো বা-কোন শো দেখতো, কিন্তু একত্র শয়ন নয়।

তিন মাস পরে মিলার ওকে বিছানায় নিয়ে এলো। বললো, ইচ্ছে করলে এখানেই ওর বাড়িতে এসে থাকতে পারে। জীবনের গুরুগম্ভীর দিকটাতে সব সময়েই সিগির দৃষ্টি। মনে মনে নিশ্চিত পিটার মিলারকেই বিয়ে করবে। তবে প্রশ্ন এই যে বিয়ের আগেই পাকাপাকি ওর বিছানায় এলে ওকে পেতে সুবিধা হবে, না, না এলে। বুঝে নেয় যে না যদি আসে তবে প্রয়োজন হলে মিলার তার তোশকের খালি দিকটাতে অন্য কাউকে অনায়াসে নিয়ে আসতে পারে। কাজেই মনস্থির করে ফেললো সিগি। এই বাড়িতেই চলে আসবে সে, এমন মন দিয়ে ঘরকন্না করবে, মিলারকে এত আরামে রাখবে, যে সে ওকে বিয়ে না করে পারবেই না। নভেম্বরের শেষে ওদের দ্বৈত-জীবন ছ মাসে পড়লো।

মিলারের মতো লোক যে গৃহকর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতো না, সেও স্বীকার করতে বাধ্য হলো সিগি চমৎকার সংসার করে। শুধু তাই নয়, ভোগতৃষ্ণাও তার প্রচুর, রমণেও পরম লাবণ্যময়ী। সরাসরি কখনো বিয়ের কথা পাড়তো না সিগি, ঠারেঠোরে ইঙ্গিত করতো। মিলার কিন্তু না বোঝার ভান করতো। তবু ওরা ছজনেই সুখী, বিশেষত পিটার মিলার। বিয়ের বন্ধন নেই অথচ বিয়ের সব সুখসুবিধাগুলোই পাচ্ছে।…

আধ কাপ কফি শেষ করে মিলার বিছানায় সিগির পাশে লম্বা হয়ে পেছন থেকে ওকে ছ হাতে জড়িয়ে ধরলো। মৃছ মৃছ ঘন আদর বোলায় ওর জঘনে। জানে যে এতে সিগির ঘুম ভাঙবেই। ক মিনিট পরে উল্লসিত

সিগি নড়েচড়ে চিৎ হয়ে শুলো। মিলার আরো নিবিড় হলো আদরে সোহাগে। আনন্দধ্বনি উঠতে থাকে সিগির ঘুমজড়ানো কণ্ঠ থেকে। তার পর একসময়ে ওরা দুজনেই ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির শিখরে পৌঁছে গেলো। রতি-ক্রীড়ার শেষে এলো পরম রমণীয় সঙ্গম।

"ঘুম ভাঙানোর খুব ভালো উপায় বার করেছো দেখছি," স্ফুরিত অধরে সিগি বলে, অভিমানের ভান করে।

"হুঁ, এর চেয়ে খারাপ উপায়ও আছে," মিলার জানায়।

"সময় কত এখন ?"

"বারোটা প্রায়।" ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে বললো মিলার। নইলে ও যদি শোনে এখন সবে সাড়ে দশটা, পাঁচ ঘণ্টাও ঘুমোতে পায়নি, তাহলে হয়তো রাগে কিছু একটা ছুঁড়েই বসবে। "ইচ্ছে করলে আবার ঘুমোতে পারো। ওঠার দরকার কি ?"

"উম-ম্-ম্। তুমি খুব ভালো।" পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সিগি।

দুটো কাপেরই বাকি কফিটুকু নিঃশেষ করে মিলার বাথরুমের দি কে যাচ্ছে এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। বসার ঘরে এসে ফোন ধরলো সে।

"পিটার ?"

"হুঁ। কে বলছেন ?"

"কার্ল।"

মন তখনও ধোঁয়াটে, স্বর শুনে চিনতে পারলো না।

"কার্ল ?"

ওপাশের লোকটা রেগে ভীষণ গেলো। "কার্ল ব্রাণ্ডট। ব্যাপার কি, ঘুমোচ্ছিস নাকি ?"

এতক্ষণে মিলার ধরায় নেমেছে। "ও হ্যাঁ, আরে কার্ল, তুই! কি ব্যাপার ? এক্ষুণি উঠলাম আমি।"

"দেখ্, ওই যে ইহুদীটা মরলো, ওর সম্বন্ধে কিছু কথা আছে তোর সঙ্গে।"

মিলার ঠিক বুঝতে পারে না। "ইহুদী মরলো ?...কে ?"

"আরে, কাল রাতে গ্যাসে মারা গেলো না? এটুকুও মনে করতে পারিস না তুই!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল রাতের কথা আমার মনে আছে। তবে ও যে ইহুদী তা জানতাম না। তো কি ব্যাপার?"

"তোর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই," পুলিস ইন্সপেক্টরটি বলে, "তবে ফোনে নয়। কোথাও দেখা করতে পারিস?"

সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত। নিশ্চয়ই কিছু আছে, মিলার ভাবে, নইলে ফোনে বলবে না কেন! ব্রাণ্ডটের মতো চালাক চতুর পুলিস তো আর গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে মাতামাতি করবে না!

"নিশ্চয়ই। লাঞ্চে ফ্রি আছিস?"

"থাকতে পারি।"

"বেশ, তাহলে যদি ভাবিস যে এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু, আমিই না হয় তোকে লাঞ্চ দিলাম আজ। একটার সময় বুঝলি···গুজ মার্কেটের কাছে ওই যে ছোট্ট রেস্তোরাঁটা···" ফোন রেখে দিলো মিলার। বুঝতে পারে না কিছুই। আল্‌টনার বস্তিতে একটা বুড়ো লোক আত্মহত্যা করেছে, তা ইহুদীই হোক আর যাই হোক—কি এমন রহস্য থাকতে পারে তাতে!

লাঞ্চের কোর্সগুলো একে একে খেয়ে গেলো, প্রসঙ্গের অবতারণাই করছে না ব্রাণ্ডট। পরে যখন কফি এলো, শুধু বললো, "কালকের রাতের লোকটা।"

"হুঁ, কি হয়েছে?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"শুনেছিস নিশ্চয়ই, যুদ্ধের সময়ে বা তার আগে নাৎসীরা ইহুদীদের ওপর কি সব করতো?"

"হ্যাঁ, শুনিনি আবার! ইস্কুলে তো এগুলো রীতিমতো আমাদের গলার ভেতর দিয়ে ঠুসে দেওয়া হয়েছে,···নয়?"

মিলার কিন্তু অস্বস্তিবোধ করে। ন-দশ বছর যখন বয়স, যখন স্কুলে পড়তো তখন তাদের বারবার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে সে এবং জার্মানীর সকলেই বিরাট বিরাট যুদ্ধ-অপরাধের জন্যে দায়ী। কিছু না বুঝলেও তখন মেনে নিতো সে-কথা।

পরে অবশ্য বুঝতে পারা যায়নি যে শিক্ষকেরা যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী ওই কালটিতে ওকথা বলে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করারও কেউ নেই ; মুখ খুলতে চান না কেউই,—না শিক্ষকেরা, না পিতামাতারা। সাবালক হয়ে উঠে ইতিহাসের খানিকটা পড়ে তবে সে জেনে নিয়েছিলো। যেটুকু পড়েছিলো তাতেই ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো। তবে মনে হয়েছিলো যে ওগুলোর সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। কত আগেকার কথা ; একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগ, ভিন্ন কাল, ভিন্ন পরিধি। ওই সব যখন হয়েছে তখন সে তো সেখানে ছিলো না, মাও নয়, বাবাও নয়। অন্তরের ভেতর থেকে কে যেন তাকে ডেকে বলতো—পিটার মিলার, ওগুলোর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই সে কোন নামও জিজ্ঞাসা করেনি, কোন তারিখও না, কোন বিবরণও নয়।···তাই এখন ভীষণ অস্বস্তি জাগলো, ব্রাণ্ডট কেন ওই ঘৃণিত বিষয়টার উত্থাপন করছে।

কফি-কাপে চামচ নেড়েই চলেছে ব্রাণ্ডট, অপ্রস্তুত অবস্থা, যেন বুঝে উঠতেই পারছে না কিভাবে শুরু করবে।

অবশেষে বললো, "কাল রাতের ওই বুড়ো লোকটা। জার্মান ইহুদী ছিলো জানিস, কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে দিন কাটিয়েছিলো।"

গত সন্ধ্যার সেই স্ট্রেচার, মরা মানুষটার মাথা, সব যেন চকিতে মিলারের মনে ঝলসে উঠলো। আচ্ছা, ওরা কি এইভাবেই শেষ হয়ে যায়, ওটাই নিয়তি! কিন্তু, তা কি করে হবে? অন্তত আঠারো বছর আগে মিত্রপক্ষ এসে ওকে মুক্তি দিয়েছিলো, তারপর বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলো। তবু মুখটা বারবার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। এর আগে ও কাউকে দেখেনি যে ক্যাম্পে ছিলো অন্তত জ্ঞাতসারে তো নয়ই ; তেমনি এস.এস. দলের জল্লাদদের কাউকে সে দেখেনি। দেখলে অন্তত বুঝতে পারতো ; মানুষটা নিশ্চয়ই ভিন্ন চেহারার হবে।

দু বছর আগে জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত আইখম্যান-বিচারের কথা মনে পড়ে যায়। সেই সময় কাগজগুলোতে ফলাও করে শুধু সেই খবর বেরুতো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কাঁচের বুথের ভেতরে সেই মুখটার কথা মনে করতে চেষ্টা করে। তখন কিন্তু মনে হয়েছিলো মুখটা কি সাধারণ, কি অসম্ভব

কফি, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। প্যাকেট খুলতেই শক্ত মলাট দেওয়া ডায়রিটা বেরুলো। দৃঢ় বাঁধাই নয়, গোল গোল ক্লিপ লাগানো, লুজ-লিফ ধরনের। যে কোন পৃষ্ঠা বের করে নেওয়া যেতে পারে যে কোন সময়, আবার নতুন কোন পৃষ্ঠাও যথেচ্ছ যে কোন স্থানে লাগিয়ে রাখা যেতে পারে।

প্রায় দেড়শো টাইপ করা পৃষ্ঠা। পুরনো নড়বড়ে মেশিনে টাইপ হয়েছে কেননা কোন কোন অক্ষর জীর্ণ আবার কোন কোন অক্ষর লাইনের ওপরে বা নীচে মুদ্রিত। অধিকাংশ পৃষ্ঠাই কয়েক বছর আগেকার, অথবা কয়েক বছর ধরে হয়তো টাইপ করা হয়েছে, কারণ সাদা কাগজে বয়সের হলদে ছোপ। কিন্তু সামনে পেছনে কয়েকটা নতুন পৃষ্ঠাও আছে, হয়তো কয়েকদিন আগে লাগানো। পাণ্ডুলিপির গোড়াতে কয়েকটা নতুন সেরকম পৃষ্ঠায় ভূমিকা এবং শেষেও নতুন কয়েক পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট। দুটোতেই একই তারিখ, ২১শে নভেম্বর অর্থাৎ দুদিন আগে। মিলার বুঝতে পারে লোকটা আত্ম-হত্যা করবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ওগুলো লিখেছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই মিলার অবাক। সুন্দর সাবলীল জার্মান ভাষা। পড়েই মনে হয় লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃষ্টি যথেষ্ট।

ডায়রির সামনের শক্ত বাঁধাইয়ের ওপর চৌকো একটা সাদা কাগজ আঠা দিয়ে সাঁটা, তার ওপর একটা বড় সেলোফেন আঁটা। কাগজটায় বড় বড় হরফে কালো কালি দিয়ে লেখা : সলোমন টউবেরের দিনপঞ্জী।

মিলার চেয়ারে জুত হয়ে বসে প্রথম পৃষ্ঠা খুলে পড়তে আরম্ভ করলো।

সলোমন টউবের : আমার দিনপঞ্জী

ভূমিকা

আমার নাম সলোমন টউবের। আমি একজন ইহুদী এবং মরণোন্মুখ। আমি আমার নিজের জীবনের অবসান ঘটানোর সংকল্প নিয়েছি কারণ এর আর কোন মূল্য নেই, আর করবারও আমার আর কিছু নেই। আমার জীবন দিয়ে আমি যে সমস্ত কাজ করতে চেয়েছিলাম, সব বৃথা হয়েছে। আমি অন্যায় পাপ এবং অধর্ম যা দেখেছি সেগুলো শুধু যে টিকেই আছে তা নয়, তাদের ক্রমোন্নতিও ঘটেছে, অথচ সৎ এবং মঙ্গল ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্রূপের

কশাঘাতে তিরোহিত হয়েছে। আমার বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই নির্যাতনে নির্যাতনে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে অবশেষে প্রাণ হারিয়েছেন, আমার চারদিকে এখন শুধু দেখি সেই উৎপীড়কদের। দিনের বেলায় তাদের মুখ আমি দেখি রাস্তায় আর রাত্রে আমি দেখি আমার স্ত্রী এসথারের মুখ, যিনি বহুকাল হলো মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এতদিন ধরে আমি বেঁচেছিলাম শুধু একটিমাত্র সাধ পূরণের জন্যে, কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত যে আমার সে সাধ কোনদিনই পূর্ণ হবে না।

জার্মান জাতির বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই, কারণ তারা জাত হিসেবে ভালো। গোটা একটা জাত কখনো মন্দ হতে পারে না, হয় কিছু ব্যক্তিবিশেষ। ইংরেজ দার্শনিক বার্ক ঠিকই বলেছিলেনঃ 'সম্পূর্ণ একটি জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ কি করে আনতে হয় আমি জানি না।' অন্যায় যৌথ হয় না ; বাইবেলেই তো বর্ণিত আছে সডোম এবং গোমোরা-বাসীদের পাপের জন্যে প্রভু তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ ধ্বংস করতে চাইলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিলো একজন সৎব্যক্তি এবং যেহেতু সে ছিলো সৎ, শাস্তি তাকে পেতে হলো না। অতএব মোক্ষলাভের ন্যায় অন্যায়ও ব্যক্তিগত।

রিগা এবং স্টুটহফের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে যখন আমি বেরিয়ে এলাম, ম্যাগডেবুর্গের মৃত্যুমিছিল সত্ত্বেও যখন আমি বেঁচে রইলাম, ১৯৪৫-এর এপ্রিলে ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন আমাকে সেখানে মুক্তি দিয়ে দিলো, আমার শরীরটাই মুক্তি পেলেও আত্মা যখন রইলো শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে, তখন জগৎকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। মানুষজন, গাছপালা, পাহাড়পর্বত, সবের ওপরেই আমার ঘৃণা, কারণ তাদের সকলের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলেই আমাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঘৃণা হলো আমার জার্মানদের ওপর। বারবার নিজেকে আমি প্রশ্ন করলাম, যেমন গত চার বছর ধরে আমি বহুবার করেছি, কেন ঈশ্বর এদের সমূলে বিনাশ করছেন না,—প্রত্যেকটি নরনারী, শিশু নির্বিশেষে, তাদের প্রত্যেকটি শহর নগর, ঘরবাড়ি এবং জীবনের প্রতিটি চিহ্নকে ? কিন্তু যখন এরকম কিছুই ঘটলো না তখন ঈশ্বরের ওপরেও আমার অনাস্থা জন্মালো ; ক্ষুব্ধ অভিযোগে

মুখর হলাম যে তিনিও আমাকে এবং আমাদের জাতিকে ত্যাগ করেছেন। অথচ তিনিই তো আমাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মিয়েছিলেন যে আমরাই তাঁর পরম প্রিয়! অবিশ্বাসও জন্মালো তখন, বলতে থাকলাম ঈশ্বর নেই।

কিন্তু সময়ের অভিঘাতে আমি আবার ভালবাসতে শিখলাম: ভালবাসলাম প্রকৃতিকে,—পাহাড়পর্বত, গাছপালা, ওপরের নীলাকাশ, শহরের ভেতর দিয়ে বহমান নদী, পথের কুকুর-বিড়াল, খোয়া বাঁধানো রাস্তার ধারে ধারে অযত্নজাত গুল্ম, আমার কুৎসিত চেহারা দেখে যে সব ছেলেমেয়ে ভয়ে পালিয়ে যায় তাদেরও। তাদের তো কোন দোষ নেই। ফরাসীতে একটা প্রবাদ আছে: 'সবকিছু বুঝতে হলে সবকিছু ক্ষমা-ঘেন্না করে নিতে হয়।' মানুষ যখন মানুষকে বুঝতে পারে—তাদের দোষত্রুটি, লোভ-লালসা, ক্ষমতালুব্ধতা, অজ্ঞতা, দাপটের কাছে নতিস্বীকারের প্রবণতা—তখনই মানুষ ক্ষমা করে দিতে পারে তাদের, কৃতকর্ম সত্ত্বেও। কিন্তু ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে কিছু লোক আছে যাদের অন্যায়ের সীমা নেই, অতএব তাদের বোঝাও সম্ভব নয়। তারা সেইজন্যেই ক্ষমাও পেতে পারে না। এবং এইখানেই রয়েছে আমাদের সত্যিকারের অকৃতকার্যতা। কারণ সেই সব লোক এখনো আমাদের মধ্যে বাস করছে, শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অফিস-কারখানায় কাজ করছে, হোটেল রেস্তোরাঁয় খানা খাচ্ছে, হাসছে, হাত মেলাচ্ছে, সৎ নাগরিকদের 'কামেরাড' বলেও সম্ভাষণ করছে। সমগ্র জাতির ললাটে তারা শাশ্বতকালের জন্যে তাদেরই ব্যক্তিগত অন্যায় ও অধর্মের ফলে কলঙ্কের কালি লেপন করে দিয়েছে অথচ তারাই আজ সদর্পে সম্মানিত নাগরিক হিসাবে বেঁচে রয়েছে—অপমানিত লাঞ্ছিত সমাজ-পরিত্যক্ত হিসাবে নয়! এইটাই হচ্ছে আমাদের অকৃতকার্যতা। এবং এই অকৃতকার্যতা তোমার, আমার, সবাইয়েরই। আমাদের ত্রুটি হয়েছে, ভয়ঙ্কর ত্রুটি।

পরিশেষে কালক্রমে আবার ঈশ্বরের ওপর আমার ভক্তি জন্মালো। আবার তাঁর ক্ষমা চেয়ে নিলাম, তাঁর প্রদত্ত বিধি লঙ্ঘন করে যে সমস্ত অপরাধ করেছি তার জন্যে। এবং সেরকম অপরাধও অসংখ্য।…শ্রবণ

করো হে ইস্রায়েল,…আমাদের প্রভু আমাদের ঈশ্বর,…ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়…শেমা ইস্রায়েল,…আদো নাই এলোহেনু,…আদো নাই এহাদ…

ডায়রির প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠায় টউবের বর্ণনা করে গেছে তার জন্মবৃত্তান্ত, হাম্বুর্গে তার শৈশবকাল, কারিগরি শ্রেণী-উদ্ভূত তার যুদ্ধনায়ক পিতা এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার অল্প কিছুদিন পরেই তার মাতাপিতার বিয়োগ। তিরিশ দশকের শেষভাগে তার বিয়ে হয় এসথার নামে একটি কন্যার সঙ্গে যার পেশা ছিলো স্থপতির কাজ। ১৯৪১এর গোড়ায় তাকে পাকড়াও করবার চেষ্টা হয়েছিলো কিন্তু মনিবের হস্তক্ষেপে সে বিপদ সে কাটিয়ে উঠেছিলো। অবশেষে, মক্কেলের সঙ্গে তার দেখা করতে যেতে হবে, এইরকম একটা অছিলায় বার্লিনের দিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্র্যান্সিট ক্যাম্পে কিছুদিন কাটানোর পর তাকে অন্যান্য ইহুদীদের সঙ্গে পূর্বাঞ্চল-অভিমুখী একটা ক্যাট্‌ল ট্রেনের বক্স-কারে পুরে রওনা করিয়ে দেওয়া হলো।

…মনে করতে পারি না কদ্দিনে এসে ট্রেনটা একটা রেলওয়ে স্টেশনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। যতদূর মনে পড়ে বার্লিনে যেদিন আমরা ট্রাকে বন্ধ হলাম তার ছ দিন সাত রাত্তির পরে। ট্রেনটা হঠাৎই স্থির হয়ে গিয়েছিলো। সাদা আলোর চিল্‌তে দেখে বুঝেছিলাম বাইরে এখন দিন। ক্লান্তি, অবসাদ আর দুর্গন্ধে আমার মাথা ঘুরছিলো।

বাইরে হল্লা শোনা যাচ্ছিলো, লোহার আঁকসি খুলে দেবার আওয়াজও। দরজাগুলো সশব্দে হঠাৎ হাট হয়ে খুলে গেলো। ভাগ্যিস নিজের চেহারা নিজে দেখতে পাইনি! একদা আমি সাদা সার্ট ও পাটভাঙা ট্রাউজার্স পরেছিলাম (টাই এবং জ্যাকেট অনেকদিন হলো মেঝেতে ফেলে দিয়েছি)। অন্যদের চেহারা দেখে বুঝতে পারি কি ভীষণ অবস্থা এখন!

উজ্জ্বল রোদ এসে গাড়িতে ঢুকতেই অনেকে আঙুল দিয়ে দুচোখ টিপে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে আমি আগেই চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম যাতে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ না টাটায়। মানুষের ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতিতে গাড়িবোঝাই লোক টাল সামলাতে না পেরে নানা ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মের ওপর ছিটকে পড়লো। বিশ্রী দুর্গন্ধের ভাপ

উঠলো গোটা জায়গাটায়। দরজাটা গাড়ির মাঝখানে থাকায় আর আমি পেছন দিকে একটা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম বলে কোনমতে চোখ অর্ধেক খুলে সোজা হয়ে প্ল্যাটফর্মে নামতে পেরেছিলাম।

যে এস.এস. রক্ষীগুলো দরজা খুলেছিলো তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায় কত হীন ওরা, তেমনি আসুরিক, গাঁক গাঁক করে কি সব বলছিলো কিন্তু ভাষা বুঝলাম না। ঘৃণায় বিরক্তিতে ওরা একটু সরে দাঁড়ালো। বক্স-কারের মধ্যে একত্রিশজন মানুষ হয় মুখ থুবড়ে নয়তো গুটিসুটি মেরে পড়ে ছিলো। তারা আর কোনদিন উঠবে না। বাকি আমরা। অভুক্ত, অর্ধ-অন্ধ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝালরঝোলর ছেঁড়া পোশাকে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে কোনমতে দাঁড়িয়ে রইলাম প্ল্যাটফর্মের ওপর। তেষ্টায় আমাদের জিভগুলো টাকরায় গিয়ে আটকে আছে, মুখ কালো হয়ে ফুলে আছে, ঠোঁটগুলো ফেটে চৌচির।

প্ল্যাটফর্মে বার্লিন থেকে আগত আরও চল্লিশটা কামরা এবং ভিয়েনা থেকে আঠারোটা তাদের যাত্রীদের উগরে দিচ্ছিলো। এদের বেশীর ভাগই নারী এবং শিশু। অধিকাংশ নারী এবং প্রায় সবকটি শিশুই নিরা-বরণ, সর্বাঙ্গে বমন-বিষ্ঠা। তাদের অবস্থাও আমাদের মতই সাংঘাতিক। কয়েকটি মহিলাকে দেখলাম মৃতশিশু কোলে নিয়ে আলোর মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে নামছে।

রক্ষীরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে ডাণ্ডা মেরে মেরে নির্বাসিতদের সার বেঁধে দাঁড় করাচ্ছিলো, কুচকাওয়াজ করিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে শহরে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোন্ শহর? এরা কথা বলছেই বা কোন্ ভাষায়? পরে জানতে পেরেছিলাম শহরটি হচ্ছে রিগা, আর এস.এস. রক্ষীগুলো এখান থেকেই ভর্তি হওয়া স্থানীয় ল্যাটভিয়ান। জার্মানীর এস.এস.দের চেয়েও এরা ভীষণ ইহুদী-বিরোধী, তবে মেধা বা বুদ্ধি অনেক কম। এরা মানুষের অবয়বে পশু।

রক্ষীদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো একদল ভীত অসহায় মানুষের মূর্তি। তাদের পরনের কামিজ ও প্যান্ট জীর্ণ নোংরা। প্রত্যেকের বুকে ও পিঠে মস্ত কালো কাপড়ের পট্টিতে লেখা: 'ই'। এরা একটা বিশেষ কম্যাণ্ডো,

ঘেটো থেকে এসেছে; ক্যাট্‌ল্‌কারগুলো থেকে লাশ নামিয়ে শহরের বাইরে সেগুলোকে গোর দেবে। ওদের আবার পাহারা দিচ্ছে জন-ছয়েক লোক, তাদেরও বুকে পিঠে 'ই', তবে তাদের বাহুতে আছে আর্মব্যাণ্ড আর হাতে গাঁইতির হাতল। এরা ইহুদী কাপো, যা করতে বলা হয় তা যদি এরা করে তো অন্যান্য বন্দীদের চেয়ে এরা ভালো খাবারটাবার পায়।

স্টেশন-দালানের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলো কয়েকজন জার্মান এস. এস. অফিসার। আমার চোখ আলোতে অভ্যস্ত হওয়ার পর আমি তাদের দেখতে পেলাম। তাদের একজন দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে, একটা বড় প্যাকিং বাক্সের ওপর। ট্রেন থেকে যে কয়েক হাজার কঙ্কালসার মানুষ নামলো তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মুখে পরিতুষ্টির সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। সবুজ ইউনিফর্ম তাতে কালো পটভূমিতে আঁটা রুপোলী এস. এস. প্রতীক যেন বিশেষ করে ওর জন্যেই তৈরি। ডান দিকের কলারের ওপর ওয়াফেন এস.এস.-এর যুগ্ম বিদ্যুৎ রেখা। বাঁ দিকে তার পদমর্যাদার নিশান ...ক্যাপ্টেন।

লোকটা লম্বা একহারা চেহারার; চুলের রঙ ফিকে বাদামী, নীল চোখ দুটো যেন বৃষ্টি-ধোওয়া। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম লোকটা ভয়ঙ্কর ধর্ষকামী। ইতিমধ্যেই রিগার কশাই নামে সে খ্যাত হয়ে গিয়েছিলো, সেই নাম পরে মিত্রশক্তিও ব্যবহার করেছিলো। সেই প্রথমবার আমি দেখলাম এস.এস. ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যানকে।...

১৯৪১এর ২২শে জুন ভোর পাঁচটায় হিটলারের ১৩০টি ডিভিশন তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে রাশিয়া আক্রমণে সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে গেলো। প্রতিটি বাহিনীর পেছনে পেছনে ঝাঁকে ঝাঁকে চললো এস. এস. উন্মূল দল। হিটলার হিমলার এবং হেইড্রিখের নির্দেশ ছিলো এদের ওপরে যে সেনাবাহিনী যে সমস্ত এলাকা দখল করতে করতে এগিয়ে যাবে, সেই সমস্ত এলাকা থেকে কম্যুনিস্ট কমিশারদের আর গ্রামীণ ইহুদী পরিবারদের উন্মূল করে দিতে হবে, শহরবাসী ইহুদীদের প্রত্যেকটি বড় শহরে ঘেটোস্থাপনা করে সেই খোঁয়াড়ে আটকে রাখতে হবে পরবর্তী 'বিশেষ ব্যবস্থা'র জন্যে।

সৈন্যবাহিনী ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগা অধিকার করলো ১লা জুলাই ১৯৪১।

ওই মাসের মাঝামাঝি এস. এস. কমাণ্ডোদের প্রথম দলটা এসে ওখানে পৌঁছলো। ১লা আগস্টে এস. এস. থেকে রিগাতেই তাদের স্থানীয় এস. ডি. এবং এস. পি. বিভাগ খোলা হলো ; এখান থেকেই পরিচালনা করা হবে সেই উন্মূল-পরিকল্পনা যা দিয়ে গোটা অস্টল্যাণ্ড (অধিকৃত তিনটি বাল্টিক রাজ্যের নতুন নাম) ইহুদীবিহীন হবে।

তারপর বার্লিনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার ইহুদীদের নিধনের জন্যে রিগাকে ট্র্যান্সিট ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা হোক। ১৯৩৮ সালে ৩,২০,০০০ ছিলো জার্মান ইহুদী এবং ১,৮০,০০০ অস্ট্রিয়ান ইহুদী···মোট পুরো পাঁচ লাখ। ১৯৪১এর জুলাই পর্যন্ত হাজার হাজার ইহুদীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, বিশেষ করে সাশেনহাউসেন, মাউথাউসেন, র‍্যাভেন্সব্রুখ, ডাচাউ, বুখেনওয়াল্ড, বেলসেন এবং বোহেমিয়ার থেরেসিয়েনস্টাডে। কিন্তু ওগুলো ক্রমশ ভরে উঠছিলো, তাই পূর্বাঞ্চলের অখ্যাত স্থানগুলো অবশিষ্ট ইহুদীদের সমূলবিনাশের পক্ষে প্রশস্ত বলে মনে হলো। অবশ্য ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো ছটি উন্মূল কেন্দ্র নতুন করে বানাতে বা যেগুলো আছে সেগুলো বাড়াতে। এগুলো হলো অউশউইৎস, ত্রেব্লিঙ্কা, বেলজেক, সবিবর, চেল্মনো ও ময়দানেক। কিন্তু যতদিন না সেগুলো তৈরি হচ্ছে ততদিন এমন একটা জায়গা তো দরকার যেখানে যতটা সম্ভব ইহুদীদের বিনাশ করা যায় আর বাকি লোকগুলোকে 'মজুত' করে রাখা হয়। রিগাকে পছন্দ করা হলো সেই অভাব পূরণের জন্যে।

১লা আগস্ট ১৯৪১ থেকে ১৪ই অক্টোবর ১৯৪৪ পর্যন্ত ২,০০,০০০ জার্মান ও অস্ট্রিয়ান ইহুদীকে রিগায় পাঠানো হয়েছিলো, যার মধ্যে ৮০,০০০ ওখানেই মৃত্যু বরণ করে থাকলো আর বাকি ১,২০,০০০কে পোল্যাণ্ডের ওপরে উল্লিখিত ছটা উন্মূলকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিলো। এর মধ্যে মোটমাট ৪০০ জন বেঁচে ফিরে-ছিলো, যার মধ্যে আবার অর্ধেকেরও বেশী স্টুটহফ এবং ম্যাগডেবুর্গের মৃত্যু-মিছিলে মরণবরণ করেছিলো। রাইখ জার্মানী থেকে রিগায় পরিবাহিত ইহুদীদের মধ্যে টউবেরদের দলই প্রথম। ওঁরা সেখানে পৌঁছেছিলো ১৮ই আগস্ট, ১৯৪১, বেলা ৩-৪৫এ।

···রিগার ঘেটো ওই শহরের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগে রিগার ইহুদীদের বাস ছিলো এই অঞ্চলে, কিন্তু আমি যখন পৌঁছেছি তখন তারা

কয়েকশোজন মাত্র ছিলো সেখানে। তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের ভেতর রশম্যান এবং তার সহকারী ক্রাউস ওপর-মহলের নির্দেশে তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছিলো।

ঘেটোটা ছিলো শহরের উত্তর প্রান্তে, যার পরেই উত্তর দিকে অবারিত মাঠ। দক্ষিণ মুখটায় ছিলো পাকা দেওয়াল, অন্য তিন দিকে কয়েক সার করে কাঁটাতারের বেড়া। একটিমাত্র ফটক, উত্তর মুখ দিয়ে তার ভেতর দিয়েই যাতায়াত। দু পাশে দুটো ওয়াচটাওয়ার, পাহারা দিতো ল্যাটভিয়ান এস.এস. ফৌজিরা। ফটক থেকে ঘেটোর মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল অবধি, নাম 'মেজ কালন্থ ইয়েলা' বা ছোট পাহাড়ের রাস্তা। দক্ষিণ থেকে উত্তরের গেটের দিকে মুখ করলে ডান ধারে পড়তো 'ব্লেখ প্লাৎস' বা টিন স্কোয়্যার ; এইখানেই হতো কাকে মারা হবে না হবে তার নির্বাচন, হাজিরা নেওয়া, বেগার খাটার দল গড়া, চাবুক মারা আর ফাঁসী। চত্বরের ঠিক মাঝখানটায় ছিলো বিশাল ফাঁসীকাঠ, আটটা ইস্পাতের আঁকড়া থেকে পাকাপোক্তভাবে ঝুল খেতো আটটা ফাঁস। প্রতি রাত্রে অন্তত ছজন অভাগার শরীর এখান থেকে দুলতো। দিনের কাজের পরিমাণ দেখে তৃপ্তি না পেলে রশম্যানের হুকুমে আবার এই আটটা আঁকড়াকে প্রায়ই কয়েক খেপে কাজ করতে হতো।

পুরো ঘেটোর আয়তন ছিলো প্রায় দুই বর্গমাইল। এককালে এটা ছিলো একটা উপনগরের মতো যেখানে বারো থেকে পনেরো হাজার লোক বাস করতো। আমাদের আসবার আগে রিগার ইহুদীরা, অন্তত যে দু-হাজার তখনো ছিলো, তারা ইঁট তুলে তাদের অংশ আলাদা করে নিয়েছিলো। ফলে আমরা যে পাঁচ হাজার নরনারী শিশু এলাম তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত স্থান ছিলো। কিন্তু আমরা আসবার পর থেকে দিনের পর দিন নতুন নতুন দল আসতে থাকলো ; ঘেটোয় আমাদের এলাকাতেই লোকের সংখ্যা হয়ে গেলো ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। তখন শুরু হলো বিয়োগের খেলা ; নতুন যতজন আসে ঠিক ততজন পুরনো বাসিন্দাকে শেষ করে ফেলা হয়, যাতে জায়গার অকুলান না হয়। নইলে অত্যধিক ভিড়ে আমরা যারা খাটতে পারি তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে যাক, রশম্যান তা কিছুতেই হতে দেবে না।

প্রথমদিন সন্ধ্যায় আমরা গুছিয়ে বসলাম, প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটলো একেকটা ঘর। সত্যিকারের খাট; পর্দা এবং কোট টেনে গায়ে দিয়ে কম্বলের অভাব মেটালাম। কল থেকে প্রাণভরে জল খেয়ে নিয়ে আমার পাশের ঘরের পড়শী তো ভাবলো যে হয়তো এমন কিছু মন্দ হবে না ব্যাপারটা। কিন্তু তখনো আমরা রশম্যানের সাক্ষাৎ পাইনি···

গ্রীষ্ম থেকে এলো শরৎ, শরৎ থেকে শীত। ঘেটোর অবস্থার ক্রমে অবনতি হচ্ছে। রোজ সকালে প্রত্যেককেই ল্যাটভিয়ান পাহারাদারদের রাইফেলের কুঁদো আর ডাণ্ডার বাড়ি খেতে খেতে টিন স্কোয়্যারে সার বেঁধে দাঁড়াতে হয়। অধিবাসীদের বেশীর ভাগই পুরুষ; কারণ কার্যক্ষম পুরুষদের অনুপাতে নারী এবং শিশুদের এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক বেশী সংখ্যায় খতম করে দেওয়া হয়। সার বেঁধে দাঁড়ানোর পর হাজিরা ডাকা হয়। নাম ধরে কাউকে ডাকে না; গুণে গুণে আমাদের কাজের হিসাবে কয়েক ভাগে ভাগ করে ফেলে। ঘেটোর প্রায় সবাইকেই স্ত্রী-পুরুষ-শিশুনির্বিশেষে, সার বেঁধে দলে দলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাধ্যতামূলক কাজে, কাছাকাছি যে সমস্ত কারখানা গড়ে উঠছে সেইগুলোতে, বারো ঘণ্টা করে একনাগাড়ে বেগার খাটতে।

আমি আগে বলেছি যে আমি ছুতোরমিস্ত্রি ছিলাম। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। তবে স্থপতি হিসাবে আমি ছুতোরমিস্ত্রিদের কাজ অনেক দেখেছি, কাজেই চালিয়েও নিতে পারি। ভেবেছিলাম ছুতোরমিস্ত্রিদের চাহিদা নিশ্চয়ই থাকবে অতএব তদ্দিন আমাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে না। আমার অনুমান ঠিকই হয়েছিলো। কাছাকাছি একটা কাঠের কলে আমাকে কাজে পাঠানো হলো। সেখানে স্থানীয় পাইনগাছগুলোকে কেটে কেটে সেনাবাহিনীর জন্যে প্রিফ্যাব-কুটির বানানো হচ্ছিলো।

ভীষণ পরিশ্রমের কাজ, অটুট স্বাস্থ্যবানেরাও হয়তো সহ্য করতে পারতো না। গোটা গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালটাও আমাদের বাইরে অসহ্য ঠাণ্ডা এবং নিম্ন ল্যাটভিয়ার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কাজ করতে হলো।···

খাওয়ার বরাদ্দ ছিলো আধ লিটার তথাকথিত স্যুপ, যেটা আসলে ঘোলা জল, কখনো কখনো অবশ্য আলুর এক-আধটা মাথাটাথাও ভাসতো।

সকালে কাজে মার্চ করে যাওয়ার আগে আমাদের এটা দেওয়া হতো। তারপর রাতে ঘেটোতে ফিরে এলে আবার আধ লিটার ওই বস্তু, সঙ্গে কালো রুটির মাত্র একটা টুকরো আর একটা পচ-ধরা আলু সেদ্ধ করা।

ঘেটোতে খাদ্যবস্তু আনলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসী, সন্ধ্যার হাজিরা ডাকার সময় টিন স্কোয়্যারে সারবাঁধা লোকগুলোর চোখের সামনে। তবু ওই ঝুঁকিটুকু না নিলে অমনিতেও না খেতে পেয়ে মৃত্যু।

সন্ধ্যাবেলায় দলগুলো যখন ধুঁকতে ধুঁকতে অবসন্ন পায়ে ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকতো তখন রশম্যান আর তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়ি চেক করতো। হঠাৎ কোন একজন পুরুষ বা নারী বা শিশুকে ডেকে হুকুম করতো ফটকের একপাশে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে। যদি একটুকরো রুটি বা একটাও আলু পাওয়া যেতো তাদের শরীরের কোথাও তো তাদের সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য সবাইকে মার্চ করিয়ে টিন স্কোয়্যারের দিকে এগিয়ে যেতে দিতো হাজিরার জন্যে।

সবাই সার বেঁধে দাঁড়ালে রশম্যান দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে আসতো। পেছনে পেছনে এস.এস. রক্ষীদের পাহারায় ওই হতভাগা মানুষগুলো, হয়তো গুনতিতে তারা জনা-বারো। তাদের মধ্যে যেগুলো পুরুষ তারা গিয়ে উঠতো ফাঁসীমঞ্চে, কাঠের চৌকো চেয়ারে বসে গলায় ফাঁসের দড়ি পরে অপেক্ষা করতো হাজিরা কখন শেষ হবে তার জন্যে। তারপর রশম্যান এগিয়ে যেতো সেই ফাঁস গলায় লাগিয়ে থাকা সারিবদ্ধ লোকগুলোর পাশে। উঁচু চেয়ারে বসে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ চেয়ারে লাথি মেরে সেটা সরিয়ে দিতো। লোকটা হ্যাঁচকা টানে ফাঁসে ঝুলে পড়তো। সামনাসামনি মুখের দিকে চেয়ে এই কাজটা করতে ভালবাসতো রশম্যান, যাতে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা তার মুখ দেখতে পায়। কখনো কখনো বা চেয়ারে লাথি কষাবার জন্যে পা পিছিয়ে নিয়েই ঠিক মোক্ষম সময়ে থেমে যেতো; লোকটা তখন চেয়ারে বসে বসেই কাঁপতো, ভাবতো যে ফাঁসে আটকে সে বোধহয় ঝুলছে, আর তখন সে কি উল্লসিত হাসি রশম্যানের!

কখনো বা ওদের মধ্যে কেউ ঈশ্বরকে ডাকতো, কখনো বা কেউ

দয়াভিক্ষা চাইতো। রশম্যানের খুব ভালো লাগতো সেই সব অনুনয়-বিনয় শুনতে। তখন সে ভান করতো যে সে কানে কম শোনে। কানের ওপর হাত রেখে বলতো, 'একটু জোরে বল দেখি, কি বলছিলে?'

তারপর সেই চেয়ারটা লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলতো, 'কানটা গেছে দেখছি হে আমার, যন্ত্র লাগাতে হবে।...'

কয়েক মাসের মধ্যে এডুয়ার্ড রশম্যান, আমাদের অর্থাৎ বন্দীদের চোখে হয়ে দাঁড়ালো একটি সাক্ষাৎ শয়তান। যতরকম বীভৎসতা সে কল্পনা করতে পারে, সব আমাদের ওপর প্রয়োগ করতো।

ক্যাম্পের ভেতরে খাদ্য নিয়ে আসতে গিয়ে যদি কোন বন্দিনী ধরা পড়তো তবে তার চোখের সামনে প্রথমে পুরুষ অপরাধীগুলোকে ধরে ধরে ফাঁসীতে লটকাতো। তাকে সেই দৃশ্য দেখতেই হতো বিশেষ করে যদি সেই পুরুষগুলোর মধ্যে থাকতো তার নিজের ভাই কি স্বামী। তারপর রশম্যান তাকে আমাদের সবায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসাতো, ক্যাম্পের নাপিত ডেকে তার মাথা পুরো মুড়িয়ে দিতো।

হাজিরা ডাকা শেষ হয়ে গেলে তাকে কাঁটাতারের ওপাশে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। তাকে দিয়েই তার জন্যে অগভীর কবর খোঁড়াতো, গর্তের পাশে আবার তাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করিয়ে রশম্যান বা তার অন্য কোন সহকারী লুগার-পিস্তল দিয়ে একেবারে কাছ থেকে তার খুলির নীচে তাক্ করে গুলি করতো। বধ্যভূমিতে আমাদের কাউকে আসতে দেওয়া হতো না, তবু ল্যাটভিয়ান রক্ষীদের মুখে মুখে ক্যাম্পে শোনা যেতো যে রশম্যান কখনো কখনো কোন স্ত্রীলোকের কানের পাশ দিয়ে বাইরে গুলি করতো, আতঙ্কে সে তখন কবরের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়তো, তারপরে আবার উঠে এসে আগের মতোই জানু পেতে বসতো। আবার কখনো বা রশম্যান শূন্য চেম্বারে ট্রিগার টিপতো, যখন শুধু একটা ক্লিক শব্দ হতো, মেয়েছেলেটি কিন্তু সেই মুহূর্তে এমন আঁকুপাঁকু শুরু করে দিতো যেন মৃত্যু এসে তাকে আঘাত করেছে। ল্যাটভিয়ানরা দানব তবু রশম্যান তাদেরও অবাক করে দিতে পেরেছিলো।...

রিগাতে একটি মেয়ে বন্দীদের সাহায্য করতো, যার জন্যে অবশ্য তাকে অশেষ ঝুঁকি নিতে হতো। মেয়েটির নাম ছিলো অলি অ্যাডলার, ম্যুনিখে বোধহয় তার বাড়ি। ভেতরে খাবার নিয়ে আসবার জন্যে তার বোন গের্ডাকে গোরস্থানে গুলি করে মারা হয়েছিলো। অলি অত্যন্ত রূপসী ছিলো, কাজেই রশম্যানের চোখে ধরলো। ওকে সে তার রক্ষিতা বানিয়ে নিলো—সরকারী কাগজে অবশ্য লেখা হলো বাড়ির চাকরানী। কারণ এস.এস. লোকদের সঙ্গে ইহুদিনীদের সম্পর্ক একেবারেই নিষিদ্ধ। এই মেয়েটি এস.এস. স্টোর থেকে চুরি করে ঘেটোতে যখন আসবার অনুমতি পেতো, ওষুধপত্র নিয়ে আসতো। অপরাধটার শাস্তি ছিলো অবশ্য মৃত্যু। মেয়েটিকে আমি শেষবারের মতো দেখি যখন আমরা রিগা ডক থেকে জাহাজে উঠেছিলাম।···

শীতের শেষে আমি মনে মনে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না। এককালে আমার স্বাস্থ্য ছিলো ভালো ; কিন্তু ক্ষুধায়, ঠাণ্ডায়, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, অমানুষিক খাটুনিতে, অত্যাচারে অত্যাচারে আমার সেই পেটানো শরীর হয়ে দাঁড়ালো শুধু চামড়ায় মোড়া কতগুলো হাড়। আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে দেখতাম একটা চামড়া কুঁচকানো, খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা বুড়োমানুষের মুখ যার চোখ দুটো লাল আর গাল তোবড়ানো। অথচ আমার বয়স তখন সবে পঁয়ত্রিশ কিন্তু চেহারা দেখে মনে হতো যেন তার দ্বিগুণ। সকলেরই ওই একই অবস্থা।

হাজার হাজার মানুষকে আমি জঙ্গলে নিয়ে যেতে দেখেছি পাইকারি হারে মারতে, ঠাণ্ডায় অনাহারে আর প্রচণ্ড খাটুনিতে শয়ে শয়ে লোককে আমি মরে যেতে দেখেছি ; কত লোককে দেখলাম ফাঁসীতে ঝুলিয়ে, গুলি করে, চাবকে বা ডাণ্ডা মেরে খুন করে ফেললো। পাঁচ মাস যে আমি বেঁচে আছি সেটা মনে হতো যেন আমার আয়ুর বাইরের ফালতু কোন হিসাব। ট্রেনের কামরায় আমি যে জীবনমরণ পণ দেখিয়েছিলাম তা আর নেই, আছে শুধু যান্ত্রিক চলাফেরা, আবেগ-অনুভূতিশূন্য। তবু জানতাম যে এই যান্ত্রিক চলাফেরারও অবসান ঘটলো বলে, আর কতদিন বা! কিন্তু মার্চে একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আমি আবার নতুন করে ইচ্ছাশক্তি

ফিরে পেলাম।

তারিখটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ৩রা মার্চ ১৯৪২…যেদিন দ্বিতীয়বার ডুনামুণ্ড কনভয় গেলো। মাসখানেক আগে আমরা দেখেছিলাম, সেই প্রথমবার, যে একটা অদ্ভুত ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। লম্বা একতলা বাসের মতো গড়ন, ইস্পাত-ধূসর রঙ অথচ একটা জানলাও নেই। ঘেটোর ফটকের ঠিক বাইরেই ভ্যানটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো। সকালের হাজিরা নেওয়ার সময় রশম্যান জানালো যে একটা বিশেষ ঘোষণা করবার আছে। রিগা শহর থেকে প্রায় আশী মাইল দূরে ডুনা নদীর ধারে ডুনামুণ্ডে একটা নতুন কারখানা গড়া হয়েছে, মৎস্য সংরক্ষণ করবার। সেখানে হালকা কাজ, ভালো খাওয়া-দাওয়া, থাকার জায়গাও সুন্দর, কিন্তু যেহেতু কম কাজ সেজন্যেই শুধু বুড়ো-বুড়ী, শিশু বা অসুস্থ এবং দুর্বল লোকদেরই ওখানে যাওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে।

স্বভাবতই যেতে চাইলো অনেকে। রশম্যান আমাদের লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লোক নির্বাচন করতে থাকে। অন্যান্য বার অসুস্থ বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা লাইনের পেছনে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো; তাদের যখন টেনে হিঁচড়ে বার করে বধ্যভূমির পাহাড়ে যাবার জন্যে কাতারে দাঁড় করাতো তখন রোলারোল আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। কিন্তু সেবারে হলো ঠিক উল্টো, নিজেরাই এগিয়ে এলো তারা। শেষে একশোজন নির্বাচিত হলো। তারা সবাই যখন সেই ভ্যানে উঠে পড়লো তখন গাড়িটার দরজাগুলো জোরে বন্ধ করে দেওয়া হলো। বাইরে থেকে যারা দেখছিলো তারা দেখলো যে দরজাগুলো কেমন যেন শক্ত হয়ে এঁটে বন্ধ হয়ে গেলো। ভ্যান চলতে আরম্ভ করলো অথচ পেছন থেকে কোন ধুঁয়ো নেই। পরে শোনা গিয়েছিলো যে ডুনামুণ্ডে শুঁটকি মাছের কারখানাটানা কিচ্ছু নেই, সব বাজে কথা, ভ্যানটা আসলে হলো গ্যাস দিয়ে মানুষ মারবার আধার। ঘেটোতে সেই থেকে 'ডুনামুণ্ড কনভয়' কথাটার মানে হয়ে দাঁড়ালো গ্যাস দিয়ে মারা।

৩রা মার্চে ঘেটোতে শোনা গেলো যে আবার ডুনামুণ্ড কনভয় যাবে. ঠিক তাই হলো, হাজিরা নেবার সময়ে রশম্যান আবার সেই আগের ঘোষণা

করলো। কিন্তু এবারে কারো কোন আগ্রহ নেই, কেউ এগিয়ে এলো না। রশম্যান হাসিমুখে নেমে এলো, লাইনের শেষ থেকে শুরু করলো কারণ অথর্ব, পঙ্গু আর দুর্বলেরা পেছন দিকে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে। এগুতে এগুতে সে হাতের চাবুক দিয়ে একেকজনের বুকে টোকা দেয় আর তাকে টেনে লাইনের বাইরে দাঁড় করিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে ডুনামুণ্ডের যাত্রী বাছাই চললো।

একজন বৃদ্ধা ব্যাপারটা ঠিক মতন আঁচ করে নিয়ে সেদিন লাইনের সামনের দিকে দাঁড়িয়েছিলো। বয়স তার প্রায় পঁয়ষট্টি। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে সেদিন সে পরে এসেছিলো উঁচু হিলের জুতো, কালো রেশমী মোজা, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত খাটো স্কার্ট আর বাহারি টুপি। গাল দুটো রুজ ঘষে-ঘষে লাল, মুখে পাউডারের প্রলেপ, ঠোঁটে ঘন লিপস্টিক। অবশ্য বয়স ঢাকা পড়েনি তাতে তবু বৃদ্ধা ভেবেছিলো যে এইরকম সাজপোশাকে হয়তো সে চট করে নজরে পড়বে না।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে রশম্যান হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। একবার দেখে নিয়ে আবার ভালো করে তাকালো। মুখে উল্লাসের হাসি ফুটে উঠলো।

'অ্যাঁ, কি দেখছি এখানে?' স্ত্রীলোকটির দিকে চাবুক উঁচিয়ে জোরে জোরে বলে উঠলো যাতে তার সঙ্গীসাথীরা শুনতে পায়। তারা তখন চত্বরের মাঝখানে যাদের বাছাই করা হয়ে গিয়েছে সেই শতখানেক লোকের পাহারা দিচ্ছিলো।

রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রশম্যান, 'কিগো যুবতী, ডুনামুণ্ডে বেড়াতে যেতে চাও না?'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা বললো, 'না স্যার।'

'বয়স কত তোমার?' হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠলো রশম্যান, এস.এস. বন্ধুরা তাই শুনে খিলখিল করে হাসে। 'সতেরো না কুড়ি?'

বৃদ্ধার দুর্বল হাঁটু দুটো কাঁপতে থাকে। ফিসফিস করে বলে, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'বাঃ চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠলো রশম্যান। 'সুন্দরী নারী আমার

খুব পছন্দ। এসো এসো, মাঝখানটায় দাঁড়াও, তবে না আমরা সবাই তোমার রূপযৌবন তারিফ করতে পারবো।'

বলেই তাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে টিন স্কোয়্যারের মাঝখানটায় নিয়ে খোলা চত্বরে দাঁড় করিয়ে দিলো। বললো, 'তাহলে রূপসী, তুমি যখন এত সুন্দর আর এত অল্পবয়সী, একটু নাচ দেখাও আমাদের, কেমন?'

ঠাণ্ডা হিম বাতাসে আর আতঙ্কে বৃদ্ধা সেখানে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। নীচু স্বরে কি একটা বললো, আমরা শুনতে পেলাম না।

'কি বললে?' চিৎকার করে উঠলো রশম্যান, 'নাচতে পারো না? আহাঃ, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের তো নাচতে পারা উচিত,…কিগো?'

তার জার্মান এস.এস. সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন দমকে দমকে হাসছে। ল্যাটভিয়ানরা কিছু বুঝতে না পারলেও হাসতে শুরু করে দিয়েছে। বৃদ্ধা মাথা ঝাঁকালো। রশম্যানের মুখ থেকে হাসি উবে গেলো।

খেঁকিয়ে উঠলো সে, 'নাচো।'

পা ঘষে ঘষে একটু নড়াচড়া করলো বৃদ্ধা কিন্তু তারপর থেমে গেলো। রশম্যান হাতে তুলে নিলো তার লুগার পিস্তল, ক্যাচ সরিয়ে তাক্ করে গুলি ছুঁড়লো বৃদ্ধার পায়ের থেকে ঠিক এক ইঞ্চি দূরে। ভয়ে এক ফুট লাফিয়ে উঠলো বেচারী।

'নাচ্…নাচ্…নাচ্…ইহুদী কুত্তী শালী…নাচ্।' 'নাচ্' কথাটা বলে আর প্রত্যেকবার তার পায়ের নীচে এক-একটা করে গুলি ছোঁড়ে।

তিনটে পুরো ম্যাগাজিন খরচ করে রশম্যান বৃদ্ধাকে সত্যিই নাচালো। প্রত্যেকটা গুলি যত কাছে এগিয়ে আসে, আতঙ্কে ততই ঊর্ধ্বে লাফ দেয় বৃদ্ধা। প্রতিটি লাফের সঙ্গে সঙ্গে স্কার্টটা প্রায় তার কোমর পর্যন্ত উঠে যায়। শেষে বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো; ওঠবার আর ক্ষমতা নেই, এখন বেঁচে থাকুক বা মরে যাক কিছুই এসে যায় না। রশম্যান তাঁর শেষ তিনটে গুলি ওর মুখের ঠিক সামনে বালির মধ্যে ছোঁড়ে। বালি উড়ে চোখে ঝাপটা লাগে বৃদ্ধার। প্রতিটি গুলি ছুঁড়বার ফাঁকে ফাঁকে বুক-ফাটানো আর্তনাদ এসে চত্বরের খোলা ময়দানে বায়ুর সঙ্গে মিশে গেলো।

সব গুলি শেষ হয়ে গেলে পর রশম্যান আবার হেঁকে উঠলো, 'নাচ্।' বৃদ্ধার তলপেটে প্রচণ্ড জোরে জ্যাকবুটসুদ্ধ্ পা দিয়ে লাথি কষালো। সবই ঘটলো আমাদের চোখের সামনে, সবাই নির্বাক নিশ্চুপ। হঠাৎ আমার কানে এলো পাশের লোকটা প্রার্থনা বলতে শুরু করে দিয়েছে। লোকটা ইহুদী যাজক (হাসিদ); ছোটখাটো চেহারা, দাড়ি আছে, পরনে এখনো তার লম্বা কালো কোটের ভগ্নাবশেষ। প্রচণ্ড শীতের জন্যে আমরা যখন সবাই টুপির ওপর দিয়ে কানঢাকা মাফলার জড়িয়েছি তখনো সে তাদের প্রথামতো চওড়া ঘেরের টুপি পরে আছে। শেমা আবৃত্তি করতে থাকে সে একবারের পর আর একবার, কয়েকবার ধরে করলো। অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠস্বর ক্রমশ চড়তে থাকে। রশম্যানের মেজাজ যেমন চড়ে আছে তাতে আমিও নীরবে প্রার্থনা করতে থাকি হাসিদ যেন চুপ করে যায়। কিন্তু তা হবার নয়।

'শ্রবণ কর, হে ইস্রায়েল…'

'চুপ করো,' মুখের এক কোণ দিয়ে আমি হিসিয়ে উঠলাম।

'আদোনাই এলোহেনু…আমাদের প্রভু আমাদের ঈশ্বর…'

'চুপ করবে কিনা…আমরা সবাই যে মরবো।'

'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়…আদোনাই এহা-আ-আ-দ্'

শেষের উচ্চারণটা টেনে টেনে ধর্মীয় সংস্কারগত প্রথায় করলো, যেমনটি করেছিলো রাব্বি আকিভা যখন টিনিয়ুস রুফাসের আদেশে তাঁকে সিজারিয়ার অ্যাম্ফিথিয়েটারে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। ঠিক সেই মূহূর্তে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির ওপর চেঁচামেচি থামিয়ে রশম্যান, জন্তুরা যেমন বাতাসে নাক টেনে ঘ্রাণ নেয়, তেমনিভাবে মাথা তুলে ঘন শ্বাস টানছে। সোজা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। হাসিদের চেয়ে আমি অনেক লম্বা, তাই আমার দিকেই তাকালো।

'কে কথা বলছে?' গর্জে উঠলো সে। বালির ভেতর দিয়ে ঠিক আমার কাছে চলে এলো। 'তুমি…লাইন থেকে বেরিয়ে এসো।' কোন সন্দেহ নেই আমার দিকেই চাবুক উঁচিয়ে আছে। ভাবলাম, তাহলে এই শেষ। হোক্, ক্ষতি কি? হবেই যখন, আজ না হয় কাল। আমি লাইন ছেড়ে

বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কিচ্ছু বললো না সে, কোন কথা নয়, তবে তার মুখের পেশীগুলো নড়ে নড়ে উঠছিলো। তারপর দেখলাম পেশীগুলো স্থির হলো, আর তার মুখময় ছড়িয়ে গেলো সেই শান্ত শ্বাপদ হাসি যা দেখলে ঘেটোর সবাইয়ের রক্ত হিম হয়ে যেতো এমন কি ল্যাটভিয়ান রক্ষীগুলোরও।

এত দ্রুত তার হাত চললো যে চোখেও পড়লো না। আমি শুধু টের পেলাম মুখের বাঁ পাশে একটা প্রচণ্ড চাপ আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ আমার কানের পর্দার কাছে, অতি কাছে, যেন একটা বোমা ফাটলো সেখানে। তারপরেই যেন একটা নেহাৎই নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি, যেন আমার নিজের ইন্দ্রিয়জাতই নয়, অথচ রগ থেকে মুখ পর্যন্ত আমার নিজেরই চামড়া পুরনো কাপড় টেনে ছেঁড়বার মতন সশব্দে ফেটে গেলো। রক্ত ঝরবার আগেই আবার রশম্যানের হাত উঠলো, এবারে ভিন্ন পাশে। তার চাবুক আর একবার বোমা ফাটালো আমার অন্য কানে, আবার সেই চামড়া ছিঁড়ে যাবার আওয়াজ। চাবুকটা দু ফিট, হ্যাণ্ডেলের দিকে লাগানো আছে ইস্পাতের নল আর বাকি এক ফুট অংশ কোঁচকানো চামড়ার। মানুষের চামড়ায় সজোরে ঘা মেরে একই সঙ্গে টেনে দিলে কাগজের মতো দু ফালি হয়ে যায় চামড়া। আমি তা হতে দেখেছি।

সেকেণ্ডের মধ্যেই উষ্ণ রক্ত নীচে বয়ে যাচ্ছে টের পেলাম। গালের দু পাশ বেয়ে দুটো প্রস্রবণ আমার জ্যাকেটের সামনেটা ভিজিয়ে দিলো। রশম্যান আমার কাছ থেকে সরে গেলো, তারপর দু পা পিছিয়ে বৃদ্ধার দিকে সঙ্কেত করলো; সে তখনো চত্বরের মাঝখানে বালির ভেতরেই পড়ে আছে, শুধু ফোঁপানির আওয়াজ আসছে কানে।

'বুড়ীটাকে তুলে ভ্যানে নিয়ে যাও,' খেঁকিয়ে উঠলো সে।

কাজেই অন্য একশো হতভাগা পৌঁছনোর আগেই আমি বুড়ীকে কাঁধে তুলে ছোট পাহাড়ের রাস্তা ধরে ফটক পেরিয়ে ভ্যানের কাছে চলে এলাম। ভ্যানের পেছন দিকে ওকে বসিয়ে চলে আসছি, বুড়ী আমার কব্জি চেপে ধরলো। সাঁড়াশীর মত দৃঢ় শক্ত চাপ, ধারণাই করতে পারিনি যে ওর দেহে তখনো অমন শক্তি অবশিষ্ট আছে। মরণগাড়ির মেঝেতে বসে আমাকে

টেনে নামালো তার দিকে। একটা কেমব্রিকের রুমাল দিয়ে,—তার অতীত সুদিনের প্রতীক বোধহয় সেটা,—আমার তখনো ঝরন্ত রক্তের খানিকটা মুছিয়ে দিলো।

বুড়ী তার মুখটা আমার দিকে ফেরালো। সেই মুখে ম্যাসকারা, রুজ, চোখের জল আর বালি মিশে একাকার কিন্তু কালো চোখ দুটো তারার মতো ঝকঝকে।

ফিসফিসিয়ে বললো, 'ইহুদী বাছা শোনো, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা করো আমার কাছে যে তুমি বেঁচে থাকবে। আমাকে ছুঁয়ে শপথ করো যে এখান থেকে তুমি বেঁচে ফিরবে। তোমাকে বাঁচতেই হবে যাতে তুমি ওদের বলতে পারো বাইরের জগতের ওদের যে আমাদের জাতের ওপর এখানে কি ঘটেছে। প্রতিজ্ঞা করো আমার কাছে, সেফের তোরার নামে প্রতিজ্ঞা করো।'

সেই তখন আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি বেঁচেই থাকবো, যেমন করেই হোক, যত মূল্যেই হোক। আমাকে ছেড়ে দিলো বুড়ী। আমি স্খলিত পায়ে আবার সেই রাস্তা ধরে ঘেটোর ভেতরে এলাম, মাঝপথেই সংজ্ঞা হারালাম।…

কাজে ফিরেই আমি দুটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমটা হচ্ছে গোপনে একটা দিনপঞ্জী রাখবো ; পায়ের তলায় এবং পায়ের ওপরে রাত্রি-বেলায় কালো কালি দিয়ে পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে তারিখটারিখ আর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো উল্কি করে রাখবো যাতে একদিন না একদিন আমি রিগার সব ঘটনার প্রামাণিক অনুলিখন লিখতে পারি এবং যারা এর জন্যে দায়ী তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য দিতে পারি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে আমি কাপো হবো, ইহুদী পুলিসদের একজন।

এই সিদ্ধান্তটা নেওয়াই হয়ে দাঁড়ালো সব থেকে কষ্টকর, কারণ আমার জাতের অন্যান্য মানুষগুলোকে দলবদ্ধভাবে কাজে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার কাজ করতে হয় কাপোদের, কখনো কখনো বধ্যভূমিতেও নিয়ে যেতে হয়। এদের হাতে থাকে আবার গাঁইতির হাতল এবং জার্মান

এস.এস. অফিসারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নীচে কাপোরা তাদের সমধর্মী ইহুদীদের ওপর অস্ত্রটার যথেচ্ছ সদ্ব্যবহারই করে থাকে যাতে মানুষগুলো আরো বেশী করে মরণান্তক খাটনি খাটে। তৎসত্ত্বেও ১৯৪২-এর ১লা এপ্রিল তারিখে আমি কাপোদের প্রধানের কাছে গিয়ে নাম লেখাই। ফলে অন্যান্য ইহুদীদের কাছ থেকে আমি স্বভাবতই পৃথক হয়ে গেলাম। তবে ওই জঘন্য দলটায় স্থান পেতে কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না। কারণ কাপোদলে বরঞ্চ লোকাভাবই রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ভালো খাদ্য, ভালো থাকবার জায়গা, বেগার খাটুনি থেকে রেহাই, এইসব সুখসুবিধা সত্ত্বেও কাপো হতে চাইতে খুব কম ইহুদীই।…

যারা কায়িক শ্রমের অনুপযুক্ত তাদের কিভাবে হত্যা করা হতো সেই-সব বিবরণ এখানে দেওয়া আমার বিশেষ কর্তব্য, কারণ রিগাতে এডুয়ার্ড রশম্যানের আদেশে প্রায় সত্তর থেকে আশী হাজার ইহুদীর এইভাবেই জীবননাশ হয়। বন্দীদের নতুন দল, হাজার পাঁচেকের দলই আসতো সাধারণত যখন ক্যাট্‌ল্ ট্রেনে করে স্টেশনে এসে পৌঁছতো, তখন দেখা যেতো যে অন্তত হাজারখানেক লোক ট্রেনের বন্ধ বাক্সগুলোতে মরে পড়ে রয়েছে। ট্রেনের সেই পঞ্চাশটা বাক্সে মৃতের মোট সংখ্যা হাজারে পৌঁছয়নি এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে।

নবাগতদের টিন স্কোয়্যারে সার বেধে দাঁড় করানো হতো। বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোকের বাছাই কিন্তু শুধু ওদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, পুরনো লোকদের মধ্যে থেকেও সেই নির্বাচন হতো। প্রতি সকালে বিকেলে মাথাগুনতির উদ্দেশ্যই তো তাই। নবাগতদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ বা অসুস্থ, অধিকাংশ স্ত্রীলোক এবং শিশুদের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রমের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত করা হতো। তাদের লাইন থেকে সরিয়ে আলাদা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। বাদবাকি লোকেদের আবার গোনা হতো। যদি সেই সংখ্যা দাঁড়াতো ২০০০, তবে পুরনো বন্দীদের মধ্যে থেকে ২০০০জনকে বেছে নেওয়া হতো, যাতে ৫০০০ নবাগতের স্থলে মোট ৫০০০ যায় বধ্যভূমিতে। এইভাবেই আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হতো, অত্যধিক ভিড় যাতে না হয়। কেউ হয়তো ছ মাস ধরে বেগার খেটেও বেঁচে রইলো—

তার চেয়ে বেশী কেউ টিকতো না—কিন্তু যখন তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়লো, রশম্যানের চাবুক তার বুকে টোকা মারতো একদিন, চলে যেতো সে মৃতের সংখ্যা বাড়াতে।...

গোড়ার দিকে এইসব হতভাগ্যদের মার্চ করিয়ে শহরের বাইরে একটা বনে নিয়ে যাওয়া হতো। ল্যাটভিয়ানরা জায়গাটাকে বলতো বিকার-নিকার জঙ্গল, কিন্তু জার্মানরা এর নতুন নামকরণ করেছিলো 'হখওয়াল্ড' বা উর্ধ্ব অরণ্য। এখানে ঘন পাইনের ফাঁকে ফাঁকে মস্ত মস্ত গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিলো। রিগার ইহুদীদের মেরে ফেলবার আগে তাদের দিয়ে খুঁড়িয়ে নেওয়া হয়েছিলো এইসব গর্ত, তারপর এডুয়ার্ড রশম্যানের হুকুমে এবং তার চোখের সামনে গর্তের কিনারায় দণ্ডায়মান সেই ইহুদীগুলোকে মেসিনগানের গুলিতে পাইকারীভাবে মারা হলো, গর্তের মধ্যেই গিয়ে পড়লো তাদের দেহগুলো। রিগার বাকি ইহুদীদের দিয়ে লাশগুলোর ওপর একপরত মাটি দিইয়ে নেওয়া হলো। এবারে সেখানে গিয়ে পড়লো তাদেরই দেহগুলো। এইভাবে কয়েক স্তর লাশ পড়ে পড়ে এক-একটা গর্ত ভরে উঠতো, তারপর শুরু হতো আর একটা গর্ত ভরার কাজ।

যখনই কোন নতুন দলকে নির্মূল করতে নিয়ে যেতো, আমরা ঘেটো থেকে শুনতে পেতাম মেসিনগানের ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ। কাজ শেষ হয়ে গেলে দেখতে পেতাম পাহাড় থেকে তার খোলা গাড়িতে চেপে রশম্যান এসে ঘেটোর গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকছে।...

১৯৪২-এর জুলাইতে ভিয়েনা থেকে অস্ট্রিয়ান ইহুদীদের একটা নতুন বেশ বড় দল এলো। বোঝা গেলো তারা প্রত্যেকেই, বিনা ব্যতিক্রমে, 'বিশেষ ব্যবস্থা'র জন্যে চিহ্নিত ; কারণ দলটা ঘেটোতে মোটে এলোই না। আমরা তাদের চোখেও দেখলাম না, স্টেশন থেকে সোজা তাদের মার্চ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো উর্ধ্ব অরণ্যে, সেখানেই মেসিনগানে তারা খতম হয়ে গেলো। সন্ধ্যাবেলায় পাহাড় থেকে চারটে লরিতে করে তাদের পোশাকআশাকগুলো টিন স্কোয়্যারে নিয়ে আসা হলো বাছাই করবার জন্যে। বিশাল স্তূপ জড়ো হয়ে উঠলো, দালানের সমান উঁচু।

আলাদা আলাদা করে রাখা হলো প্রত্যেকটা বিভিন্ন জিনিস—জুতো, জামা, মোজা, আণ্ডারওয়্যার, প্যাণ্ট, স্কার্ট, ড্রেস, জ্যাকেট, দাড়ি কামানোর ব্রাশ, চশমা, বাঁধানো দাঁতের পাটি, বিয়ের আংটি, জড়োয়া আংটি, টুপি ইত্যাদি।

অবশ্য সেটাই ওখানকার নিয়ম। বধ্যভূমিতে মারবার আগে, কবরের ধারে, ওদের আগে ন্যাংটো করে ফেলা হতো; মালগুলো নিয়ে আসতো পরে। সেগুলো তারপরে বাছাই হয়ে রাইখে চলে যেতো। সোনা রূপো বা গয়নাগাঁটির দায়িত্ব নিতো রশম্যান নিজে।…

আগস্টে একটা দল এলো বোহেমিয়ার থেরেসিয়েনস্টাড ক্যাম্প থেকে। সেখানে কয়েক হাজার জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান ইহুদীদের ধরে রাখা হয়েছিলো, পূর্বাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে পরে হত্যা করার জন্যে। আমি টিন স্কোয়্যারের একটা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, রশম্যান পরম উৎসাহে লোক বাছাই করছিলো। ওদের সকলকে মাথা মুড়িয়ে আগের ক্যাম্পেই ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছিলো, তাই বোঝা মুশকিল হচ্ছিলো যে কে পুরুষ বা কে নারী। অবশ্য মেয়েরা বেশীর ভাগ খাটো জামা পরেছিলো, তাই থেকে খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছিলো। স্কোয়্যারের ওধারে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিলো যার আকৃতি দেখে আমার চেনা চেনা মনে হলো যদিও ভীষণ কৃশ চেহারা তার, রোগা ডিগডিগে, অনবরত কাশছিলো।

মেয়েটির সামনে এসে রশম্যান তার বুকে চাবুক দিয়ে একটা টোকা মেরে চলে গেলো। ল্যাটভিয়ান রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে লাইন থেকে বার করে স্কোয়্যারের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলো যেখানে অন্যান্য নির্বাচিতেরাও পঙক্তি সাজিয়ে অপেক্ষা করছিলো। সেদিন ওই দলের বহু লোকই ছিলো শারীরিক পরিশ্রমের অনুপযোগী, তাই নির্বাচিতের লাইনও হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বেশ লম্বা। তার অর্থ এই যে আমাদের পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে সেদিন অল্প লোককেই যেতে হবে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি তাতে নিস্পৃহ কারণ আমি তখন কাপো, অতএব নিরাপদ। কাপোর সদস্য হিসাবে আমার বাহুতে আর্মব্যাণ্ড, হাতে মুগুর, সামান্য বেশী খাদ্য খেয়ে খেয়ে শরীরে কিছু

তাগদও বেড়েছে। রশম্যান যদিও আমার মুখের ক্ষতচিহ্ন দেখেছিলো তবু তার সেসব কথা মনে নেই। কত লোকেরই তো চাবকে মুখের ছাল তুলে নিয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথাও নয়।

সেই গ্রীষ্মসন্ধ্যায় নির্বাচিতদের অধিকাংশকেই সার করে ঘেটো ফটক পার করিয়ে দিলো কাপোর দল। সেখান থেকে ল্যাটভিয়ান ফৌজেরা তাদের চার মাইল পথ মার্চ করিয়ে নিয়ে গেলো ঊর্ধ্ব অরণ্যে যেখানে মেশিনগানের গুলিতে তারা ছিন্নভিন্ন দেহে বীভৎস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

ফটকের সামনে সেদিনও দাঁড়িয়েছিলো গ্যাসের গাড়ি। নির্বাচিতদের মধ্যে থেকে যারা সবচাইতে দুর্বল বা অক্ষম, সেইরকম একশোজনকে ভিড় থেকে সরিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। আমি অন্য লোক-গুলোকে ফটক পার করে দিতে যাচ্ছিলাম যখন এস.এস. লেফটন্যান্ট ক্রাউস আমাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলোঃ 'এই হতচ্ছাড়াগুলো, এদের তুলে দে ডুনামুণ্ড কনভয়ে।'

অন্যেরা চলে গেলে আমরা পাঁচজন কাপো শেষ একশো হতভাগাকে ফটকের দিকে নিয়ে চললাম, গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। এদের বেশীর ভাগই হয় খোঁড়াচ্ছিলো, নয়তো হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলো কিংবা ভীষণ-ভাবে কাশছিলো। রোগা মেয়েটিও ছিলো এই দলে, যক্ষ্মার বিষম তাড়নায় তার বুকের খাঁচা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। কোথায় যাচ্ছে জানতো সে, ওরা সবাই তা জানতো, তবু বিনাবাক্যে হোঁচট খেতে খেতে চললো সকলের সঙ্গে, ভ্যানের পেছন দিকে। ভ্যানে ওঠবার পাদানি ছিলো অনেক উঁচুতে, উঠতে পারলো না মেয়েটি, বড়ই দুর্বল। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো আমার দিকে, সাহায্যের আশায়। আমিও তাকালাম; মুহূর্তে দুজনে দুজনের দিকে শুধু নীরব বিস্ময়ে চেয়েই রইলাম।

পেছনে পদধ্বনি শুনতে পেলাম। পাশে দাঁড়ানো কাপো দুজন অ্যাটেনশনে টানটান হয়ে দাঁড়িয়েই এক হাতে মাথার টুপি খুলে নামিয়ে নিলো। না দেখেও বুঝতে পারলাম কোন এস.এস. অফিসার এসেছে, কাজেই আমিও কেতামাফিক ওইসব করলাম। মেয়েটি আমার দিকে শুধু

নিষ্পলক চেয়ে থাকে। পেছন থেকে অফিসারটি সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেন রশম্যান। অন্য কাপো তুজনকে ইঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলে আমার দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। সেই ভেজা-ভেজা নীল চোখ। বুঝলাম, বেশ বুঝতে পারলাম যে এই চাউনির একটাই অর্থ ; টুপি নামিয়ে নিতে দেরি হয়েছে বলে আজ সন্ধ্যায় আমাকে চাবুক খেতে হবে।

নরম গলায় প্রশ্ন করলো, 'তোমার নাম কি ?'

'টউবের, হের ক্যাপ্টেন।' তখনো অ্যাটেনশনে সটান-টান দাঁড়িয়ে আছি।

'হুঁ···টউবের, একটু ঢিলে দেখাচ্ছে যে তোমাকে আজ। সন্ধ্যেবেলায় খানিকটা চাঙ্গা করে দেবো ?'

কিছু বললাম না, বলার কোন মানেও হয় না। দণ্ড তো দেওয়াই হয়ে গেলো। রশম্যানের দৃষ্টি কিন্তু গিয়ে পড়লো মেয়েটির ওপর, সামান্য কুঁচকেও উঠলো বোধহয়, সন্দেহ করেছে কিছু। ধীরে ধীরে তার মুখ সেই শ্বাপদ-হাসিতে ভরে উঠলো।

জিজ্ঞাসা করলো, 'এই মেয়েছেলেটাকে চেনো ?'

'হ্যাঁ, হের ক্যাপ্টেন।'

'কে ?'

জবাব দিতে পারলাম না। মুখ যেন কে সেলাই করে দিয়েছে।

'তোমার বউ ?'

নিঃশব্দে মাথা নীচু করলাম। রশম্যানের হাসি দীর্ঘতর হলো।

'কি হে টউবের, তোমার ভব্যতাবোধ কোথায় গেলো ? যাও, মহিলাটিকে ভ্যানে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করো।'

আমি কিন্তু নড়তে পারলাম না, পা যেন আঠা দিয়ে সাঁটা। রশম্যান তার মুখ নিয়ে এলো আমার কানের কাছে, ফিসফিসিয়ে বললো, 'দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম টউবের, ওকে ভ্যানে না তুললে তুমি নিজেও যাবে ওর সঙ্গে।'

ধীরে ধীরে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। এসথার তার ওপর ঝুঁকে

পড়ে ভ্যানে চড়লো। অন্য কাপো তুজন দরজা বন্ধ করবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওপরে উঠে আমার দিকে চাইলো এসথার, তু চোখ দিয়ে শুধু তু বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার গালে। আমাকে কিচ্ছু বলেনি সে, আমিও বলিনি। দরজাটা তারপর বন্ধ হয়ে গেলো, ভ্যান চলে গেলো। শেষ আমি দেখেছিলাম তার চোখ তুটো ছিলো আমার দিকে নিবদ্ধ।

কুড়ি বছর ধরে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি যে সেই দৃষ্টির অর্থ কি? প্রেম না ঘৃণা, বিদ্বেষ না মায়া, বিভ্রান্তি না উপলব্ধি? কখনো জানতে পারবো না।

ভ্যান চলে যাবার পর রশম্যান আবার আমার দিকে ফিরলো। তখনো তার মুখে হাসি। বললো, 'তুমি বেঁচে থাকতে পারো টউবের, যদ্দিন তোমাকে শেষ করে ফেলবার খেয়াল আমাদের না হয়। কিন্তু এখন থেকে তুমি মৃত।'

ঠিক কথা বলেছিলো সে, নির্ভুল সত্য। সেইদিন আমার অন্তরে আমার আত্মার ঘটলো মৃত্যু। তারিখটা ছিলো ২৯শে আগস্ট, ১৯৪২।···

পিটার মিলার বহু রাত অবধি পড়তে থাকলো। একঘেয়ে লাগছে, অথচ সম্মোহিত যেন। কয়েকবার চেয়ারে পিঠ এলিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেললো, মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনবার জন্যে। তারপর আবার পড়তে থাকলো।

একবার, প্রায় মধ্যরাত্রে, খাতা বন্ধ করে কিছু কফি বানিয়ে আনলো। পর্দা টেনে দেবার আগে জানলায় দাঁড়িয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকায়। ঝকঝকে নিওন আলোয় কাফে-চেরির বিজ্ঞাপন উজ্জ্বল করে দিয়েছে স্টাইণ্ডামের এই দিকটা। দেখলো বাড়তি উপার্জনের লোভে একটা পার্ট-টাইম মেয়ে একজন ব্যবসাদারের বাহুতে ভর দিয়ে চলেছে। একটু দূরে একটা ভাড়াটে ঘরে গিয়ে ঢুকলো তারা, যেখানে ব্যবসাদারের মোটা ব্যাগ থেকে একশো মার্ক খসে যাবে আধঘণ্টা সঙ্গমের জন্যে।

মিলার পর্দা টেনে দিলো। কফি শেষ করে আবার শুরু করলো সলোমন টউবেরের ডায়রি পড়তে।

···১৯৪৩-এর শরতে বার্লিন থেকে নির্দেশ এলো ঊর্ধ্ব-অরণ্যে যে হাজার-লক্ষ মৃতদেহ আছে, সেগুলোকে যেন আরো পাকাপাকিভাবে

নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়, হয় আগুন দিয়ে নইলে চুন লেপে। কাজটা বলা সহজ কিন্তু করা শক্ত। শীত এগিয়ে আসছে, জমি শক্ত হয়ে জমে যাচ্ছে। রশম্যানের মেজাজ খারাপ, কিন্তু নির্দেশ পালন করবার জন্যে খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করতেই সে ব্যস্ত রয়ে গেলো, আমাদের কাছে আসবার আর সময় পেলো না।

দিনের পর দিন নতুন-গড়া মজুরদের দলগুলোকে দেখা গেলো পাহাড়ে উঠে জঙ্গলে যাচ্ছে গাঁইতি-কোদাল-শাবল নিয়ে। তারপর দিনের পর দিন জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে উঠলো ঘন কালো ধুঁয়ো। ওই কাজে জঙ্গলের পাইন গাছগুলোকে কেটে কেটে জ্বালালো। কিন্তু পচা-গলা মৃতদেহ সহজে জ্বলে না তাই কাজটা চললো অত্যন্ত ধীরগতিতে। শেষে আগুন ফেলে চুন ধরলো। মৃতদেহের প্রত্যেকটা স্তরের ওপর একেক পরত চুন ঢাললো আর ১৯৪৪-এর বসন্তে মাটি যখন আবার নরম হলো, গর্ত বুজিয়ে দিলো।*

মজুরদের দলগুলো কিন্তু ঘেটোর লোক দিয়ে গড়া হয়নি। তারা এসেছিলো এই এলাকার জঘন্যতম ক্যাম্প সালাস-পিলস থেকে। সেখানে এদের মানুষের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে রাখা হতো। পরে এদের নির্মূল করা হয় একেবারেই কিচ্ছু না খেতে দিয়ে। অনশনে মরলো সবাই, মরীয়া হয়ে একে অন্যের মাংস খুবলে খুবলে খেলেও বাঁচেনি কেউ।…

১৯৪৪-এর বসন্তে যখন কাজটা প্রায় শেষ হয়ে গেলো তখন এই ঘেটো ধ্বংস করে ফেলা হলো। এর প্রায় ৩০,০০০ অধিবাসীকে মার্চ করিয়ে নিয়ে গিয়ে উধ্ব-অরণ্যে শেষবারের মতো নরবলির যজ্ঞ সমাপন করা হলো। আমরা, প্রায় ৫০০০ জন, কাইজারওয়াল্ডের ক্যাম্পে বদলি হলাম। তার পরেই ঘেটোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। ছাইগুলোকেও বুলডোজার দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে ফেলা হলো। সেখানে যা ছিলো তার কোন চিহ্নই রইলো না, শুধু একরের পর একর ছাইচাপা মাটি।…

* এই উপায়ে মৃতদেহগুলো জ্বলে গেলেও হাড় নষ্ট হয়নি। রাশিয়ানরা পরে এখানে ৮০,০০০ নরকঙ্কাল পায়।

এরপর টউবেরের ডায়রির আরো কুড়ি পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে কি করে কাইজারওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রোগ, অনাহার, অত্যধিক শ্রম এবং ক্যাম্পরক্ষীদের পাশবিকতা থেকে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলেছিলো দিনের পর দিন। এই সময়ে এস.এস. ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যানের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। নিশ্চয় সে তখনো রিগাতেই ছিলো। টউবের আরো বর্ণনা দিয়েছে যে ১৯৪৪-এর অক্টোবরের প্রারম্ভে প্রতিহিংসাপরায়ণ রাশিয়ানরা যদি চলে আসে সেই আশঙ্কায় ভীত-শঙ্কিত এস.এস.রা রিগা থেকে সমুদ্রপথে পালিয়ে যাবার ফন্দী করেছিলো, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে শেষ কজন জীবিত বন্দীদের, তারাই এখন পশ্চিমে রাইখে ফিরে যাবার ছাড়পত্র।

…১১ই অক্টোবর অপরাহ্নে আমরা, সংখ্যায় তখন প্রায় ৪০০০, রিগা শহরে এসে পৌঁছুলাম। সার বেঁধে সোজা জাহাজঘাটায় এলাম আমরা। দূরদিগন্তে দেখলাম আলোর ঝলকানি এবং বিকট আওয়াজ, যেন বজ্র-বিদ্যুৎ। কিছুক্ষণ আমরা কিছুই বুঝলাম না, অভিভূত হয়ে রইলাম, কারণ বোমাবর্ষণ বা গোলাফাটার দৃশ্য আমাদের একেবারে অপরিচিত। পরে বুঝলাম, কারণ মন তো অসাড় হয়ে ছিলো ক্ষুধায় এবং ঠাণ্ডায় কাজেই চট করে কিছু আর আমাদের মাথায় ঢুকতো না যে ওগুলো রাশিয়ান মর্টারের শব্দ, রিগা শহরের উপকণ্ঠ অঞ্চলগুলোতে ফাটছে।

জাহাজঘাট এস.এস. অফিসার এবং ফৌজে ঠাসা। এতজন এস.-এস.কে আমি কোনদিন একসঙ্গে দেখিনি। আমাদের চেয়েও বোধহয় ওদের সংখ্যাই বেশী। একটা মালগুদামের দেওয়ালের সঙ্গে আমাদের সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। ভাবলাম এই বুঝি শেষ, এবারে মেসিনগান চালিয়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না।

এস.এস.রা বোধহয় আমাদের কাজে লাগাতে চেয়েছিলো। যে লাখ-লাখ ইহুদী রিগার ভেতর দিয়ে চলে গেছে তাদেরই অবশিষ্ট অংশ আমরা। আমরাই এখন ওদের নিরাপত্তার টিকিট, রাইখে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ছুতোয় রাশিয়ান আক্রমণের মোকাবিলা ওদের আর করতে হবে না, দেশে ফেরবার ছুতো আছে। ছ নম্বর কোয়েতে দাঁড়িয়েছিলো আমাদের জলযান, একটা মালবাহী জাহাজ। রাশিয়ান ব্যূহ থেকে পালিয়ে

আসতে পেরেছে এইটাই শেষ জাহাজ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম যে একটু দূরের অন্য ছুটো মালগুদাম থেকে স্ট্রেচারে করে শয়ে শয়ে আহত জার্মান সৈন্যকে বয়ে নিয়ে জাহাজটায় তুলছে।…

ক্যাপ্টেন রশম্যান যখন এসে পৌঁছলো তখন প্রায় অন্ধকার। জাহাজটায় কি তোলা হচ্ছে তা দেখবার জন্যে থমকে দাঁড়ালো। যেই চোখে পড়লো যে জখ্‌মি জার্মান সৈন্য উঠছে, অমনি স্ট্রেচারবাহক মেডিকাল অর্ডারলিদের দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'থামাও ওগুলো।'

কোয়ের এধারে এসে সোজা একজন অর্ডারলির মুখে মারলো এক বিরাট থাপ্পড়। তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে ঘুরে গিয়ে আমাদের বন্দীদের দিকে চেয়ে গর্জে উঠলো, 'হারামজাদাগুলো, জাহাজে ওঠ্। ওগুলোকে নামিয়ে নীচে নিয়ে আয়। এই জাহাজটা আমাদের।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই এস.এস. ফৌজিরা আমাদের কোমরে বন্দুকের গুঁতো মারতে মারতে এগিয়ে নিয়ে চললো পাটাতনের তক্তার দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যান্য এস.এস. ফৌজিরা যারা এতক্ষণ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজে আহত সৈন্য তোলা দেখছিলো, তারাও এগিয়ে এলো। বন্দীদের পেছনে পেছনে তারাও এসে চড়লো জাহাজে। ডেকের ওপর পৌঁছে স্ট্রেচার তুলে নামাতে যাচ্ছি আরেকটা চিৎকারে থমকে দাঁড়ালাম।

আমার খুব কাছে এসে, তক্তার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন আর্মি-ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে পড়লো। স্ট্রেচারগুলো নামানো হচ্ছে দেখে গর্জন করে উঠলো, 'কে তোমাদের বলেছে এদের নামাতে?'

রশম্যান ওর পেছন থেকে এগিয়ে এসে বললো, 'আমি বলেছি। এই জাহাজ আমাদের।' ক্যাপ্টেন সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো। পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বের করে বললো, 'এই জাহাজটা পাঠানো হয়েছে আহত জঙ্গীদের নিয়ে যাবার জন্যে, আর শুধু তারাই যাবে এই জাহাজে।'

বলেই আবার চেঁচিয়ে আর্মি অর্ডারলিদের হুকুম দিলো আহতদের তোলবার জন্যে। রশম্যানের দিকে তাকালাম আমি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো, ভেবেছিলাম রাগে। কিন্তু দেখলাম রাগে নয়, ভয়ে। রাশিয়ানদের

সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়। তারা তো আর আমাদের মত নিরস্ত্র নয়।

অর্ডারলিদের দিকে তাকিয়ে বিকট রবে চিৎকার করে উঠলো, 'ওদের নামিয়ে রাখো, তুলবে না। রাইখের নামে আমি এই জাহাজ আনিয়েছি।' কেউ শুনলো না তার কথা, ওয়েরম্যাখট (জার্মান সশস্ত্রবাহিনী) ক্যাপ্টেনের হুকুমই তারা পালন করতে থাকে। আমার থেকে মোটে দু মিটার দূরে দাঁড়িয়েছিলো সেই ক্যাপ্টেন, তার মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ক্লান্তি আর অবসাদে ফ্যাকাশে মুখ, দু চোখের কোলে গভীর কালি। নাকের দু পাশ বেয়ে ভাঁজ নেমেছে, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আবার লোডিং শুরু হতেই রশম্যানের পাশ দিয়ে যাতায়াত করলো কয়েকবার, কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে। কোয়ের ওপর তুষারে রাখা আছে সারি-সারি স্ট্রেচার; তার মধ্যে থেকেই একটা গলা শুনতে পেলাম, হাম্বুর্গি-টানে বলছে, 'বেশ করেছেন ক্যাপ্টেন, ভাল সমঝে দিয়েছেন শুয়োরটাকে।'

ক্যাপ্টেন এবার রশম্যানের পাশাপাশি আসতেই রশম্যান খপ করে তার হাত ধরে সামনের দিকে মুখটাকে ঘুরিয়ে দিলো। দস্তানা-পরা হাত দিয়ে আর্মি-অফিসারের মুখে মারলো এক চড়। আমি রশম্যানকে চড় মারতে দেখেছি বোধহয় বহু হাজার বার, কিন্তু এ রকম পরিণাম আর কখনো দেখিনি। ক্যাপ্টেন চড় খেয়ে মাথাটা ঝেড়ে নিলো, তারপর মুঠি পাকিয়ে বিশাল এক পাঞ্চ দিলো রশম্যানের চোয়ালে। কয়েক ফিট দূরে গিয়ে পড়লো সে, চিৎ হয়ে, তুষারের ওপরে। মুখের কশ বেয়ে রক্তের ক্ষীণ ধারা নামলো। ক্যাপ্টেন কালবিলম্ব না করে অর্ডারলিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো।

আমি দেখলাম যে রশম্যান তার এস.এস. অফিসারের লুগার পিস্তলটাকে খাপ খুলে বের করে নিয়ে তাক করলো। গুলি করলো ক্যাপ্টেনের একেবারে দু কাঁধের মাঝখানে। পিস্তলের শব্দ হতেই নিমেষে সব স্তব্ধ। আর্মির ক্যাপ্টেনটি টাল সামলাবার জন্যে ঘুরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে রশম্যান আবার গুলি ছুঁড়লো, এবারে বুলেট গিয়ে লাগলো ক্যাপ্টেনের গলায়। পেছন দিকে ঘুরে গেলো তার দেহ, কোয়ের মাটিতে এসে আছড়ে পড়বার আগেই মৃত্যু ঘটে গিয়েছিলো তার। গলায় কি একটা পরেছিলো, বুলেট লেগে

সেটা খুলে গিয়ে খানিকটা তফাতে পড়লো। আমাকে বলা হয়েছিলো দেহটা নিয়ে ঘাটে ফেলে দিতে। ফেলতে গিয়ে দেখলাম যে সেটা রিবনে বাঁধা একটা মেডেল। ক্যাপ্টেনটির নাম আমি জানতে পারিনি, কিন্তু মেডেলটি হচ্ছে, "নাইট'স ক্রশ", ওকপাতার গুচ্ছসুদ্ধ।...

মিলার ডায়রির এই পৃষ্ঠাটা পড়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলো। বারবার পড়লো। মনে প্রথমে জন্মালো অবিশ্বাস, সন্দেহ, তারপর আবার বিশ্বাস এবং শেষে ভয়ঙ্কর ক্রোধ। বোধহয় বার দশেক ধরে পড়লো এই পৃষ্ঠা, যাতে সব সন্দেহের নিরসন হয়, কোন দ্বিধা না থাকে। তারপর আবার ডায়রির পাতা উল্টে পড়তে শুরু করলো।

...আমাদের তখন আবার বলা হলো যে ওয়েরম্যাখট-আহতদের জাহাজ থেকে নামিয়ে কোয়ের ধারে ওই পড়ন্ত তুষারের ভেতরে যেন ফেলে রাখি।...

সবাইকে নামিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে হুকুম মাফিক আমরা গিয়ে জাহাজে উঠলাম। আমাদের পুরো দলটাকে দু ভাগে ভাগ করে জাহাজের খোলে ঢোকানো হলো, সামনে অর্ধেক আর পেছনে বাকি অর্ধেক। এমন ঠাসাঠাসি যে নড়াচড়ারও স্থান নেই। হ্যাচ নামিয়ে দিয়ে এস.এস.রা জাহাজের ওপরে রইলো। মাঝরাতের একটু আগে রওনা দিলাম, যাতে ভোরের আগেই ল্যাটভিয়া উপসাগরের অনেকটা গভীরে জাহাজ চলে যেতে পারে, তবেই তো পাহারাদার রাশিয়ান স্টর্মোভিকদের চোখ এড়ানো যাবে।...

তিনদিন লাগলো ড্যানজিগে পৌঁছতে, জার্মান লাইনের অনেকটা ভেতরে। কিন্তু এই তিনদিন আমাদের অনন্ত নরকযাত্রা ভোগ করতে হলো। ডেকের নীচে অন্ধকার বদ্ধ স্থান, জাহাজের সাংঘাতিক দোলানি, তার ওপর না পানীয় জল না কোন খাদ্য। একেবারে নিরম্বু উপবাসে রাখলো আমাদের। পেটে কোন খাবার নেই অথচ সবায়েরই সমুদ্রপীড়া। বমি করতে করতে পেটের নাড়ীভুঁড়ি যেন বেরিয়ে এলো, অসহ্য অবসাদে মারা গেলো কত লোক। ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, ঠাণ্ডায়, বদ্ধ-বাতাসে দম আটকেও কত লোক মারা গেলো। আবার কিছু লোক মারা গেলো শুধু জীবিত থাকবার ইচ্ছাটুকু

হারিয়ে ফেলেছে বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আমাদের ৪০০০এর এক-চতুর্থাংশই জীবন দিয়ে দিলো এই জাহাজে। জাহাজ নোঙ্গর করা হলে যখন হ্যাচ খুলে দেওয়া হলো, তখন তুহিনশীতল হাওয়া এসে আমাদের খোলের ভেতরে হু হু করে ঢুকে পূতিগন্ধময় রুদ্ধ-বাতাসকে ঘুলিয়ে দিলো।

ড্যানজিগের কোয়েতে আমাদের নামানো হলো। মৃতদেহগুলোকে জাহাজ থেকে নিয়ে এসে সার সার করে রাখা হলো। আমরাও তাদের পাশে দাঁড়ালাম, যাতে মাথা গুণতি ঠিক হয়। রিগা থেকে যতজন জাহাজে চড়েছিলাম তার হিসাব ওদের মেলাতে হবে। এস.এস.রা সংখ্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগী।

পরে জানতে পেরেছিলাম রাশিয়ানরা ১৪ই অক্টোবর তারিখে রিগা দখল করে নিয়েছিলো, অর্থাৎ আমরা যখন মাঝদরিয়ায়...

টউবেরের যন্ত্রণাকাতর উপাখ্যান শেষ হয়ে এলো। ড্যানজিগ থেকে অবশিষ্ট বন্দীদের বজরায় চাপিয়ে নিয়ে গেলো স্টুটহফের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেই-খানেই, ১৯৪৫-এর প্রথম কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত, টউবের দিনের বেলায় কাজ করতো বুরগ্র্যাবেনের সাবমেরিন কারখানায় আর রাতে গিয়ে ক্যাম্পে থাকতো। স্টুটহফে পুষ্টির অভাবে মরলো আরো কয়েক হাজার। সে ওদের সবাইকেই মরতে দেখলো কিন্তু নিজে কোনমতে বেঁচে রইলো।

১৯৪৫-এর জানুয়ারিতে যখন অগ্রগামী রুশ সৈন্যেরা ড্যানজিগ অবরোধ করে ফেললো, তখন এস.এস. ফৌজ স্টুটহফ ক্যাম্পের বাকি জীবিত বন্দীদের পশ্চিমের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো। শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তুষার-ঢাকা পথ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে বার্লিন অভিমুখে চললো এই পদাতিক অভিযান,—মৃত্যুমিছিল নামে যা কুখ্যাত। জার্মানীর পূর্বপ্রদেশ দিয়ে পশ্চিম দিকে ছায়াশরীরগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চললো এস.এস.এর দল; কারণ সেগুলোই তাদের নিরাপত্তার একমাত্র টিকিট। সেই ভয়ঙ্কর পদযাত্রায়, তুষার এবং হিমবাত্যায়, মাছির মতো দলে দলে বন্দী মারা গেলো।

তবু টউবের বেঁচে রইলো। পৌঁছলো এসে বার্লিনের পশ্চিমে, ম্যাগডেবুর্গে। এইখানে এস.এস.রা ওদের ছেড়ে দিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে যে যার পথ ধরে ছুটলো। টউবেরের দলকে তারা রেখে গিয়েছিলো ম্যাগডেবুর্গ জেলখানায়,

হোমগার্ডের কিছু বুড়োলোক ছিলো সেই জেলের হেফাজতে। কয়েদীদের দেবার মতন কোন খাবার নেই অথচ মিত্রশক্তি এগিয়ে আসছে, ওরা বুঝতে পারে না কি করবে, বড়ই অসহায় তারা, বড়ই উদভ্রান্ত। বন্দীদের মধ্যে যাদের শরীরে তখনো কিছু সামর্থ্য আছে, তাদের অনুমতি দিয়ে দিলো যেন আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে যা পারে খুঁটে খায়।

…এডুয়ার্ড রশম্যানকে আমি শেষবারের মতো দেখেছিলাম যখন ড্যানজিগ বন্দরে জেটির ধারে আমাদের গুণতি করা হচ্ছিলো। শীতের ঠাণ্ডা বাঁচানোর জন্যে দেহে যথেষ্ট গরম পোশাক জড়িয়ে একটা মোটরকারে গিয়ে উঠছিলো সে। তখন ভেবেছিলাম রশম্যানকে বোধহয় আর আমি কখনো দেখবো না, কিন্তু তাকে আমি আর একবার দেখেছিলাম। সে-দিনটা ছিলো ৩রা এপ্রিল ১৯৪৫।

সেদিন আমি শহরের পূর্ব দিকে গার্ডেলেগেন নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। আমি এবং আমার তিনজন সঙ্গী সেই গাঁ থেকে ঝোলাভর্তি আলু যোগাড় করে সেই চোরাই মাল নিয়ে খিকিয়ে খিকিয়ে হাঁটছি, দেখলাম পেছন থেকে একটা গাড়ি পশ্চিমমুখে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, তাই সেটাকে পাশ কাটাতে গাড়িটা একটু থামলো। অলস নিরুৎসাহভরে একবার তাকিয়েই দেখলাম গাড়িটায় রয়েছে চারজন এস.এস. অফিসার—নিশ্চয়ই পালাচ্ছে পশ্চিমের দিকে। ড্রাইভারের পাশে দেখি আর্মি-কর্পোর‍্যালের একটা কোট নিয়ে গায়ে টেনে-টুনে পরছে এডুয়ার্ড রশম্যান।

সে আমাকে দেখতে পায়নি কারণ আমি কনকনে হাওয়া থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে একটা পুরনো বস্তা কেটে মাথা-মুখ-ঢাকা টুপি বানিয়ে পরে নিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমি ওকে দেখেছিলাম, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

চারজনে চলন্ত গাড়িতেই পোশাক বদলে নিচ্ছিলো। গাড়িটা বাঁকের মুখে আসতে দেখলাম তার জানলা দিয়ে কি যেন একটা ফেলে দেওয়া হলো। কয়েক মিনিট পরে সেই জায়গাটায় যখন পৌঁছলাম, ঝুঁকে পড়ে দেখি ওটা এস.এস. অফিসারের একটা জ্যাকেট, একপাশে রয়েছে ওয়াফেন-এস.এস.এর যুগ্ম বিদ্যুৎ রেখা, অন্য দিকে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক।

এস.এস. ক্যাপ্টেন রশম্যান অন্তর্হিত হয়ে গেলো।···

চব্বিশ দিন পরে এলো মুক্তি। আমরা আর তখন বেরোতাম না, কারণ চারদিকে ভীষণ অরাজকতা। বরঞ্চ জেলখানায় বসে অনাহারে থাকাও শ্রেয়। ২৭শে এপ্রিল শহরে অদ্ভুত শান্তি, চুপচাপ একেবারে। বেশ কিছুক্ষণ হলো সকাল হয়েছে। বুড়ো গার্ডদের একজনের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছিলাম ; বিষম ভয় খেয়ে গেছে সে, ঘণ্টাখানেক ধরে আমাকে বোঝালো যে সে বা তার অন্য সহকর্মীরা কেউই অ্যাডলফ হিটলারকে ভক্তিটক্তি করতো না, ইহুদী নির্যাতনে তো তারা কোন অংশই নেয়নি।

বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। ফটকে তালাবন্ধ, শুনলাম জোরে জোরে কে আওয়াজ করছে। বুড়ো হোমগার্ড গেলো সেটা খুলতে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে একটা লোক এগিয়ে এলো, হাতে উদ্যত রিভলভার, পরনে পুরো ব্যাটল্ ড্রেস। সে ধরনের ইউনিফর্ম আমি আগে দেখিনি।

মনে হলো লোকটা অফিসার, কারণ তার সঙ্গে ছিলো আরো একজন সৈনিক, তার মাথায় টিনের গোল টুপি, হাতে রাইফেল। লোক দুটো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। নির্বাক হয়ে শুধু চারধার দেখে। তাদের চোখে পড়ে যে জেলখানার উঠোনে ডাঁই করে রাখা আছে পঞ্চাশটি মৃতদেহ—গত দু সপ্তাহ ধরে যারা মরেছে, যাদের গোর দেবার মতো শারীরিক সামর্থ্য কারোর নেই। অন্যেরা অর্ধ-জীবিত, দেওয়ালের ধার ঘেঁষে বসে রোদ্দুরের সামান্য উত্তাপ পোয়াচ্ছে, দেহের অজস্র ক্ষতস্থানগুলো থেকে পুঁজ গড়াচ্ছে, দুর্গন্ধ উঠছে চারদিকে।

লোক দুটো পরস্পরের দিকে তাকালো, তারপর হোমগার্ডটির দিকে। অপ্রস্তুতভাবে ফিরে তাকায় বুড়ো। আমতা-আমতা করে কি একটা বলে উঠলো, বোধহয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শিখেছিলো। বললো ঃ

'হ্যালো টমি।'

অফিসারটি আর একবার তার দিকে তাকিয়ে উঠোনের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। পরিষ্কার ইংরেজীতে বলে উঠলো, 'বাঞ্চোৎ ক্রাউট শুয়োর!'

আর ঠিক তক্ষুণি হঠাৎ আমি কেঁদে ফেললাম।···

জানি না কি করে আমি হাম্বুর্গে ফিরলাম, কিন্তু ফিরেছিলাম ঠিকই। মনে হয় দেখতে চেয়েছিলাম পুরনো জীবনের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, কিন্তু কিচ্ছু ছিলো না। যে সব অঞ্চলে আমি জন্মেছিলাম, বড় হয়ে উঠেছিলাম সে সবই বোমার ঘায়ে, আগুনে, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যে অফিসে আমি চাকরি করতাম সেটাও, আমার ফ্ল্যাটখানাও, সবই।

ইংরেজরা আমায় কিছুদিন ম্যাগডেবুর্গের হাসপাতালে রেখে দিয়েছিলো। কিন্তু আমি স্ব-ইচ্ছায় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম; হিচ-হাইক করে দেশে পৌঁছলাম। কিন্তু পৌঁছে দেখি কিচ্ছু নেই। তখন, অতদিন পরে, আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লাম। রুগী হয়ে কাটালাম একটা বছর হাসপাতালে যেখানে বার্জেন-বেলসের নামে একটা জায়গা থেকে ফিরে আসা আরো বহু রুগী ছিলো। তারপর আরো একটা বছর হাসপাতালেই অর্ডারলির কাজ করলাম, যারা আমার চেয়েও দুর্ভাগা তাদের দেখাশোনা করে কাটিয়ে দিলাম।

সেই কাজের শেষে হাম্বুর্গে এলাম, আমার জন্মস্থান। একটা ঘর খুঁজে নিয়ে আস্তানা গাড়লাম, জীবনের বাকি কটা দিন সেখানেই কাটিয়ে দেবো।...

ডায়রির শেষে নতুন টাইপ-করা দুটো পৃষ্ঠা ছিলো; কাহিনীর উপসংহার।

আলটনার এই ঘরে আমি ১৯৪৭ থেকে বাস করছি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে স্থির করলাম যে রিগাতে আমার ওপর এবং আমার অন্যান্য সঙ্গীদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছিলো তার কাহিনী লিখবো।

কিন্তু শেষ করবার আগেই বুঝলাম যে আমার মতো আরো বহু ব্যক্তি বেঁচে ফিরে এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন, অনেক প্রামাণিক সাক্ষ্য দিতে পারেন। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ওপর এখন শয়ে শয়ে বইও লেখা হয়েছে, অতএব আমার উপাখ্যানে কেউই বিশেষ আগ্রহী হতে পারে না। আমি এটা কাউকে পড়তেও দিইনি।

আমার এখন মনে হচ্ছে যে আমার সেই যে চেষ্টা, বেঁচে ফিরে প্রমাণ

লিপিবদ্ধ করে রাখবো, সেটা নেহাৎই সময়ের এবং শক্তির অপব্যবহার, কারণ অনেকেই আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে এই কাজ করেছেন। এখন আমার আপশোশ হচ্ছে কেন আমি রিগাতে এসথারের সঙ্গে মৃত্যু-বরণ করিনি।

আমার শেষ ইচ্ছা ছিলো যে দেখবো এডুয়ার্ড রশম্যান আসামীর কাঠ-গড়ায়, তার বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দেবো। কিন্তু সে ইচ্ছাও আমার পূর্ণ হবে না ; আমি তা এখন জানি।

কখনো কখনো আমি রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াই, পুরনো দিনের কথা স্মরণ করি, কিন্তু সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না। ছেলেরা আমাকে দেখে হাসে, বন্ধুত্ব করতে গেলে পালায়। একদিন একটা ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, মেয়েটি আমাকে দেখে পালায়নি, কিন্তু তার মা চিৎকার করতে করতে এসে তাকে আমার সামনে থেকে টেনে নিয়ে চলে গেলো। কাজেই আমি লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কথা বলি না।

একবার একজন স্ত্রীলোক এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললো যে ক্ষতিপূরণ দপ্তর থেকে সে এসেছে, আমি নাকি কিছু টাকা পাবো। আমি বললাম টাকা আমি চাই না। ভীষণ ভগ্নোদ্যম হয়ে গেলো মেয়েটি। বললো কৃতকর্মের জন্যে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার আমার আছে। আমি তা সত্ত্বেও অস্বীকার করলাম। তারপর আরো একজন এলো, আমি আবার অস্বীকার করলাম। সেই লোকটি বললো যে ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করা নাকি ঠিক না। তার কথায় আমার মনে হলো যে সে বলতে চাইছে অস্বীকার করলে তাদের কেতাবের উল্লঙ্ঘন হবে। কিন্তু আমি তো শুধু সেটুকুই নেবো যেটুকু আমার তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য।

ব্রিটিশ হাসপাতালে যখন ছিলাম তখন তাদের একজন ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি ইস্রায়েলে চলে যাচ্ছি না কেন, সেই দেশ তখন স্বাধীনতা পেতে চলেছিলো। কি করে আমি তাঁকে বোঝাবো ? তাঁকে আমি বলতে পারলাম না যে সেই ভূমিতে আমি কখনই পদার্পণ করতে পারি না, অন্তত আমার স্ত্রী এসথারের সঙ্গে আমি যা করেছিলাম তার পরে তো নয়ই। আমি প্রায়ই সে দেশের কথা ভাবি কেমন সেই

জায়গা, স্বপ্নেও দেখি, কিন্তু যাবার উপযুক্ত আমি নই।

তবে আমার এই কহিনী যদি কোনদিন ইস্রায়েল ভূমিতে পঠিত হয়, যে-দেশ আমি কোনদিন চোখে দেখবো না, তবে সেখানে কি কেউ আমার উদ্দেশ্যে কোনদিন খাদ্দিশ পড়বেন ?

সলোমন টউবের,
আলটনা, হাম্বুর্গ,
২১শে নভেম্বর ১৯৬৩

ডায়রিটাকে নামিয়ে রেখে পিটার মিলার চেয়ারে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো। সিগারেট খেতে খেতে ছাতের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভোর পাঁচটা নাগাদ ফ্ল্যাটের দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। সিগি ফিরলো কাজ থেকে। তখনো ওকে জেগে থাকতে দেখে সিগি অবাক।

"কি করছিলে এতক্ষণ ধরে ?"

মিলার বললো, "পড়ছিলাম।"

সেণ্ট মাইকেলিসের উঁচু গির্জা-চূড়ায় ভোরের প্রথম আলো যখন ফুটলো ওরা তখন বিছানায়। সিগি তন্দ্রাতুর, সম্ভোগে পরিতুষ্ট। মিলার ছাতের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে।

"কি ভাবছো ?" একটু পরে সিগি শুধালো।

"শুধু ভাবছি।"

"সে তো দেখছিই। কি ভাবছো ?"

"এবারে যে কাজটা শুরু করবো, সেইটা।"

আরো কাছে সরে এলো সিগি। "কি করতে যাচ্ছো এখন ?"

কাত হয়ে ওপাশের ছাইদানিতে সিগারেটটা গুঁজে দিতে দিতে মিলার বললো, "একটা লোককে খুঁজে বার করবো।"

তিন

হাম্বুর্গে যখন পিটার মিলার ও সিগি পরস্পরের বাহুবন্ধনে ঘুমোচ্ছিলো, তখন কাস্তিলে আঁধারের ছোপ-ধরা পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে আর্জেন্তিন এয়ারলাইন্সের মস্তবড় একটা করোনাদো বিমান বাঁক ঘুরলো মাদ্রিদের বারাজাস এয়ারপোর্টে নামবার জন্যে।

ফার্স্ট ক্লাসের তৃতীয় সারিতে জানলার ধারে যে বসেছিলো তার বয়স প্রায় ষাট, লৌহধূসর চুল আর সযত্নে ছাঁটা গোঁফ।

লোকটার অগেকার চেহারার একটা মাত্রই ফটো ছিলো; তখন তার বয়স ছিলো চল্লিশের একটু ওপরে, কদমছাঁট চুল, কোন গোঁফ-টোঁফ ছিলো না বলে ইঁদুর মারার জাঁতাকলের মতন মুখটা পরিষ্কার তকতকে দেখা যেতো, মাথার বাঁ পাশে ক্ষুর চালিয়ে লম্বা সোজা সিঁথি কাটা। যারা সেই ফটো দেখেছে তারা আজ বিমানে উপবিষ্ট এই চেহারার সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাবে না; চুল এখন ঘন, পেছনে উল্টে দেওয়া, কোন সিঁথি-ফিঁথি নেই। নতুন চেহারার সঙ্গে বেশ মিল আছে পাসপোর্টের ফটোর।

পাসপোর্টের পরিচয় অনুসারে লোকটার নাম সেনর রিকার্দো সুরেতেস, আর্জেন্টিনার নাগরিক। ওই নামটাই কিন্তু জগতের ওপর একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা, কারণ স্প্যানিশ ভাষায় সুরেতে কথাটার অর্থ ভাগ্য আর ভাগ্যের জার্মান প্রতিশব্দ হচ্ছে গ্ল্যুক। জন্মাবার সময় লোকটার নামকরণ হয়েছিলো রিচার্ড গ্ল্যুকস; পরে সে এস.এস.এর পূর্ণ জেনারেল হয়, রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদর দপ্তরের কর্তৃত্বপদ পায়, কনসেনট্রেসন ক্যাম্পগুলোতে হিটলারের পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হয়। পশ্চিম জার্মানী ও ইস্রায়েল থেকে ঘোষিত ফেরারী তালিকায় এর নাম গুরুত্ব অনুসারে তৃতীয় নম্বর,—মার্টিন বর্ম্যান ও প্রাক্তন গেস্টাপো-অধিপতি হাইনরিখ ম্যুলেরের পরেই। অউশউইৎসের শয়তান-ডাক্তার ডাঃ জোসেফ মেঙ্গেলের চেয়েও উঁচু র‍্যাঙ্ক। ওডেসা সংগঠনে এর স্থান ছ নম্বরে, মার্টিন

বর্ম্যানের নীচেই ; ১৯৪৫-এর পর ফ্যুয়েরারের প্রেত তো বর্ম্যানকেই আশ্রয় করেছে।

এস.এস. দলের সমস্ত অপকীর্তিতেই রিচার্ড গ্ল্যুকসের ভূমিকা ছিলো অসামান্য। ধূর্ততায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত ; যেভাবে ১৯৪৫-এর মে মাসে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলো তাতেই বোঝা যায় কত কূটবুদ্ধি ধরে। অ্যাডলফ আইখ-ম্যানের চেয়েও গ্ল্যুকসের অবদান ছিলো অনেক বেশী সেই ব্যাপক হত্যা-কাণ্ডে, অথচ সে নিজে কোনদিন ট্রিগার টেপেনি।

কোন অজ্ঞ বিমানযাত্রীকে যদি সেদিন বলা হতো যে তার পাশের সীটে যে বসে আছে সেই লোকটার আসল পরিচয় কি, তবে হয়তো অবাক হয়ে সে ভাবতো যে অর্থনৈতিক প্রশাসন দপ্তরের প্রাক্তন কর্তা ফেরারী তালিকায় কেন অত উচ্চস্থান পেয়েছে ?

তার প্রশ্নের উত্তরে সে তখন জানতে পারতো যে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ অবধি জার্মানীতে মানবতার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধ সংগঠিত হয়েছিলো, নির্দ্বিধায় তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগের দায়িত্ব এস.এস. দলের ওপর অর্পণ করা যায়। তার মধ্যে আবার শতকরা আশী থেকে নব্বই ভাগ দায়িত্ব এস.এস.এর দুটো আভ্যন্তরীণ বিভাগের ওপর—রাইখের নিরাপত্তার সদর দপ্তর এবং রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদর দপ্তর।

গণহত্যায় অর্থনৈতিক দপ্তরের দায়িত্ব আছে, এই কথাটা খুব বিস্ময়-জনক হলেও, নাৎসি আমলের সেই জঘন্য অপরাধের পদ্ধতি বিচার করলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। ওদের উদ্দেশ্য ছিলো যে ইউরোপ থেকে প্রতিটি ইহুদীকে এবং যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি স্লাভ জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে যে শুধু মুছেই দেওয়া হবে তাই নয়, মরবার সুযোগ পাচ্ছে বলে তাদের কাছ থেকে টাকাও আদায় করা হবে। গ্যাস-কুঠুরির দোর খোলবার আগেই এস.এস.রা ইতিহাসের জঘন্যতম লুণ্ঠনকর্ম সম্পাদন করে ফেলেছিলো।

ইহুদীদের ক্ষেত্রে অর্থ আদায় হয়েছিলো তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রথমত, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িঘর, কলকারখানা, ব্যাঙ্কে মজুত অর্থ, আসবাবপত্র, গাড়িঘোড়া, পোশাকপরিচ্ছদ সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নেওয়া হলো। তারপর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো পূর্বাঞ্চলে,—স্লেভ-

লেবার ক্যাম্পগুলোতে নইলে ডেথক্যাম্পে। বলা হয়েছিলো যে পুনর্বাসনের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। অনেকেই তা বিশ্বাস করেছিলো তাই যা পারে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো—সাধারণত দুটো করে স্যুটকেস। ক্যাম্পের চত্বরে এগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং পরনের পোশাকও।

ইউরোপের ইহুদীরা বিশেষ করে পোল্যাণ্ড এবং পূর্বদেশগুলোর সে-সময়ে যথেষ্ট ধনসম্পদ নিজেদের দেহে ধারণ করে রাখতো। ষাট লক্ষ লোকের মালপত্র থেকে উপার্জন হয়েছিলো কয়েকশো কোটি ডলার। ক্যাম্পগুলো থেকে ট্রেনভর্তি আসতো সোনার গয়না, হীরা, নীলা, চুণী, রুপোর পাত, লুই দর, সোনার ডলার আর হরেকরকম ব্যাঙ্কনোট। এগুলো জার্মানীর ভেতরে এস.এস. হেড-কোয়ার্টারে পৌঁছে যেতো। এস.এস.রা বরাবরই তাদের কাজে লাভ করে এসেছে। এই লাভের একাংশ রূপান্তরিত হয়ে যেতো সোনার বাটে, যার ওপর ছাপা হতো রাইখের ঈগল আর এস.এস.এর যুগ্ম বিদ্যুৎ। যুদ্ধের শেষদিকে এগুলো গচ্ছিত রাখা হলো সুইজারল্যাণ্ড, লাইখটেনস্টাইন, ট্যানজিয়ার এবং বেইরুটের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে। পরবর্তীকালে ওডেসা সংগঠনের মূলধন হিসাবে এগুলো বেশ কাজে এসেছিলো। এখনো বহু সোনা জুরিখের ভূগর্ভস্থ ভল্টে পড়ে আছে, পাহারা দিচ্ছে ওই শহরের আত্মপ্রসাদে স্ফীত স্বনীতিগর্বিত কতগুলো ব্যাঙ্কার।

শোষণের দ্বিতীয় পর্যায় দৈহিক। বহু ক্যালরি শক্তি আছে একেকটি দেহে, অতএব ব্যবহার করা হোক। এই পর্যায়ে এসে পৌঁছনোর আগেই ইহুদীরা তাদের সমস্ত পার্থিব ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, অতএব তারাও তখন কপর্দকহীন রুশ ও পোলদের সমগোত্রীয়। কাজ করতে যারা অনুপযুক্ত তাদের সকলকেই বিনাবাক্যব্যয়ে হত্যা করা হতো, কারণ তাদের দেহ আর শোষণ করা সম্ভব নয়। যারা কর্মক্ষম তাদের ভাড়া খাটানো হতো, হয় এস.এস.এর নিজস্ব কারখানায় নইলে অন্যান্য জার্মান শিল্প উদ্যোগ-গুলোতে যথা ক্রুপ, থাইসেন, ফন ওপেল ইত্যাদি। এস.এস. প্রতিষ্ঠান মাথাপিছু দৈনিক পেতো প্রতি অকুশলী শ্রমিকের জন্যে তিন মার্ক ও কুশলী শ্রমিকের জন্যে চার মার্ক হারে। 'দৈনিক' কথাটার অর্থ ছিলো যৎসামান্য

খাদ্য দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা কালের মধ্যে জীবিত দেহ থেকে যতটা কাজ আদায় করতে পারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক কর্মস্থলেই জীবন হারিয়েছিলো।

এস.এস. ছিলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আরেকটি রাষ্ট্র। এদের নিজস্ব কল-কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নির্মাণশাখা, মেরামতি ও চালনা কেন্দ্র এবং পোশাক বিভাগ ছিলো। নিজেদের প্রয়োজনীয় সবকিছু জিনিসই এরা নিজেরাই বানিয়ে নিতো ; দাস শ্রমিকগুলোকে ব্যবহার করতো কারণ হিটলারের আদেশবলে তারা এস.এস.এর নিজস্ব সম্পত্তি।

শোষণের তৃতীয় পর্যায়ে পড়তো মৃতদেহগুলো। মানুষগুলোকে যখন মারা হতো তার আগেই তাদের নিরাবরণ করে সব জিনিস খুলে নেওয়া হতো। গাড়ি ভর্তি-ভর্তি জুতো, মোজা, দাড়ি কামানোর ব্রাশ, চশমা, জ্যাকেট, ট্রাউজার পাওয়া যেতো। চুলগুলোকে কামিয়ে ফেলে রাইখে পাঠানো হতো ; শীতের ঠাণ্ডায় লড়াই করবার জন্যে তা দিয়ে ফেল্ট-বুটের আস্তরণ তৈরি হতো। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলোকে মৃতদেহ থেকে প্লায়ার দিয়ে দিয়ে তুলে নেওয়া হতো ; পরে সেগুলো গলিয়ে সোনার বাট হয়ে চলে যেতো জুরিখে। হাড়গুলো থেকে ফার্টিলাইজার বানানোর চেষ্টা হয়েছিলো, দেহের চর্বি থেকে সাবান, কিন্তু লাভজনক নয় বলে সেই পরি-কল্পনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ব্যক্তির গণহত্যার আর্থিক দিকটা ছিলো রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদরদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। অর্থাৎ কিভাবে আরো লাভ করা যায় হত্যাগুলো দিয়ে, সেইসব প্রকল্প তারাই বানাতো। আজ বিমানের ৩-বি নম্বর সীটে যে বসে আছে সে ছিলো সেই দপ্তরেরই খোদ কর্তা।

গ্ল্যুকস আর জার্মানীতে ফেরেনি তারপর, অযথা ঝুঁকি নেবার পাত্র নয় সে। প্রয়োজনও ছিলো না। দক্ষিণ আমেরিকাতে খাসা ছিলো রাজার হালে, এখনো রয়েছে। অর্থ আসে গোপন তহবিল থেকে। ১৯৪৫-এর পরেও নাৎসী আদের্শে বিশ্বাস এতটুকু টলেনি, তার ওপর আছে প্রাক্তন খ্যাতি। সুতরাং আর্জেন্টিনায় পলাতক নাৎসীদের মধ্যে সে যথেষ্ট গণ্যমান্য। ওডেসাও পরিচালিত হয় সেখান থেকেই।

বিমান নিরাপদে নামলো, যাত্রীরাও নিরাপদে কাস্টমস পেরিয়ে এলো। তিন নম্বর সারির যাত্রীটিকে অনর্গল স্প্যানিস ভাষা বলতে দেখে কেউ আশ্চর্য হলো না, কারণ দক্ষিণ আমেরিকান বলেই তার পরিচিতি।

প্রান্তিক দালান পেরিয়ে ট্যাক্সি নিলো একটা। বহুদিনের অভ্যাসবশত জুরবুরান হোটেল থেকে সামান্য দূরের একটা ঠিকানা দিলো। মাদ্রিদ শহরের মাঝখানে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ব্যাগ হাতে হাঁটতে হাঁটতে দুশো গজ দূরে হোটেলটায় এসে উঠলো।

টেলেক্সে খবর পাঠিয়ে ঘর সংরক্ষিত করা ছিলো। আগমন লিখিয়ে সোজা ঘরে উঠে দাড়ি কামালো, ধারাস্নান সারলো। কাঁটায় কাঁটায় নটা বাজতেই দরজায় তিনবার করাঘাত হলো, একটু থেমে আবার দুবার। নিজেই গিয়ে দরজা খুললো, পরিচিত ব্যক্তি দেখে দু পা পিছু হটে দাঁড়ালো।

আগন্তুক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত টান করে তালু নীচের দিকে রাখে। পুরনো স্যালুট। মুখে বলে ওঠে, "সিয়েগ হাইল।"

অনুমোদনের ভঙ্গীতে জেনারেল গ্ল্যুকস মাথা নেড়ে নিজের ডান হাতখানাও বাড়িয়ে দেয়। ধীর স্বরে বলে, "সিয়েগ হাইল।" আগন্তুককে বসতে নির্দেশ করে।

আগন্তুকও জনৈক জার্মান, এস.এস.এর ভূতপূর্ব অফিসার। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে ওডেসা সংগঠনের আঞ্চলিক প্রধান। মাদ্রিদে যে তাকে আহ্বান করা হয়েছে এতবড় একজন নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার জন্যে তাতে ভীষণ অহঙ্কারবোধ করছে সে। মনে করছে যে ছত্রিশ ঘণ্টা আগে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির যে মৃত্যু হলো সেই সুবাদে বোধহয় এই আলোচনার বৈঠক।

প্রাতরাশের থালা পাশেই রাখা ছিলো, তা থেকে এক কাপ কফি নিজের জন্যে ঢেলে নিয়ে জেনারেল গ্ল্যুকস বিশাল একটা করোনা চুরুট ধরালো।

"কারণটা বোধহয় বুঝতে পেরেছো কেন আমি হঠাৎ ইউরোপে এলাম

বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও," জেনারেল বললো, "এই মহাদেশে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। অতএব এক্ষুনিই আমার বক্তব্য শুরু করছি এবং সংক্ষেপেই সারবো।"

জার্মানী হতে আগত অধস্তন পুরুষটি চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে পড়লো।

"কেনেডি এখন মৃত। আমাদের পক্ষে সেটা এক অদ্ভুত সৌভাগ্য," জেনারেল বলতে থাকে, "এই ঘটনা থেকে যতটা সুযোগ আমরা নিতে পারি সবটুকু নিতে হবে, কোন গাফিলতি যেন না হয়। বুঝেছো, কি বলছি?"

"নিশ্চয়ই, হের জেনারেল, নীতিগতভাবে বুঝলাম; কিন্তু বিশদ অর্থে ঠিক কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন?" অপেক্ষাকৃত কমবয়সী লোকটা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

"বনের দেশদ্রোহী ইতরগুলো তেল আভিভের শুয়োরদের সঙ্গে যে গোপন অস্ত্রচুক্তি করেছে তার কথাই বলছি। সেই চুক্তির কথাটা জানা আছে তো তোমার? ট্যাঙ্ক, কামান এবং কতরকম অস্ত্রশস্ত্র যে জার্মানী থেকে ইস্রায়েলে যাচ্ছে এখনো?"

"হ্যাঁ, জানি বৈকি।"

"এ কথাও জানো বোধহয় যে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ইজিপ্টকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে একদিন না একদিন তারাই যুদ্ধে বিজয়ী হয়?"

"নিশ্চয়ই জানি। আমরাই তো সেই উদ্দেশ্যে বহু জার্মান বৈজ্ঞানিককে ঢুকিয়েছি।"

জেনারেল গ্লুকস মাথা নাড়ে।

"ওই বিষয়টায় আমি পরে আসছি। আমি আমাদের নীতির কথাটা বলছিলাম এখন; আরব দোস্তদের যতটা সম্ভব এই বিশ্বাসঘাতী চুক্তির সমস্ত খবরগুলো জানিয়ে দিতে হবে যাতে তারা কূটনৈতিক পন্থার মাধ্যমে বন সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে পারে। ইতিমধ্যেই আরবদের প্রতিবাদের ফলে জার্মানীর ভেতরে একটা উপদলের সৃষ্টি হয়েছে যারা রাজনৈতিক কারণেই অস্ত্র-চুক্তির ভীষণ বিরোধী, কারণ আরবেরা এই

চুক্তির ফলে জার্মানীর ওপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। এই উপদলটি, তাদের অজান্তেই, আমাদের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে ; এমন কি মন্ত্রীমণ্ডলী থেকেও চাপ দেওয়াচ্ছে নির্বোধ এরহার্ডকে যাতে সে এই অস্ত্রচুক্তি রদ করে দেয়।"

"হ্যাঁ, বুঝলাম, হের জেনারেল।"

"বেশ। এরহার্ড অবশ্য এখনো অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করেনি তবে বহুবার দোটানায় পড়ে দ্বিধা করেছে। যারা জার্মান-ইস্রায়েলি অস্ত্রচুক্তি সম্পাদনের স্বপক্ষে, তাদের একমাত্র যুক্তি হচ্ছে যে এই চুক্তিতে কেনেডির সমর্থন আছে, এবং কেনেডি যা চায় এরহার্ড তাকে তা দেয়।"

"হ্যাঁ, সে কথা সত্যি।"

"কিন্তু কেনেডি এখন মৃত।"

আগন্তুক চেয়ারে একটু পিছে হঠে বসলো, চোখ দুটো তার প্রত্যাশায় জ্বলে ; কল্পনানেত্রে দেখতে পায় নতুন নতুন সম্ভাবনা। এস.এস. জেনারেল চুরুট থেকে সাবধানে একটু ছাই ফেলে নিলো তার কফি-কাপে, তারপর জ্বলন্ত চুরুটের ডগাটা অধস্তন কর্মীটির দিকে উঁচিয়ে বলে উঠলো, "অতএব এই বছরের বাকি দিনগুলোতে জার্মানীর ভেতরে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য হবে অস্ত্রচুক্তির বিরুদ্ধে বিশাল জনমত গড়ে তোলা ; বোঝানো হবে যে অস্ত্রচুক্তিটার ফলে জার্মানী তার বহুকালের সুহৃদ আরবদের হারাতে বসেছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ; এ আর এমন কি কথা, ঠিক হয়ে যাবে।" বেশ চওড়া মাপের হাসি হাসলো আগন্তুক।

"কায়রো-সরকারের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগসূত্রগুলো আছে, তারা দেখবে যে তাদের এবং অন্যান্য দূতাবাস মারফৎ অনবরত কূটনৈতিক প্রতিবাদ যেন জার্মানীতে আসে। অন্য আরব-বন্ধুরা আরব-ছাত্র এবং আরবদের জার্মান-বন্ধুদের দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাবে। তোমার কাজ হবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচার চালানো ; যে সমস্ত পুস্তিকা এবং পত্রিকা আমরা গোপনে গোপনে সমর্থন করি তাদের দিয়ে লেখাবে, বড় বড় খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে, প্রভাবশালী আমলা

ও রাজনীতিকদের অস্ত্রচুক্তির বিরুদ্ধে আনবার চেষ্টা করবে।”

সামনে বসে থাকা লোকটার ভুরু কুঁচকে ওঠে। বিড়বিড় করে বলে, “কিন্তু আজকের জার্মানীতে ইস্রায়েলবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা শক্ত।”

“সে প্রশ্নই ওঠে না,” তীক্ষ্নস্বরে জেনারেল বলে, “খুবই সহজ যুক্তি ; ব্যবহারিক কারণেই নির্বোধের মতন গোপন চুক্তি-ফুক্তি করে জার্মানী আজ আট কোটি আরবকে শত্রু করে তুলতে পারে না। বহু জার্মান এই যুক্তি মানবে, বিশেষত কূটনীতিকেরা। বিদেশদপ্তরে আমাদের যে পরিচিত বন্ধুরা আছে তাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের সহজ সাধারণ যুক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ। অবশ্য প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা সমস্তই দেওয়া হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে কেনেডি মরেছে, জনসন বোধহয় ওরকম আন্তর্জাতিক ইহুদী-ঘেঁষা নীতির ধার ধারবে না, অতএব এরহার্ডকে প্রবল চাপ দিতে হবে, তার মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেও, অস্ত্রচুক্তি যাতে স্থগিত রাখা হয়। মিশরীদের যদি দেখাতে পারি যে আমরা বনের বৈদেশিক নীতি পাল্টে দিতে পেরেছি তাহলে কায়রোতে আমাদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে।”

জার্মানী থেকে আগত ব্যক্তিটি বহুবার ঘাড় নাড়লো, যেন কি করতে হবে না হবে, সেই নক্‌শা চোখে ভাসছে। বললো, “সব করা হবে।”

“বাঃ,” জেনারেল গ্ল্যুকস অনুমোদনের ধ্বনি করে উঠলো। লোকটা কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালো।

“হের জেনারেল, আপনি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছিলেন, ইজিপ্টে যারা কাজ করছে···”

“ওঃ হ্যাঁ। বলেছিলাম বটে, তাদের কথা পরে বলবো। তারা হচ্ছে, বুঝলে, আমাদের অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়,—ইহুদীদের চিরকালের জন্যে বিনাশ করে দেওয়ার অভিযান।···হেলওয়ান রকেটগুলো সম্বন্ধে কিছু জানো ?”

“হ্যাঁ, স্যার, মোটামুটিভাবে···”

“কিন্তু সেগুলো আদতে কিজন্যে,···জানো না ?”

“আন্দাজ করেছি অবশ্য···”

“যে ওগুলো ছুঁড়ে ইস্রায়েলের ওপর কয়েক টন ভারী বিস্ফোরক ফাটানো হবে···নয়?” অমায়িক হাসি হাসলো জেনারেল গ্ল্যুকস। “কিছুই

বোঝোনি তুমি। যাক, তোমার বোধহয় এখন জানা প্রয়োজন যে কেন ওই রকেটগুলো আর যারা সেগুলো তৈরী করছে তারা আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।"

পিঠ এলিয়ে জুত করে বসলো গ্ল্যুকস। ছাতের দিকে উর্ধ্ব দৃষ্টি মেলে অধস্তন কর্মীটিকে হেলওয়ান রকেটের সত্য কাহিনী বর্ণনা করে গেলো।

যুদ্ধের অল্পকাল পরেই হাজার হাজার নাৎসী এবং প্রাক্তন এস.এস. সদস্যেরা ইউরোপ থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলো মিশরে। নীলনদের বালুকাময় তীরে নিরাপদ আশ্রয় গেড়েছিলো তারা। তখনো ইজিপ্টে ছিলো রাজা ফারুকের শাসন। যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন কিছু বৈজ্ঞানিকও। ফারুককে গদিচ্যুত করবার কুদেতা ঘটবার কিছুদিন আগেও ফারুক দুজন জার্মান বৈজ্ঞানিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন যে তাঁরা নাকি রকেট নির্মাণের কারখানা গড়বার জন্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। সেটা ছিলো ১৯৫২ সাল; অধ্যাপক দুজনের নাম পল গ্যের্কে এবং রল্‌ফ্ এঙ্গেল।

প্রকল্পটা স্থগিত রইলো কয়েক বছরের জন্যে। ইতিমধ্যে ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন গামাল আব্দেল নাসের। ১৯৫৬ সালে সিনাইয়ের যুদ্ধে মিশরী বাহিনী হেরে গেলো। নাসের তখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে ইস্রায়েলকে কোন-না-কোনদিন ধূলিসাৎ করতেই হবে।

১৯৬১-তে যখন ভারী ভারী রকেট পাঠানোর অনুরোধ মস্কো বাতিল করে দিলো তখন মিশরী রকেট নির্মাণের জন্যে গ্যের্কে-এঙ্গেল পরিকল্পনাটাকে আবার অতি উৎসাহে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হলো। সেই বছরেই জলের মতো অর্থব্যয়ে, সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেই প্রায়, জার্মান অধ্যাপকেরা এবং মিশরীয়রা গড়ে তুললো কায়রোর উত্তরে হেলওয়ানে ফ্যাক্টরি নং ৩৩৩।

কিন্তু কারখানা গড়া এক কথা, রকেট ডিজাইন করা বা বানানো আরেক কথা। বহুদিন থেকেই নাসেরের কিছু প্রবীণ সমর্থক,—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তাঁদের নাৎসী-অনুকূল পৃষ্ঠপট হেতু,—মিশরস্থিত ওডেসা-

প্রতিনিধিদের সঙ্গে গভীর সংযোগ রেখে চলতেন। সেই সূত্রে মিশরের প্রধান সমস্যাটির সমাধানও খুঁজে পাওয়া গেলো—রকেট নির্মাণের জন্যে বৈজ্ঞানিক পাওয়া যাবে কোথা থেকে।

রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেউই একটি লোকও দেবে না। ওডেসার পক্ষ থেকে বলা হলো যে নাসেরের যে সমস্ত রকেটের প্রয়োজন তার আয়তন বা রেঞ্জ, যুদ্ধের সময়ে জার্মানী পীনেমুণ্ডে ওয়ার্নার ফন ব্রউন এবং তাঁর সতীর্থেরা লণ্ডনকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্যে যে সব ভি.২ রকেট বানিয়েছিলেন, তার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিল খেয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক-দের সেই পুরনো দলের মধ্যে অনেকেই এখনো জীবিত এবং সক্ষম।

১৯৬১-তে শুরু হলো জার্মান বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্তি। ওঁদের মধ্যে অনেকেই তখন স্টাটগার্টে 'ওয়েস্ট জার্মান ইনস্টিট্যুট ফর অ্যারোস্পেস রিসার্চে' কাজ করেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই কাজ সম্বন্ধে উদাসীন, কারণ ১৯৫৪-র পারীর সন্ধিচুক্তি অনুসারে জার্মানীর পক্ষে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক গবেষণা করা একেবারে নিষেধ, বিশেষ করে পরমাণবিক পদার্থবিদ্যায় এবং রকেট্রিতে। তার ওপরে আছে গবেষণাগারে চিরন্তন অর্থাভাব। সুতরাং অনেকেই মিশরে আসতে রাজী হয়ে গেলেন; সূর্য-করোজ্জ্বল দেশ, গবেষণার জন্যে অঢেল অর্থ, সত্যিকারের রকেট ডিজাইন করবার সুযোগ,—নিঃসন্দেহে লোভনীয় প্রস্তাব।

জার্মানীতে একজন প্রধান নিয়োগকর্তাকে রাখলো ওডেসা। সে আবার তার একজন প্রাক্তন এস.এস. সার্জেণ্টকে রাখলো সহকারী হিসাবে—নাম হাইনৎস ক্রুগ। দুজনে মিলে গোটা জার্মানী চষে ফেললো—কে রাজী আছো ইজিপ্টে যেতে, নাসেরের জন্যে রকেট বানাতে হবে।

অত মাইনে, সুখসুবিধে, কাজেই ভালো ভালো লোক পেতেও বিশেষ অসুবিধা হলো না। এঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে অধ্যাপক উল্‌ফ্‌-গ্যাঙ্গ পিল্‌ৎসের; যুদ্ধোত্তর জার্মানী থেকে ফরাসীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে-ছিলো, ফ্রেঞ্চ ভেরোনিক রকেটের তিনিই জন্মদাতা। অধ্যাপক পিল্‌ৎস ১৯৬২-র গোড়ার দিকে মিশরে গেলেন। ফন ব্রউনের ভি.২ রকেটের দল থেকে পাওয়া গেলো ডঃ হাইনৎস ক্লাইনওয়াখটার এবং ডঃ ইউজেন

সায়েঙ্গারকে। তাঁদের সঙ্গে মিশরে এলেন ডঃ জোসেফ আইসিগ এবং ডঃ কিরমেয়ার। সকলেই তাঁরা সঞ্চালন-ইন্ধন এবং প্রয়োগকৌশলে বিশেষজ্ঞ। জগৎ ওঁদের শ্রমের ফল দেখলো ফারুকের পতনের অষ্টম স্মৃতিবার্ষিকীতে কায়রো শহরে অনুষ্ঠিত প্যারেডে। সেদিন ২৩শে জুলাই ১৯৬২। সামরিক শোভাযাত্রায় ছুটো রকেট চললো চাকা লাগানো পাটাতনে চেপে। রকেট ছুটোর নাম…আল্ কাহিরা ও আল্ জাফিরা। জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠলো। অবশ্য ও ছুটো ছিলো শুধু রকেটের বহিরঙ্গ, বিস্ফোরক বা ইন্ধন তাতে তখনো ছিলো না; তবুও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অদূরভবিষ্যতে ওই ধরনের ৪০০ অস্ত্র ছোঁড়া হবে।…

জেনারেল গ্লুকস থেমে যায়। চুরুটে টান দিয়ে আবার বলে, "সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যদিও বহিরঙ্গ, বিস্ফোরক এবং ইন্ধন বানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছি, যে কোন গাইডেড মিসাইলের চাবিকাঠি হচ্ছে তার টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম।"

ওয়েস্ট জার্মানটির দিকে চুরুট উঁচিয়ে ধরে বলে, "সে জিনিস আমরা এখনো ইজিপ্টকে দিতে পারিনি। দুর্ভাগ্যবশত গাইডেন্স সিস্টেমে যারা বিশেষজ্ঞ, যারা স্টাটগার্ট বা অন্য কোথাও কাজ করছে, তাদের কাউকেই আমরা ইজিপ্টে যেতে রাজি করাতে পারিনি। ওখানে আজ পর্যন্ত যারা গেছে তারা শুধু নভোগতি, সঞ্চালন এবং বিস্ফোরণ-প্রকোষ্ঠের নির্মাণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। আমরা ইজিপ্টকে কথা দিয়েছি যে রকেট তার হবেই, এবং হবেই যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট নাসেরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে একদিন না একদিন মিশর ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং তাও যে হবেই সে একেবারে অবধারিত। নাসের অবশ্য মনে করেন যে তাঁর ট্যাঙ্ক এবং তাঁর সেনাবাহিনীই যথেষ্ট যুদ্ধ জেতবার পক্ষে। আমরা কিন্তু ততটা নিশ্চিত নই। সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও নাও জিততে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখো দিকি, কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে যে সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র তিনি আনিয়েছেন সেগুলো যখন অকৃতকার্য হয়ে যাবে অথচ আমাদের দ্বারা নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা যে রকেট বানাবে সেগুলো দিয়ে তিনি যখন যুদ্ধ জিতে যাবেন, তখন আমাদের মান কতখানি বেড়ে যাবে। ডবল লাভ

হবে আমাদের—চিরকালের জন্যে পাবো এক চিরকৃতজ্ঞ মধ্যপ্রাচ্য, সর্বসময়ের জন্যে যা হয়ে উঠবে আমাদের পক্ষে এক পরম নিরাপদ আশ্রয়। আর দ্বিতীয়ত ইহুদী শুয়োরগুলোর রাষ্ট্র চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে, মরণোন্মুখ ফ্যুয়েরারের শেষ ইচ্ছা আমরা রাখতে পারবো। আমাদের সামনে এসেছে তাই আজ এক বিরাট কর্তব্য, আমাদের যা করতেই হবে, অকৃতকার্য হলে চলবে না।"

তার বক্তৃতার শেষভাগে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে জেনারেল ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। আগন্তুক একটু বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, "হের জেনারেল, ৪০০খানা মাঝারি আয়তনের বিস্ফোরক দিয়ে কি সত্যি সত্যিই ইহুদীগুলোকে চিরতরের জন্যে বিনাশ করে দেওয়া সম্ভব? অসাধারণ ক্ষতিসাধন হয়তো হবে কিন্তু পূর্ণ বিনাশ?"

গ্ল্যুকস ঘুরে দাঁড়ায়। বিজয়ী-মার্কা হাসি তার মুখে।

"কিন্তু কি ধরনের বিস্ফোরক, সেটা ভাবো দিকি।" অধস্তন কর্মীটির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে আবার শুরু করে, "ভাবছো কি যে, ওই হতচ্ছাড়াগুলোর ওপর শুধু বারুদ ফাটাতে যাচ্ছি? না না, প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং তিনি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে সেটা গ্রহণও করেছেন। কাহিরা এবং জাহিরার বিস্ফোটক হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। কতগুলোতে থাকবে বিউবোণিক প্লেগের বীজাণু আর কতগুলো ভূমির অনেক ওপরে ফেটে গিয়ে গোটা ইস্রায়েল রাষ্ট্রে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম-৯০ ছড়িয়ে দেবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয় প্লেগ হয়ে নয়তো গামারশ্মির প্রচণ্ড প্রভাবে ওরা সকলেই মারা যাবে। এই দাওয়াই রেখেছি ওদের জন্যে।"

সহকারীটির মুখ হাঁ হয়ে গেছে। কোনমতে শ্বাস ছেড়ে বললো, "অদ্ভুত! হ্যাঁ···এখন আমার মনে পড়ছে বটে গত গ্রীষ্মে সুইজারল্যাণ্ডের একটা বিচার-কাহিনী পড়েছিলাম। শুধু সংক্ষিপ্তসার, কেন না সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছিলো গোপনে। তাহলে কথাটা সত্যি। আঃ, জেনারেল, এ যে অপূর্ব!"

"অপূর্ব—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। এবং অবশ্যম্ভাবিও বটে, যদি আমরা, ওডেসার লোকেরা রকেটগুলোতে ঠিক ঠিক টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম বসিয়ে

দিতে পারি, যাতে ওগুলো যে শুধু নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই যাবে তাই নয়, সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে বিস্ফোটন ঘটাবে। সেই টেলি-গাইডেন্স সিস্টেমের অনুসন্ধান এবং গবেষণা এখন চলছে পশ্চিম জার্মানীতে। যে ব্যক্তিটি আছে এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে তার সাঙ্কেতিক নাম ভালকান। গ্রীক পুরাণ মনে আছে তো তোমার ? ভালকান ছিলো একজন কামার যে ভগবানের জন্যে বজ্র বানিয়ে দিয়েছিলো।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আগন্তুক প্রশ্ন করলো, "তিনি কি বৈজ্ঞানিক ?"

"না, নিশ্চয়ই না। ১৯৫৫-তে যখন অদৃশ্য হয়ে যেতে বাধ্য হলো, তখন আর্জেন্টিনাতে চলে আসাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু আমাদেরই নির্দেশে তোমার পূর্বসূরী তাকে একটা ভুয়ো পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়েছিলো জার্মানীতে থাকার জন্যে। তারপর জুরিখ থেকে তাকে দশ লক্ষ আমেরিকান ডলার তুলে দেওয়া হয়, জার্মানীতে একটা কারখানা স্থাপন করবার জন্যে। গোড়াতে উদ্দেশ্য ছিলো অন্য একটা গবেষণার ব্যাপারে ওই কারখানাটাকে আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তখন সেই গবেষণাতেই ছিলো আমাদের উৎসাহ, কিন্তু হেলওয়ানের গাইডেন্স সিস্টেম আরো গুরুত্বপূর্ণ তাই সেটা এখন স্থগিত আছে। ভালকানের ফ্যাক্টরিতে ট্রান্সিস্টার রেডিয়ো তৈরি হয় কিন্তু সেটাও একটা ভান। ওই কারখানার গবেষণা বিভাগে একদল বৈজ্ঞানিক টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম নিয়ে এখনো কাজ করে যাচ্ছে। হেলওয়ানের রকেটে সেই সিস্টেম একদিন না একদিন লাগানো হবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রশ্ন করলো, "তারা ইজিপ্টে চলে গেলেই পারে ?"

গ্ল্যুকস একটু হেসে আবার পায়চারি করতে শুরু করলো। বললো, "সেখানেই তো ওস্তাদি। তোমাকে আমি বললাম না যে জার্মানীতে ওই ধরনের রকেট-গাইডেন্স সিস্টেম বানানোর লোক আছে, কিন্তু তাদের কাউকেই ওদেশে পাঠানো সম্ভব হলো না। ভালকানের কারখানায় যারা এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণায় রত তারা আজও বিশ্বাস করে যে একান্ত গোপনীয়তার আড়ালে তারা আসলে বনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হয়ে কাজ করছে।"

"অঁ্যা ?" চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো লোকটা, কার্পেটে কফি চলকে পড়লো। "কি করে করলেন ?"

"অত্যন্ত সহজ। পারী চুক্তি অনুসারে রকেট সম্বন্ধে কোন গবেষণাই করতে পারবেনা জার্মানী। বনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সত্যিকারের একজন খাঁটি অফিসার···আমাদেরই লোক সে···ভালকানের বিজ্ঞানীদের দিয়ে গোপনীয়তার শপথ নেওয়ালো, সঙ্গে ছিলো এমন একজন জেনারেল যার ছবি গত মহাযুদ্ধের সময় সবাই দেখেছে। বৈজ্ঞানিকগুলো সকলেই জার্মানীর জন্যে কাজ করতে উৎসুক, তা পারী চুক্তি লঙ্ঘন হলোই বা, কিন্তু ইজিপ্টের হয়ে কাজ করতে তারা রাজী নয়। এখন তারা ভাবছে যে জার্মানীর হয়েই তারা কাজ করছে। অবশ্য সাংঘাতিক খরচা হচ্ছে। এই ধরনের গবেষণা তো সাধারণত বৃহৎ শক্তিগুলো ছাড়া কেউ করতে পারে না। আমাদের গোপন তহবিলে তো বেশ বড়রকম ছিদ্র হয়ে গেলো এই কাজে। এখন বুঝলে তো ভালকানের গুরুত্ব ?"

"নিশ্চয়ই," জার্মানীতে অবস্থিত ওডেসা-প্রধানটি বলে উঠলো, "তবে, ধরুন, কখনো যদি কিছু তার ঘটে যায়, কাজটা চলবে না ?"

"না। ফ্যাক্টরি এবং কোম্পানি ভালকানের নিজস্ব। সেই-ই চেয়ারম্যান, সেই-ই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, শেয়ারহোল্ডারও একমাত্র সেই-ই, টাকাপয়সা দেবার অধিকারীও সে নিজে। বিজ্ঞানীদের মাইনে এবং গবেষণার খরচ একমাত্র সেই-ই মেটাতে পারে। বিজ্ঞানীদের কারো সঙ্গেই কারখানার অন্য কোন অংশের সম্বন্ধ নেই, কারখানার অন্য কেউই কোম্পানির অতবড় গবেষণা বিভাগে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানে না। তারা জানে যে ওই সুরক্ষিত গবেষণাগারে মাইক্রো-ওয়েভ সার্কিট নিয়ে এমন সব কাজ হচ্ছে যা ট্রান্সিস্টার ব্যবসায়ে বিপ্লব এনে দেবে। গোপনীয়তার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে শিল্পরাজ্যে যথেষ্ট গুপ্তচর বৃত্তি চলে কাজেই এরকম ব্যবস্থা কোম্পানির স্বার্থেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দুটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র সংযোগ ভালকান নিজে। অতএব সে যদি চলে যায়, গোটা প্রকল্পই ধসে পড়বে।"

"কারখানাটার নাম আমাকে বলতে পারেন ?"

জেনারেল গ্ল্যুকস মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে একটা নাম বলে। আগন্তুক বিস্ময়ে তাকায়।

"কিন্তু ওই রেডিওগুলো তো আমি দেখেছি।"

"দেখবে না কেন? কোম্পানি তো খাঁটি, সত্যিসত্যিই রেডিও তৈরি করে তারা।"

"আর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর? তাঁর নাম কি…?"

"হ্যাঁ, সেই-ইতো ভালকান। এখন বুঝলে লোকটার গুরুত্ব কতখানি। সেইজন্যেই তোমাকে আরো কিছু নির্দেশ দেবার আছে। এই দেখো…"

জেনারেল তার বুকপকেট থেকে একটা ফটো বার করে লোকটির হাতে দিলো। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখলো সে, মুখে বিভ্রান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। তারপর ছবিটা উল্টে পেছন দিকে লেখা নামটা পড়ে অবাক হয়ে গেলো।

"সে কি! আমি তো ভেবেছিলাম উনি দক্ষিণ আমেরিকাতে আছেন।"

গ্ল্যুকস মাথা ঝাঁকালো, "উঁহুঁ, বরং এর নামই হচ্ছে ভালকান।…শোনো, ওর কাজ এখন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অতএব, কেউ যদি ওর সম্বন্ধে কোন রকম প্রশ্নট্রশ্ন করছে বলে তুমি শুনতে পাও তবে তাকে তুমি…নিরুৎসাহিত করবে। একবার সাবধান করে দেবে, তারপর স্থায়ী সমাধান। বুঝতে পারলে, কামেরার্ড? কেউ যেন কোন-মতেই ভালকানের আসল পরিচয় জানতে না পারে।"

এস.এস. জেনারেল উঠে দাঁড়ালো, দেখাদেখি তার অতিথিও। "বাস," গ্ল্যুকস আলোচনার ওপরে ছেদ টেনে দিলো, "এই হলো গিয়ে তোমার কর্তব্য, নির্দেশ তো জানতেই পারলে।"

চার

রবিবারে গোয়েন্দা-ইনস্পেক্টর কার্ল ব্রাণ্ডটের ছুটি। খুঁজে খুঁজে পিটার মিলার লাঞ্চের সময়ে বাড়িতে এসে তাকে ধরলো। পরিবারের সকলের

সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় মিলার এলো তার জাগুয়ার গাড়িতে চেপে। ব্রাণ্ডটের বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলো গাড়িটাকে। সেখানেই এসে ঢুকলো ব্রাণ্ডট। গোপন কথা-টথা ওখানেই ভালো।

মিলারকে বলছিলো ব্রাণ্ডট, "কিন্তু তুই তো জানিসই না যে ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে।"

"না, তা জানি না। যদি মরে গিয়ে থাকে রশম্যান তো ল্যাঠা চুকেই গেলো। তবে সেটাও সঠিক জানতে হবে বৈকি। তুই আমাকে সাহায্য কর্ না?"

কথাটা ভেবে দেখলো ব্রাণ্ডট। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো, "নাঃ, পারবো না রে, দুঃখিত।"

"কেন?"

"দেখ্, তোকে আমি ডায়রিটা দিয়েছিলাম কেন জানিস? পড়ে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিলো, তাই ভাবলাম তুই হয়তো কোন কাহিনী-ফাহিনী বানাতে পারিস। কল্পনাও করতে পারিনি যে তুই আবার রশম্যানের পেছনে ধাওয়া করবি। ডায়রিটার বিষয়বস্তু নিয়ে একটা কিছু লিখছিস না কেন?"

"লিখছি না তার কারণ এ থেকে কিছু লেখবারই নেই যে," মিলার বললো। "কি লিখবো—'দেখুন দেখুন, কি আশ্চর্য, একজন বৃদ্ধ গ্যাসে আত্মহত্যা করেছে, ছেড়ে গেছে একটা আল্গা-বাঁধাইয়ের ডায়রি, তাতে যুদ্ধের সময়ের নানা কাহিনী-টাহিনী লেখা আছে?' কোন সম্পাদক এরকম মাল কিনবে ভাবছিস? আমার নিজস্ব ধারণা অবশ্য যে ডায়রিটা একটা মর্মান্তিক ইতিহাস, কিন্তু সে তো নেহাৎ আমার ব্যক্তিগত মত। যুদ্ধের পর থেকে এমন শয়ে শয়ে স্মৃতিচারণ বই হয়ে বেরিয়েছে। আর চলবে না। জার্মানীর কোন প্রকাশক বা সম্পাদক স্রেফ নেবেই না।"

"হুঁ,...তা কি করতে চাস তুই?" ব্রাণ্ডট প্রশ্ন করলো।

"অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। ডায়রিটার ভিত্তিতে বড় রকম একটা পুলিসী তৎপরতা শুরু করে দেওয়া, তাহলেই আমি পাবো একটা ভালো সংবাদ-কাহিনী।"

ড্যাশবোর্ডের ছাইদানির ওপরে ধীরে ধীরে সিগারেটে টোকা মেরে ব্রাণ্ডট বললো, "কোন বড় রকম পুলিসী তৎপরতা ঘটবে না। দেখ্, তুই হয়তো সাংবাদিকতা জানিস কিন্তু হাম্বুর্গের পুলিসকে আমি বিলক্ষণ চিনি। এই তেষট্টি সালে আমাদের কাজ হলো গিয়ে হাম্বুর্গকে শুধু অপরাধ-মুক্ত করে রাখা। কুড়ি বছর আগে রিগাতে কে কি করেছিলো তার জন্যে আমাদের সদাব্যস্ত গোয়েন্দাগুলোকে দৈনন্দিন কাজ থেকে সরিয়ে আনা—? ভুলে যা।"

"কিন্তু তুই অন্তত বিষয়টা তো উত্থাপন করতে পারিস?" মিলার বললো।

ব্রাণ্ডট মাথা ঝাঁকালো, "উঁহুঁ, আমার দ্বারা হবে না।"

"কেন? কি ব্যাপার?"

"কারণ আমি এতে জড়িয়ে পড়তে চাই না। তোর কথা স্বতন্ত্র। বিয়ে-থা করিসনি, ঝাড়া হাত-পা, ইচ্ছে করলে আলেয়ার পেছনে ছুটতে পারিস। আমার বউ আছে, দুটো ছেলেমেয়ে আছে, চাকরিতে ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যৎ তো আমি নষ্ট করতে পারি না।"

"কেন, পুলিস লাইনে তোর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে কেন এতে? রশম্যান তো একটা অপরাধী, তাই না? পুলিসের কাজই তো অপরাধীদের ধরা, তবে?"

সিগারেটের গোড়াটা থেঁতলে দিলো ব্রাণ্ডট।

"পরিষ্কার করে বোঝানো মুশকিল। পুলিস মহলে, জানিস, একটা হাওয়া আছে—শুধুই হাওয়া কিন্তু, জমাট কিছু না—যে এস.এস.দের যুদ্ধ-অপরাধ নিয়ে বেশি আগ্রহ-টাগ্রহ দেখালে তরুণ অফিসারদের চাকরিতে লাভ হয় না। স্পষ্ট কিছু বলা হয় না অবশ্য। তদন্ত করবার অনুরোধটা নামঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু এরকম একটা অনুরোধ যে করা হয়েছিলো সেই খবরটা চলে যায় ফাইলে। তোর প্রমোশনেরও সঙ্গে সঙ্গে বারোটা বেজে গেলো। কেউ কিচ্ছু বলে না, কিন্তু সবাই জানে। তাই বলছি যে তুই যদি এটা নিয়ে বড় কিছু খুঁড়ে বার করতে চাস তো তুই নিজেই যা, আমাকে বাদ দে।"

মিলার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, উইণ্ডস্ক্রিন ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে যায় তার দৃষ্টি।

তারপরে বলে, "আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই করবো না হয়।...কিন্তু শুরু তো করতে হবে কোন এক জায়গা থেকে। মরার সময় টউবের কি কিছু লিখে গেছে?"

"হ্যাঁ, ছোট্ট একটা চিঠি। সেটা আবার আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছিলো, আত্মহত্যার বিবরণের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে ফাইল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। পুলিসের চোখে কেস বন্ধ।"

"কি লেখা ছিলো?" মিলার শুধোয়।

"কি আর বিশেষ!" ব্রাণ্ডট জানায়, "লিখেছিলো যে সে আত্মহত্যা করছে।...হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো একটা কথা ছিলো বটে; বলে গিয়েছে যে তার জিনিসপত্তর তার বন্ধু, হের মার্ক্সকে, দিয়ে গেলো।"

"ওঃ, তবে তো একটা সূত্র পাওয়া গেলো। মার্ক্স কে?"

"আমি কি করে তা জানবো?" ব্রাণ্ডট বলে ওঠে।

"মানে বলতে চাস যে চিঠিতে শুধু ওইটুকুই ছিলো? শুধু হের মার্ক্স? কোন ঠিকানা না?"

"কিস্সু না," ব্রাণ্ডট বললো, "শুধু মার্ক্স। কোথায় থাকে তারও কোন হদিস না।"

"কাছেই কোথাও হবে নিশ্চয়ই। খোঁজ করেছিলি?"

ব্রাণ্ডট বেশ জোরে নিশ্বাস ফেললো। "তোর মাথায় কি কিছুই ঢোকে না? বললাম না যে আমরা পুলিসেরা সব সময়েই ভীষণ ব্যস্ত থাকি। তোর কোন ধারণা আছে হাম্বুর্গে কতগুলো মার্ক্স রয়েছে? টেলিফোন-ডিরেক্টরিতেই তো কয়েকশো পাবি। ওই বিশেষ মার্ক্সের খোঁজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারি না আমরা। তাছাড়া, বুড়ো যা রেখে গেছে তার দাম দশ ফেনিগেরও বেশি না।"

"ওঃ! তাহলে শুধুই এই? আর কিছু না?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"উঁহুঁ, আর কিচ্ছু না। মার্ক্সকে যদি খুঁজে বের করতে চাস, তুই নিজেই চেষ্টা কর্, আপত্তি নেই।"

"বেশ, তাই করবো।" দুজনে হাত-টাত মেলালো। ব্রাণ্ডট বাড়িতে ঢুকে গেলো, পরিবারের সঙ্গে খেতে বসতে।

পরদিন সকালে মিলার চলে এলো সেই বাড়িতে যেখানে টউবের থাকতো। দরজা খুলে দিলো একজন মাঝবয়সী লোক। তার পরনের প্যাণ্টটা দাগ-দাগ, দড়ি দিয়ে কোমরে শক্ত করে এঁটে বাঁধা ; গলা-খোলা কামিজ, কলার-ফলার নেই। গালে অন্তত তিনদিন না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

"নমস্কার। আপনিই কি বাড়িওলা ?"

লোকটা মিলারকে আগাপাস্তলা দেখে নিয়ে মাথা নাড়লো। গা থেকে তার বাঁধাকপির গন্ধ বেরুচ্ছে।

মিলার বললো, "কয়েক রাত আগে এখানে একজন লোক গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মারা যায়।"

"আপনি কি পুলিস ?"

"না, প্রেস," প্রেসকার্ডটা বের করে দেখালো মিলার।

"আমার কিচ্ছু বলার নেই।"

লোকটার হাতে একটা দশ মার্কের নোট গুঁজে দিলো মিলার ; কোন আপত্তি তুললো না তাতে।

"ঘরটা আমি দেখতে চাই।"

"নতুন ভাড়াটে এসে গেছে।"

"ওর জিনিসপত্তর কি করেছেন ?"

"পেছনের উঠোনে রেখে দিয়েছি। তাছাড়া করার কি ছিলো ?"

কিছু জিনিস এক কোণায় রাখা ছিলো, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তার ওপর। ওগুলোতে এখনো গ্যাসের গন্ধ। পুরনো একটা টাইপরাইটার, দু জোড়া ক্ষয়ে-যাওয়া জুতো, কিছু কাপড়চোপড়, অল্প কিছু বই আর পাড়-লাগানো একটা সাদা রেশমী স্কার্ফ। স্কার্ফটাকে দেখে মিলার ভাবলো যে ইহুদী ধর্মের কোন অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠানে বোধহয় ওটা লাগে। সব জিনিসপত্র হাঁটকে দেখলো মিলার কিন্তু কোন ঠিকানার খাতা-টাতা পেলো না,

মার্ক্সের ঠিকানাও কোথাও লেখা নেই।

"এই কি সব?" জিজ্ঞেস করলো মিলার।

"হ্যাঁ," পেছন-দরজার পাশ থেকেই লোকটা মিলারের দিকে বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো।

"আপনার কোন ভাড়াটে আছে মার্ক্স নামে?"

"নাঃ।"

"কোন মার্ক্সকে চেনেন আপনি?"

"নাঃ।"

"টউবেরের কোন বন্ধুবান্ধব ছিলো?"

"আমি দেখিনি কক্ষনো। একা একাই থাকতো, আসা-যাওয়ার সময়-অসময়ও কিছু ছিলো না। মাথায় ছিট ছিলো মশায়। কিন্তু ভাড়ার টাকাটা ঠিক ঠিক দিতো, সেদিকে কোন অসুবিধা ছিলো না।"

"কখনো কারু সঙ্গে ওকে দেখেছেন? মানে, বাইরে রাস্তায়?"

"নাঃ, কক্ষনো না। বন্ধুটন্ধু ছিলো না বোধহয়। তাতে আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি, ওইরকম সব সময় বিড়বিড় বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলা,—বদ্ধ পাগল একেবারে।"

মিলার ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। রাস্তার আশেপাশে নানা লোককে জিজ্ঞাসা করলো। অনেকেরই মনে আছে মাথা নীচু করে বুড়ো লোকটা রাস্তায় পায়চারি করে বেড়াতো হাঁটু-ঝুলের একটা গ্রেটকোট পরে, উলের টুপি মাথায়, হাতে পশমের দস্তানা।

তিনদিন ধরে পাড়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়ালো মিলার। দুধের ডেয়ারি, মুদি, মাংসওলা, লোহালক্কড়ের দোকান, বীয়ারের বার, তামাকের দোকান—সর্বত্র খোঁজ করলো। রাস্তার দুধওলা এবং পোস্টম্যানকেও ধরলো। কিন্তু কোন লাভ হলো না। বুধবার বিকেলে দেখলো একদল ছেলে গুদামের দেওয়ালটাতে দমাদ্দম বল পেটাচ্ছে।

তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে, সর্দার খেলোয়াড় পাল্টা প্রশ্ন করলো, "কে, ওই বুড়ো ইহুদীটা? পাগলা দাশু?"

ততক্ষণে একে একে খেলা ছেড়ে সবাই এসে জুটেছে।

"হ্যাঁ," মিলার বললো, "সেই পাগলা দাশুই।"

দলের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, "ছিট ছিলো ওর মাথায়, এমনি করে হাঁটতো।"

বলেই ছেলেটি তার নিজের কাঁধে মাথা গুঁজে দু হাতে জ্যাকেটের দুটো ধার আঁকড়ে, পা ঘষটে ঘষটে কয়েক পা যায়, মুখে বিড়বিড় করতে থাকে আর চারদিকে চোখ গোল গোল করে তাকায়। হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে সবাই। একজন এসে আগের ছেলেটাকে মারে এক ধাক্কা, উপুড় হয়ে পড়ে যায় সে। আবার হাসির রোল ওঠে।

"কেউ দেখেছো ওকে অন্য কারু সঙ্গে কথা বলতে?" মিলার জিজ্ঞেস করে, "অন্য কোন লোক?"

দলের সর্দার সন্দেহের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, "জেনে আপনার কি হবে?"

"কোন ক্ষতি হবে না, ভালোর জন্যেই।"

মিলার পকেট থেকে পাঁচ মার্কের একটা মুদ্রা বের করে নিরাসক্তভাবে সেটা ওপরে ছোঁড়ে আর লুফে নেয়। আটজোড়া চকচকে চোখ এসে পড়ে ওই ঝকঝকে রুপোলী মুদ্রাটার ওপর। মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করে মিলার।

"শুনুন।"

থমকে ফিরে দাঁড়ালো মিলার। দলের সবচেয়ে ছোট ছেলেটি তার কাছে এসে পড়েছে।

"আমি একবার ওকে দেখেছিলাম একটা লোকের সঙ্গে। কথা বলছিলো তারা দুজনে। বসে বসে কথা বলছিলো।"

"কোথায়?"

"নদীর ওইদিকটাতে, যেখানে অনেক ঘাস আছে। বেঞ্চিও পাতা আছে, বেঞ্চিতে বসে বসে কথা বলছিলো ওরা।"

"দ্বিতীয় লোকটা কত বড়,—বুড়ো?"

"ভীষণ বুড়ো, মাথাভর্তি সাদাচুল।"

মুদ্রাটাকে ওকে যদিও ছুঁড়ে দিলো মিলার তবুও মনে মনে নিশ্চিত যে বৃথাই গেলো সেটা। হেঁটে হেঁটে চলে গেলো নদীর ধারে। দুপাশে ঘাসে ঢাকা পাড়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ডজনখানেক বেঞ্চি আছে দুধারে

পাতা, কিন্তু সবগুলো ফাঁকা। গরমকালে প্রচুর লোক এল্‌ব্‌ শসির তীরে বসে বসে বড় বড় জাহাজগুলোর আসা-যাওয়া দেখে কিন্তু এখন নভেম্বরের শেষে কেউ নেই।

এপারে বাঁদিকটাতে রয়েছে মেছোঘাটা। বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে উত্তর-সাগরের গোটা ছয় ট্রলার, হয় তারা সন্থধৃত হেরিং আর ম্যাকারেলের ঝাঁক নামিয়ে দিচ্ছে নয়তো আবার সাগরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ছোটবেলায় আলটনার তীরের এই মেছোঘাটাটা ওর বড় প্রিয় ছিলো। জেলেদেরও বড় ভালো লাগতো। সরল স্পষ্টবক্তা সব মানুষ কিন্তু মায়াদয়া খুব; গা দিয়ে তাদের আলকাতরা, নুন আর তামাকপাতার গন্ধ বেরুতো। রিগার এডুয়ার্ড রশম্যানের কথা মনে পড়লো। আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে এই একই দেশ থেকে এ ধরনের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জন্মায় কি করে!

আবার টউবেরের কথা মনে পড়লো। সমস্যাটা যে সমস্যাই রয়ে গেলো; জানাও গেলো না কোথায় গেলে তার বন্ধু মার্ক্সের দেখা পাওয়া যাবে তবু মনে হয় কোন একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে, ঠিক মাথায় আসছে না সেটা। ···ফিরে গিয়ে গাড়ি চালিয়ে রওনা দিলো। আলটনা রেলস্টেশনের কাছে এসে ঢুকলো একটা পেট্রল পাম্পে। এইখানেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো কথাটা তার মনে পড়লো। পড়লোও পাম্পের লোকটার খুব সাধারণ একটা কথা থেকে। লোকটা ওকে বোঝাচ্ছিলো যে সেদিন থেকেই উঁচু গ্রেডের পেট্রলের দাম বেড়ে গেছে। দু-চারটে মিষ্টি কথায় খদ্দেরের মেজাজ ঠিক রাখবার জন্যেই বোধহয় বললো যে আজকাল কি যে হয়েছে, দিনকে দিন টাকার দাম কমছে। খুচরো আনতে চলে গেলো সে, কিন্তু মিলার তখন হাঁ করে তার নিজের মানিব্যাগের দিকে তাকিয়েই আছে।

টাকা···অর্থ। টউবের কোথায় টাকা পেতো? সে তো কোন কাজ করতো না। জার্মান রাষ্ট্র থেকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিতেও অস্বীকার করে-ছিলো। তবুও তো সে ঠিকমতো ভাড়া দিতো, খেতোও তো বটে। বয়স ছিলো ছাপ্পান্ন অতএব বার্ধক্য পেনশনের বয়সও হয়নি। অক্ষমতার পেনশন বোধহয় পেতো, নিশ্চয়ই পেতো।

খুচরোটা পকেটস্থ করেই চলে এলো আলটনা পোস্ট-আফিসে। একটা

জানলায় ফলক সাঁটা ছিলো 'পেনশনস,' সেখানে এসে দাঁড়ালো সে।

শিকের ওপাশে বসে আছে একজন বেশ মোটামতন মহিলা। তাকে জিজ্ঞেস করলো মিলার, "আচ্ছা বলতে পারেন, পেনশানারেরা কবে এসে টাকা নিয়ে যায় ?"

"মাসের শেষদিনে।"

"অর্থাৎ এই শনিবারে ?"

"না, সপ্তাহের শেষের দিনে দেওয়া হয় না। তাই এই মাসে দেওয়া হবে শুক্রবারে, মানে পরশুদিন।"

"যারা অক্ষমতার পেনশন পায় তারাও কি ওইদিন পাবে ?" মিলার শুধলো।

"সকলেই। সব পেনশনারেরাই একই দিনে পায়।"

"এইখানেই, এই জানলাতেই ?"

"যদি আলটনায় থাকেন তো এইখানেই," মহিলা জানায়।

"কখন ? কটার সময় ?"

"পোস্টাফিস যখন থেকে খোলে।"

"ধন্যবাদ।"

শুক্রবার সকালে মিলার আবার ফিরে এলো। দেখলো পোস্টাফিস খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক বুড়োবুড়ী লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। দেওয়ালের একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিলার লক্ষ্য করে টাকা নিয়ে কে কোন্‌দিকে যায়। এগারোটার একটু আগে পেনশন নিয়ে বেরুলো এক বুড়ো যার মাথাভর্তি ফুরফুরে সাদা চুল। সিঁড়িতে বারবার টাকা গুনে নিলো, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কোটের ভেতর-পকেটে সেটা ঢুকিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে, যেন কাউকে খুঁজছে। কয়েক মিনিট পরে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। গেট থেকে বেরিয়ে আবার এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর মিউজিয়াম স্ট্রীট ধরে সোজা নদীর ধারে চলে যায়। মিলারও আসে পেছনে পেছনে।

এল্‌ব্‌ শসি পর্যন্ত আধমাইল রাস্তা হাঁটতেই বুড়োর পাকা বিশ মিনিট

সময় লাগলো। নদীর পাড়ে পৌঁছে ধীরে ধীরে ঘাসের ওপর দিয়ে গিয়ে বসলো একটা বেঞ্চিতে। পেছন থেকে আস্তে করে মিলার এলো।

"হের মার্ক্স?"

বৃদ্ধ ফিরে তাকালো কিন্তু আশ্চর্য হলো না; যেন অপরিচিত লোকদের আহ্বান শুনতে সে অভ্যস্ত।

"হ্যাঁ," গভীরকণ্ঠে বললো, "আমি মার্ক্স।"

"আমি মিলার।"

শুনে শুধু বুড়ো মাথা নাড়লো।

"আপনি কি…হের টউবেরের জন্যে অপেক্ষা করছেন?"

"হ্যাঁ," এবারেও বৃদ্ধ আশ্চর্য হলো না।

"আমি বসি?"

"বসুন।"

মিলার বেঞ্চিতে তার পাশে বসে পড়লো। দুজনেরই মুখ এল্‌ব্‌ নদীর দিকে। বিশাল একটা মালবাহী জাহাজ, ইওকোহামার কোতামারু, তখন উজানের টানে চলেছে।

"হের টউবের আর বেঁচে নেই।"

বৃদ্ধ চলন্ত জাহাজটার দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে। বিস্ময় বা শোকের কোন অভিব্যক্তিই নেই, যেন এই ধরনের সংবাদ সে প্রায়ই শুনে থাকে।

শুধু বললো, "ও!"

মিলার তাকে গত শুক্রবার রাতের ঘটনা আনুপূর্বিক জানিয়ে দিলো।

"অবাক হচ্ছেন না, আত্মহত্যা করলেন তিনি?"

"না।" মার্ক্স বললো, "ও বড় অসুখী ছিলো।"

"একটা ডায়রি রেখে গেছেন, জানেন?"

"হুঁ, আমাকে একবার বলেছিলো।"

"পড়েছেন আপনি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"না, কাউকেই পড়তে দিতো না। তবে আমাকে বলেছিলো।"

"যুদ্ধের সময় তিনি রিগাতে ছিলেন, সেইসব কাহিনী লেখা আছে।"

"হ্যাঁ, আমাকে বলেছিলো যে ও রিগাতে ছিলো।"

"আপনিও কি রিগাতে ছিলেন?"

বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো বৃদ্ধ।

"না, আমি ডাচাউয়ে ছিলাম।"

"দেখুন, হের মার্ক্স, আপনার সাহায্য আমার দরকার। ওঁর ডায়রিতে আপনার বন্ধুটি একজন এস.এস. অফিসারের কথা লিখে গেছেন। তার নাম রশম্যান—এডুয়ার্ড রশম্যান। আপনাকে তার কথা কখনো বলেছিলো?"

"হুঁ, বলেছে। রশম্যানের কথা আমাকে বলেছে। ও বেঁচেছিলো তো শুধু সেই জন্যেই। আশা করতো যে কোন-না-কোনদিন রশম্যানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।'

"হ্যাঁ, ডায়রিতেও সেকথা লিখে গেছেন। আমি তাঁর মৃত্যুর পর ডায়রিখানা পড়েছি। আমি একজন সাংবাদিক। রশম্যানকে আমি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি। তাকে বিচারের জন্যে আদালতে আনতে চাই। বুঝেছেন?"

"হুঁ।"

"কিন্তু রশম্যান যদি বেঁচে না থাকে এখন তবে তো এগুলো বৃথাই পণ্ডশ্রম হবে। আপনার মনে আছে কি হের টউবের কিছু জানতে পেরেছিলেন, রশম্যান বেঁচে আছে না মরে গেছে?"

কোতামারু জাহাজের বিলীয়মান অবয়বের দিকে তাকিয়ে রইলো মার্ক্স, কয়েক মিনিট ধরে।

"ক্যাপ্টেন রশম্যান জীবিত," অবশেষে বলে ওঠে সে, "এবং স্বাধীন।"

মিলার উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ে।

"কি করে জানলেন?"

"টউবের তাকে দেখেছিলো।"

"হ্যাঁ, সে তো আমি পড়েইছি, কিন্তু সেটা হলো গিয়ে আপনার এপ্রিল, ১৯৪৫-এর ঘটনা।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মার্ক্স।

"না, গত মাসে।"

হতভম্বের মতো মার্ক্সের দিকে তাকিয়েই রইলো মিলার।

দৃষ্টি সরিয়ে মার্ক্স নদীর দিকে তাকালো।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিলার জিজ্ঞাসা করলো, "গতমাসে ? কোথায়, কেমন করে, বলেছিলেন আপনাকে ?"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মার্ক্স মিলারের দিকে তাকালো।

"হ্যাঁ, সেদিন ও বহুরাত্রে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, ঘুম না এলেই তাই করতো। স্টেট অপেরা হাউসের পাশ দিয়ে আসছিলো। কিছু লোক তখন হল থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়াতেই টউবেরকে কয়েক মিনিট থমকে দাঁড়াতে হয়েছিলো। বলেছিলো যে তারা সবাই নাকি বেশ বড়-লোক, পুরুষগুলোর অঙ্গে ডিনার জ্যাকেট, স্ত্রীলোকগুলোর গায়ে ফারকোট, দামী দামী জড়োয়া অলঙ্কার। ফুটপাতের ধারেই তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিলো। ওরা এসে গাড়িতে উঠছে, তাই হলের উর্দিপরা কর্মী দু ধারের পথচারীদের থামিয়ে দিয়েছিলো। তখন ও রশম্যানকে দেখেছিলো।"

"অপেরা দর্শকদের মধ্যে ?"

"হ্যাঁ। আরো অন্য দুজনের সঙ্গে সে ট্যাক্সিতে চড়ে চলে গিয়েছিলো।"

"অ্যাঁ ? শুনুন, হের মার্ক্স, লোকটা যে রশম্যান তা কি উনি সঠিক চিনেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, বলেছিলো তো রশম্যান যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু তাকে তো তিনি শেষ দেখেছিলেন উনিশ বছর আগে। চেহারা অনেক বদলে যেতে পারে। কি করে অমন নিশ্চিত হতে পারলেন ?"

"বলেছিলো যে লোকটা হেসেছিলো।"

"কি করেছিলো ?"

"হেসেছিলো। রশম্যান হেসেছিলো।"

"সেটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ ?"

কয়েক বার ধরে মাথা নাড়লো মার্ক্স।

"ও বলেছিলো যে রশম্যানের হাসি একবার যে দেখেছে সে কোনদিন ভুলতে পারে না। হাসিটার বর্ণনা অবশ্য ও দিতে পারেনি কিন্তু বলেছিলো যে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ওই হাসি

দেখলেই সে চিনতে পারবে।”

“বটে? আপনি বিশ্বাস করেন সেকথা?”

“হ্যাঁ। রশম্যানকে যে ও দেখেছিলো তা আমি বিশ্বাস করি।”

“বেশ, আমিও না হয় বিশ্বাস করলাম। ট্যাক্সির নম্বর লক্ষ্য করে-ছিলেন?”

“নাঃ। বলেছিলো যে এমন সাংঘাতিক চমকে উঠেছিলো যে কিছুই করেনি, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে চলে যেতে দেখলো।”

“ইস্!” মিলার বললো, “সম্ভবত ট্যাক্সিটা গিয়েছিলো কোন হোটেলে। নম্বরটা থাকলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করা যেতো সেদিন ওদের কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো। হের টউবের আপনাকে এই ঘটনা কবে বলেছিলেন?”

“গত মাসে, যেদিন আমরা পেনশন নিই। এইখানে এই বেঞ্চিতে বসেই।”

উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো মিলার।

“আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন যে ওঁর গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না?”

মার্ক্স সুদূর থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে রিপোর্টারের মুখের ওপরে রাখলো। “জানি বইকি। টউবেরও জানতো আর সেইজন্যেই তো ও আত্মঘাতী হলো।”

সেই সন্ধ্যায় পিটার মিলার তার মায়ের বাড়িতে গেলো; সপ্তাহে একবার করে মায়ের সঙ্গে দেখা করবার নিয়মটা পালন করবার জন্যে। মায়ের সেই একই নিত্য অনুযোগ, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া হচ্ছে না, দিনভোর অতগুলো সিগারেট খাওয়া কেন, জামাকাপড় কি বিশ্রী নোংরা ইত্যাদি ইত্যাদি···।

মিলারের মায়ের মুখ ঠিক মায়েদের মতোই, তেমনই কোমল, শ্রীময়ী, মাতৃসুষমায় মণ্ডিত। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা তাঁর; কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি এখনো যে তাঁর ছেলে জীবনে সাংবাদিক হওয়া ছাড়া আর কিছু চায় না।

সেই সন্ধ্যায় এটা-সেটা পাঁচ কথার মধ্যে মা একবার জিজ্ঞেস করলেন

যে পিটারের হাতে এখন কোন্ কাজ, কিছু লিখছে-টিকছে নাকি। সংক্ষেপে তাঁকে ঘটনাটা জানিয়ে পিটার বললো যে এডুয়ার্ড রশম্যানকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে সে। শুনে তো মা আঁতকে উঠলেন।

পিটার কিন্তু একমনে ডিনার খেয়েই গেলো, মায়ের যে অত বকুনি সব যেন তার মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে গিয়ে মিশলো।

"এমনিতেই তো তুমি ওই চোর-ডাকাতগুলোর কথা লিখতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মেশো," মা বলছিলেন, "যতসব বদসঙ্গ, তার ওপর কি নাৎসীগুলোর মধ্যে গিয়ে না পড়লে চলছিলো না ? তোমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে কি ভাবতেন, আমি সত্যি সত্যিই বুঝি না…"

পলকে ওর মাথার মধ্যে কি একটা চিন্তার উদয় হলো।

"মা—"

"উঁ…বলো ?"

"যুদ্ধের সময়ে, জানো…এস.এস.রা যা সব করেছিলো না লোকেদের ওপর…মানে ওই ক্যাম্পগুলোতে…আচ্ছা, তখন কি তোমরা জানতে যে ওইরকম কিছু কাণ্ড ঘটছে ?"

ভীষণ ব্যস্ত হয়ে মা টেবিল মুছতে শুরু করে দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে বললেন, "সাংঘাতিক সব ব্যাপার। উঃ, কি ভয়ঙ্কর !…যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ওগুলোর ফিল্ম আমাদের দেখিয়েছিলো। ওসব কথা আমি আর শুনতে চাই না বাপু।"

ভড়বড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। পিছনে পিছনে পিটার চলে এলো রান্নাঘরে।

"তোমার মনে আছে মা, আমি যখন ষোলো বছরের, সেই ১৯৫০ সালে, স্কুল থেকে আমরা বহু ছাত্র পারীতে গিয়েছিলাম ?"

মা একটু থেমে, বাসন মাজবার জন্যে আবার সিঙ্কে জল ভরতে থাকলেন।

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"সেখানে সাক্র্ কোইর নামে একটা চার্চ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো আমাদের। যখন পৌঁছলাম তখন একটা মেমোরিয়াল সার্ভিস সবে শেষ

হলো, জঁ। মুর্ল্যা নামে একজন লোকের স্মৃতিতে। ততক্ষণে কিছু লোক বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো, তাদের কানে গেলো যে আমি আরেকটা ছেলের সঙ্গে জার্মানে কথা বলছি। যেই শোনা একজন আমার গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিলো। এখনো আমার মনে আছে সেই থুতু আমার জ্যাকেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো। ফিরে এসে তোমাকে বলেছিলাম। তোমার মনে আছে তুমি তখন কি বলেছিলে?"

মিসেস মিলার ডিনার-প্লেটগুলো খুব জোরে জোরে ঘষতে লাগলেন।

"তুমি বলেছিলে যে ফরাসীরা অমনিই। ভীষণ সব নোংরা অভ্যেস ওদের।"

"হ্যাঁ, তাই তো।...ওদের আমি দেখতে পারি না।"

"কিন্তু জানো, মা, জঁ। মুর্ল্যা মরে যাওয়ার আগে আমরা তার ওপর কি করেছিলাম? তুমি নও। বাবা নয়, আমিও নই। তবে আমরা, জার্মানরা, কিন্তু আসলে শুধু গেস্টাপোরা। কোটি কোটি বিদেশীর চোখে ও দুটো একই।"

"ওই সব কাহিনী আমাকে শোনাতে হবে না। এখন ছাড়ো দেখি ওসব কথা।"

"তোমাকে ওসব কাহিনী শোনাতে চাইলেও আমি শোনাতে পারবো না। কারণ আমি নিজেই জানি না। অবশ্য কোথাও না কোথাও ওসব কাহিনী নিশ্চয়ই লিখে রাখা আছে। তবে কথাটা কি জানো, আমার গায়ে থুতু ছিটিয়েছিলো আমি গেস্টাপো বলে নয়, আমি জার্মান বলে।"

"তোমার তো গর্ব হওয়াই উচিত জার্মান বলে।"

"নিশ্চয়ই, আমি গর্বিতও। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে নাৎসী বা এস.এস. বা গেস্টাপোদের সম্বন্ধেও গর্ব পোষণ করতে হবে।"

"নাঃ, তা কে বলছে! তবে তাদের নিয়ে দিনরাত্তির ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই তো আর তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে না!"

রাগ হয়ে গেছে মায়ের। পিটার তর্ক জুড়লেই তাই হয়। তোয়ালে দিয়ে হাত দুটো রগড়ে মুছে দুমদুম করে চলে গেলেন বসার ঘরে। পিটারও এলো পিছুপিছু।

"মা, তুমি বুঝছো না, ডায়রিটা না পড়া পর্যন্ত আমরা কোন্ দোষে দোষী তা জানারও আমার কোন কৌতূহল হয়নি। কিন্তু এখন যেন বুঝতে পারছি। সেইজন্যেই তো লোকটাকে, ওই পাষণ্ডকে খুঁজে বার করতে চাই। ওর অপরাধের বিচার হওয়াই তো উচিত।"

সোফার ওপর বসে রইলেন তিনি, চোখভরা জল।

"পিটারকিন, ছেড়ে দে বাবা ওসব মতলব। অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না, কোন লাভ হয় না তাতে। ওগুলো তো কবেই সব চুকেবুকে গেছে; আর কেন? ভুলে যা।"

পিটার মিলারের চোখ গিয়ে পড়লো ম্যান্টলপিসের ওপরে রাখা তার বাবার ছবিটায়। আর্মি ক্যাপ্টেনের পোশাক পরে আছেন বাবা, চোখ তেমনি স্নেহময় কিন্তু ঈষৎ বিষণ্ণ দৃষ্টি। শেষবার যখন ছুটিতে বাড়ি এসে-ছিলেন, তখনকার তোলা ফটো।

বাবার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। পাঁচ বছরের পিটারকে হাত ধরে ধরে হ্যাগেনবেক চিড়িয়াখানা দেখিয়েছিলেন, কত রকমের জন্তু-জানোয়ার সেখানে, আজও মনে পড়ে।

আর্মিতে নাম লিখিয়ে এসেছিলেন যেদিন—১৯৪০ সাল সেটা—বাড়িতে মায়ের সে কি কান্না। পিটারও ভেবেছিলো তখন; সামরিক পোশাকপরা বাবা, কি সুন্দর ব্যাপার,...অথচ—? মেয়েছেলেরা বড় বোকার মতো কাঁদে!...১৯৪৪-এর সেদিনটার কথাও মনে আছে তার; দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো একজন আর্মি অফিসার, মাকে বললো যে তাঁর সমরনায়ক স্বামী পূর্ব-রণাঙ্গণে নিহত হয়েছেন।...

"তাছাড়া," মা তখনও বলছিলেন, "ওইসব পুরনো জঘন্য কাণ্ড এখন আর কেউ প্রকাশ করতে চায় না। এই যে বিচারগুলো হলো, কতরকম বীভৎস কাহিনী তাতে বাইরে এসে পড়লো, কেউ কি তা নিয়ে আনন্দিত হয়? তুমি যদি ওদের খুঁজে বারও করো, তাহলেও কেউ তোমায় ধন্যবাদ দেবে না বরং তোমার দিকে আঙুল দিয়ে দিয়েই দেখাবে। মানে, এইসব বিচার-টিচার এখন আর কেউ চায় না। এতদিন হয়ে গেলো, কদ্দিন বা মানুষে জের টানবে। ছেড়ে দাও, অন্তত আমার মুখ চেয়ে ছেড়ে দাও।"

পিটারের মনে পড়লো খবরের কাগজে কালো বর্ডার দেওয়া সেই স্তম্ভটি। প্রতিদিনের মতো অতখানিই লম্বা, তবু শেষ অক্টোবরের সেদিনেরটা কত ভিন্ন, কারণ প্রায় মাঝখানেই ছাপানো ছিলো ঃ

'ফ্যুয়েরার এবং পিতৃভূমির জন্যে জীবন দিয়েছেন ঃ ১১ই অক্টোবর তারিখে অস্টল্যাণ্ডে—মিলার, এরউইন, ক্যাপ্টেন।"

অতটুকুই, আর কিচ্ছু না। কোথায়, কেন, কখন,—কিছুই না। পূর্বাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত দশ-বিশ হাজার নামের মধ্যে শুধু একটি।

মা বলছিলেন, "তোমার বাবার কথাটাও একবার ভেবে দেখো। তিনি বেঁচে থাকলে কি চাইতেন যে তাঁর ছেলে আরেকটা যুদ্ধ-অপরাধীর বিচার আদালতে টেনে আনে? তিনি কি কক্ষনো সে কাজে অনুমোদন দিতেন?"

মিলার ঘরের অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিলো। মায়ের কথা শুনে চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। গোটা মেঝে পেরিয়ে এদিকে এসে মায়ের দু কাঁধে দু হাত রেখে তাঁর ভীতসন্ত্রস্ত টলটলে দুই নীল চোখের মধ্যে চোখ দিয়ে বললো, "হ্যাঁ, মুটি। তিনি বেঁচে থাকলে এটাই চাইতেন।"

মায়ের কপালে আলতো করে চুম্বন এঁকে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। গাড়িতে উঠে বসে গতি তুলে চললো হাম্বুর্গের দিকে। মনের রাগ মনের ভেতরেই টগবগিয়ে ফুটতে থাকে।

হ্যান্স হফম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় যাদের ছিলো বা যাদের ছিলোও না, তারা সবাই স্বীকার করে যে হফম্যান হলো সফল পত্রিকা-সম্পাদকের নিখুঁত চরিত্রায়ণ। উত্তর-চল্লিশ বয়স, কিশোরের মতো সুকুমার, পাকধরা চুলেও আধুনিক ছাঁট, ম্যানিক্যুর করা নখ। অঙ্গের স্যুটটা সেভিল-রো থেকে কাটা, ভারী রেশমী টাইটা কার্ডিনের। তাকে ঘিরে আছে যেন সচ্ছলতার সমুদ্র।

অবশ্য শুধু চেহারা দিয়েই হফম্যান আজ পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও সবচাইতে সফল পত্রিকা-সম্পাদক হয়নি, হওয়াও যায় না। যুদ্ধের পর শুরু করেছিলো হাতচালানো মেশিন দিয়ে, ছাপাতো শুধু

ব্রিটিশ-অধিকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নানারকম হ্যাণ্ডবিল। ১৯৪৯-এ তার প্রথম সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকা বের হয়। তার নীতি খুব সহজ—ভাষা দিয়ে দিয়ে এমন কাহিনী ফাঁদো যে লোকে যেন আঁতকে ওঠে, তার সঙ্গে দাও তেমনি সব ছবি যাতে অন্যান্য পত্রিকার ছবিগুলোকে মনে হবে নেহাৎই জোলো। কাজ হলো। আটটা পত্রিকার মালা এখন তার নিজের ; কিশোরদের জন্যে প্রেমের গল্প থেকে শুরু করে ঝকঝকে পৃষ্ঠায় ধনী যৌনাচারীদের অভিসার কাহিনী। ফলে হফম্যান এখন ক্রোড়পতি। তবু তার নিজস্ব সংবাদ-পত্রিকা 'কমেট'ই এখনো তার প্রিয়পাত্র, যেন বাড়ির ছোট ছেলেটি।

সেদিন বুধবারের বিকেলে সলোমন টউবেরের দিনপঞ্জীর ভূমিকা পড়ে নিয়ে ডায়রিখানা বন্ধ করলো হফম্যান। তারপর চেয়ারে পিঠ এলিয়ে জুত হয়ে বসে তাকালো মিলারের দিকে।

"হুঁ, বাকিটুকু ধারণা করে নিতে পারছি। তা তুমি কি চাও ?"

"আমার তো মনে হচ্ছে দলিল হিসাবে এটা সাংঘাতিক," মিলার বললো, "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ডায়রিতে একটা লোকের বর্ণনা আছে, নাম এডুয়ার্ড রশম্যান। লোকটা রিগার ঘেটোতে এস.এস. ক্যাপ্টেন ছিলো ; ৮০,০০০ নরনারী শিশুকে নির্দ্বিধায় হত্যা করেছে। আমার বিশ্বাস সে এখনো বেঁচে আছে এবং পশ্চিম জার্মানীতেই রয়েছে। তাকে আমি খুঁজে বার করতে চাই।"

"কি করে জানলে যে সে বেঁচে আছে ?"

মিলার তাকে সংক্ষেপে সব বললো, হফম্যান তাই শুনে ঠোঁট-টোঁট কুঁচকে বলে উঠলো, "প্রমাণ ভীষণ পাতলা হে।"

"হুঁ, তবু আরো একটু দেখতে ক্ষতি কি ? আমি তো এর আগে কত কাহিনী এনে দিয়েছি আপনাকে, সেগুলোতে গোড়াতে তো প্রমাণ ছিলো আরো অনেক কম।"

হফম্যান হাসে। তা সত্যি, এইসব ব্যাপারে মিলারের রীতিমতো প্রতিভা আছে ; সমাজ-সংসার শিউরে ওঠে যেসব সত্যকাহিনী পড়ে সেগুলো খুঁজে বার করতে মিলার প্রায় অদ্বিতীয়। হফম্যান সেগুলো

প্রকাশও করেছে বিনা বাধায়, কারণ পরখ করে দেখেছিলো যে সব সত্যি কথা। সেই কারণেই তো তার পত্রিকার প্রচার এত বেড়ে গেছে।

"তাহলে এই যে লোকটা, কি যেন নাম বললে—রশম্যান ?—তার নাম নিশ্চয়ই পুলিসের খাতায় আছে। আর পুলিস যদি তাকে খুঁজে না পেয়ে থাকে, তুমি কি করে পাবে ?"

"পুলিসে কি সত্যি সত্যিই তাকে খুঁজছে," মিলার শুধালো।

হফম্যান কাঁধ নাচায়। "খোঁজারই তো কথা, সেইজন্যেই তো আমরা ট্যাক্স দিয়ে থাকি।"

"তবুও যদি খানিকটা মদত দিই, মন্দ কি ? খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো লোকটা বেঁচে আছে কিনা, আগে কোনদিন ধরাটরা পড়েছিলো কিনা, পড়লে কি হয়েছিলো তারপর ?"

"হুঁ, তা আমার কাছ থেকে কি চাও ?" হফম্যান প্রশ্ন করে।

"চেষ্টাটা করবার জন্যে আপনার তরফ থেকে একটা কার্যভার। শেষমেষ যদি কিছু না পাওয়া যায়, ছেড়ে দেবো।"

হফম্যান চেয়ার সমেত ঘুরে গেলো। কাঁচের সার্সি দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখলো কুড়িতলা নীচে, অন্তত মাইলখানেক দূরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে শুধু জাহাজঘাট। মাইলের পর মাইল শুধু ক্রেন আর ক্রেন আর নোঙর-করা পোত।

"এই ব্যাপারটা তো তোমার লাইনে পড়ে না, মিলার। হঠাৎ এত উৎসাহ কেন !"

মিলার ভীষণভাবে ভাবতে থাকে কি বলা যায়। প্রকাশক বা সম্পাদককে ভজানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিককে তো আবার কাহিনী বেচেই খেতে হয়, প্রথমে হয় প্রকাশকের কাছে নইলে সম্পাদকের দুয়ারে। পাঠকসমাজ আসে তার অনেক পরে।

"কাহিনীটায় মানবিক দিক যথেষ্ট। তাছাড়া দেশের পুলিসফৌজ যেখানে নাজেহাল সেখানে 'কমেট' যদি তাদের ঈপ্সিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করতে পারে তো সে কাহিনীর মার কোথায় ! লোকে তো ভীষণ নেবে।"

ডিসেম্বরের ধোঁয়াটে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে হফম্যান। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, "উঁহুঁ, যা ভাবছো তা নয়। সেইজন্যেই তো তোমাকে আমি এই কাজের ভার দিচ্ছি না। লোকে এই জিনিস মোটে শুনতেও চাইবে না।"

"কিন্তু, হের হফম্যান, তা কেন হবে? রশম্যান যাদের মেরেছিলো তারা তো পোল বা রাশিয়ান নয়, তারা জার্মান। ইহুদী বটে তবে জার্মান। তাহলে লোকে কেন শুনতে চাইবে না?"

জানলার দিক থেকে চেয়ারসুদ্ধু ঘুরে আবার টেবিলের সম্মুখে এসে পড়লো হফম্যান। ডেস্কে কনুয়ের ভর দিয়ে গালের দু পাশে হাত রাখলো।

"তুমি ভালো রিপোর্টার, মিলার। তোমার সংবাদ আহরণ করার পদ্ধতি আমার বেশ ভালো লাগে। তোমার লেখার ধরনটাও চমৎকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তুমি নিজে খবর-সন্ধানী, শিকারীর মতোই তোমার খরদৃষ্টি। টেলিফোন তুললেই আমি এই শহরে যে-কোন মুহূর্তে পঞ্চাশ থেকে একশোজন সাংবাদিককে পেয়ে যেতে পারি, তাদের যা বলবো তারা তাই করবে, যে কাহিনীর পেছনে ছোটাবো সেগুলোই খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করে আনবে। কিন্তু তারা কেউই তোমার মতো নিজের থেকে কোন কাহিনীকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পারে না। শুধু সেই কারণেই তুমি আমার কাচ থেকে প্রচুর কাজ পেয়ে থাকো, ভবিষ্যতে আরো পাবে। কিন্তু এইটা না।"

"কেন, এটা তো বেশ ভালো কাহিনী?"

"শোনো, মিলার, তোমার এখন বয়স কম, সাংবাদিকতা সম্বন্ধে দু-চারটে কথা শুনে রাখো। সাংবাদিকতার একটা পিঠ হলো ভালোভাবে ভালো কাহিনী লেখা, আর দ্বিতীয় পিঠ হলো সেগুলো বিক্রি করা। প্রথমটা তুমি করতে পারো কিন্তু দ্বিতীয়টা আমি। সেইজন্যেই আজ আমি এখানে বসে আছি আর ওইখানে তুমি। তুমি বললে যে এই কাহিনী সবাই পড়তে চাইবে, কারণ রিগাতে যারা মরেছিলো তারা জার্মান ইহুদী। কিন্তু আমি বলছি, শুনে রাখো তুমি, শুধুমাত্র সেই কারণেই কেউ তোমার এই কাহিনী পড়বে না। কোনদিন পড়তে চাইবেও না। যদি না তুমি

আইন পাস করে বাধ্য করো যে অমুক পত্রিকার অমুক সংখ্যা তোমাদের পড়তেই হবে কেননা তাতেই আছে তোমাদের মঙ্গল। যদ্দিন সেরকম কোন নিয়ম না হচ্ছে তদ্দিন লোকে তাদের রুচিমাফিক পত্রিকাই পড়বে এবং সেরকম পত্রিকাই বিক্রি হবে। কাজেই আমি ওদের শুধু সেটুকুই দিই যেটুকু ওরা পড়তে চায়।”

“কিন্তু রশম্যানের কাহিনী পড়তে চাইবে না কেন…কারণ কি?”

“ওঃ, বোঝোনি দেখছি। আচ্ছা, খোলসা করে বলছি। যুদ্ধের আগে জার্মানীতে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ইহুদীকে চিনতো। আসলে, হিটলারের অভ্যুত্থানের আগে জার্মানীতে মোটেই ইহুদীবিদ্বেষ ছিলো না। ইউরোপের যে-কোন দেশের চাইতে ইহুদী সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আমরা জার্মানরাই সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করতাম। পোল্যাণ্ড বা রাশিয়ার চেয়ে তো বটেই এমন কি ফ্রান্স বা স্পেনের চাইতেও।…তারপর হিটলার শুরু করলো। লোকেদের বলতে লাগলো সবকিছুর মূলে আছে ইহুদীরা, তা সে প্রথম মহাযুদ্ধই হোক বা দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বই হোক,—যা কিছু খারাপ সবায়ের মূলে ওই ইহুদীরাই। লোকে বুঝতে পারে না কোন্ কথাটা বিশ্বাস করবে। সবাই ভাবে আমি যে ইহুদীকে চিনি, সে তো ভালো লোক, অন্তত ভালো না হলেও ক্ষতিকারক তো নয়। অথচ হিটলার বলছে—তাহলে কোন্‌টা বিশ্বাসযোগ্য? তারপর যখন ভ্যানগুলো এসে ওদের নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো লোকে কোন প্রতিবাদ করলো না, চুপ-চাপ এড়িয়েই থাকলো। তদ্দিনে বোধহয় ‘যার গলা যত উঁচু, সে তত খাঁটি’ এই নীতির ফল ধরেছে, লোকে বিশ্বাস না করলেও তাদের অবিশ্বাস ভেঙে গেছে। কারণ আমাদের জার্মানদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যই যে এই। আমরা খুব বাধ্য। এটা অবশ্য যেমন আমাদের পক্ষে লাভজনকও আবার ক্ষতিকারকও তেমনি। এরই জোরে তো আমরা অর্থনৈতিক বিষয় সৃষ্টি করতে পেরেছি যখন ব্রিটিশদের মতো জাত শুধু দেশময় ধর্মঘট করে বেড়াচ্ছে আবার এরই জন্যে আমরা নির্বিবাদে হিটলারের পেছনে পেছনে বিশাল গোরস্থানে গিয়ে পৌঁছেছি।…বহুদিন লোকে জিজ্ঞাসাই করেনি যে তাদের চেনা ইহুদীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে। তারা শুধু অদৃশ্য হয়ে গেলো

—বাস, আর কিছুই না। যুদ্ধ-অপরাধের বিচারকাহিনীগুলো পড়ে তো লোকে শিউরে উঠতো, ভীষণ বিশ্রী লাগতো তাদের, তবুও তো সেই ইহুদী-গুলো অজানা, কোথায় কোন্ ওয়ারস, লুবলিন, বিয়ালিস্তক বা পোল্যাণ্ড বা রাশিয়ার নামহীন গোত্রহীন ইহুদী। আর তুমি এখন তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাও যে তাদের পাশের বাড়ির ইহুদীটার কি হয়েছিলো ? এখন বুঝতে পারছো তুমি ? এই ইহুদীগুলো—" ডায়রিটার ওপর টোকা মেরে হফম্যান বললো, "তাদের চেনা, তাদের বিশেষ পরিচিত, রাস্তায় দেখা হলেই নমস্কার করতো, তাদের দোকানপসার তো এরাই কিনে নিয়েছে, অথচ হের রশম্যান যখন ওদের শায়েস্তা করবার জন্যে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেলো তখন তারা নির্বিকার হয়ে রাস্তা থেকে দেখেছিলো। ভাবছো যে এই কাহিনী কেউ পড়বে ? জার্মানীতে অন্তত না।"

কথা বলা শেষ করে হ্যান্স হফম্যান চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ডেস্কের ওপরে রাখা কৌটো থেকে বেছে বেছে একটা নধরগোছের ছোট চুরুট বের করে নিয়ে সোনার লাইটার দিয়ে জ্বালালো। মিলার চুপচাপ বসে বসে হফম্যানের বক্তৃতাটা হজম করতে করতে ভাবে অতঃপর কি করা যায়, উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলো না।

খানিক পরে বলে উঠলো, "মা কি এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন ?"

হফম্যান ঘোঁত করে শব্দ করে উঠলো, "হয়তো।"

"তবুও সেই খচ্চরটাকে আমি খুঁজে বার করবো।"

"যেদ্দাও মিলার, ছেড়ে দাও। কেউ তোমাকে অভিনন্দনও জানাবে না।"

"আচ্ছা, ওইটাই একমাত্র কারণ নয়, না ? ওই যে জনমত-টনমত ওটাই শুধু নয়, আরো একটা কারণ আছে। তাই না ?"

চুরুটের ঘন ধূম্রজালের ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে হফম্যান তাকে দেখে। তারপর বলে ওঠে, "হুঁ।"

"ভয় পান ওদের এখনো ?" মিলার শুধায়।

মাথা নাড়ে হফম্যান। "না, তা নয়। তবে ঝামেলা-ফামেলা হোক, তা আমি চাই না।"

"ঝামেলা মানে,···কি হবে কি ?"

হফম্যান জিজ্ঞেস করে, "হ্যান্স হেবের নাম শুনেছো ?"

"কে, ঔপন্যাসিক হেব ? হ্যাঁ ।···কেন ?"

"একদা তিনি ম্যুনিখে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতেন, অনেকদিন আগে, পঞ্চাশের প্রায় গোড়ার দিকে। পত্রিকাটা ভালো ছিলো, তিনি নিজেই তো খুব ভালো সাংবাদিক ছিলেন, তোমার মতোই। নাম ছিলো 'সপ্তাহের প্রতিধ্বনি'। নাৎসীদের ভীষণ ঘৃণা করতেন তিনি ; ম্যুনিখে এস.এস.এর যে-সব প্রাক্তন অফিসার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছিলো, তাদের আগেকার কাজকর্ম ফাঁস করে দেবার জন্যে তাঁর পত্রিকায় ক্রম-প্রকাশ্য এক সংবাদকাহিনী শুরু করলেন।"

"তারপর, কি হলো তাঁর ?"

"কিছু না···তাঁর নিজের কিচ্ছু হয়নি। একদিন শুধু বহু চিঠি এলো ডাকে, অর্ধেকটাই তাঁর বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে, বিজ্ঞাপন তারা তুলে নিচ্ছে। আরেকটা চিঠি এসেছিলো তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে, অনুরোধ করা হলো তিনি যেন একবার ব্যাঙ্কে আসেন। ব্যাঙ্কে যেতেই তারা জানিয়ে দিলো যে ঠিক তক্ষুনি, সেই মুহূর্ত থেকেই, তাঁর ওভারড্রাফ্‌ট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকাটা উঠে গেলো। তিনি এখন উপন্যাস লেখেন, ভালো ভালো উপন্যাস। তবে পত্রিকা আর তিনি চালান না।"

"তাহলে আমাদের কি কর্তব্য ? ভয়ে গর্তে ঢুকবো ?"

হফম্যান একটানে মুখ থেকে চুরুট খুলে নিলো।

"তোমার কাছ থেকে আমি এসব শুনতে চাই না, মিলার," আগুনের ভাঁটার মতো চোখ করে বললো, "ওই খচ্চরগুলোকে আমি তখনো ঘৃণা করতাম, এখনো করি। কিন্তু আমার পাঠকদের আমি চিনি। তারা এডুয়ার্ড রশম্যানের কাহিনী শুনতে চাইবে না।"

"বেশ, আমি দুঃখিত, হের হফম্যান। আমি কিন্তু তবুও ছাড়ছি না এই কাহিনী, খুঁজে বার করবোই।"

"দেখো মিলার, তোমাকে আমি যদি না চিনতাম, তাহলে নিশ্চয়ই

ভাবতাম যে তোমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে এর পেছনে। সাংবাদিকতাকে কখনো ব্যক্তিগত করে তুলো না, তার ফল খারাপ হয় রিপোর্টিঙের পক্ষে এবং রিপোর্টারের পক্ষেও। সে যাক…এই কাজের খরচ যোগাবে কি করে?"

"আমার কিছু সঞ্চয় আছে।" মিলার উঠলো।

টেবিল ঘুরে মিলারের সামনে চলে এলো হফম্যান। "আচ্ছা, তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি।…হ্যাঁ, শোনো, রশম্যানকে যদি পশ্চিম জার্মানীর পুলিস কখনো গ্রেপ্তার করে তাহলে আমি তোমাকে সেই সংবাদের কাহিনী লিখতে আমার পত্রিকার পক্ষ থেকে ভার দেবো। কারণ তখন সেটা হবে প্রকাশ্য ব্যাপার, স্রেফ সংবাদ। যদি সেটা নাও ছাপাই তবুও পকেটের কড়ি খসিয়ে কিনে নেবো তোমার কাহিনী। কিন্তু যতদিন তুমি এই ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবে, আমার পত্রিকার পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিনিধিত্ব তুমি পাবে না।"

"ঠিক আছে," মিলার ঘাড় নাড়লো। "আবার ফিরে আসবো আমি।"

পাঁচ

সেই বুধবার সকালে ইস্রায়েলি ইনটেলিজেন্স সংগঠনের সব কটি বিভাগ-প্রধানেরা মিটিঙে বসেছিলেন। প্রতি সপ্তাহেই তাঁরা একবার করে এরকম বৈঠকে বসেন। ইস্রায়েলের সৌভাগ্য যে অন্য বড় বড় দেশগুলোর মতন সেখানে কোন বিভাগীয় রেষারেষি নেই; ইনটেলিজেন্স সংগঠনের পাঁচটা বিভাগের মধ্যেই আছে পূর্ণ সহযোগিতার বাতাবরণ।

ডিসেম্বরের ৪ তারিখের সেই মিটিঙে যোগ দেবার জন্যে কালো লম্বা গাড়ি করে আসছিলেন ইস্রায়েলি ইনটেলিজেন্স সংগঠন বা মোসাদের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মেইর আমিত। সবে ভোর হয়েছে। তেল আভিভের আকাশ থেকে ঊষার প্রথম ছটা এসে শহরের হংসশুভ্র অট্টালিকা-

গুলোকে দীপ্যময় করে তুলেছিলো। কিন্তু এসব নিসর্গসৌন্দর্য দেখবার মতো মন তখন ছিলো না জেনারেলের ; ভীষণ চিন্তা তাঁর।

চিন্তার কারণ ছিলো একটুকরো সংবাদ, রাতের শেষযামে যা এসে পৌঁছেছে তাঁর কাছে। ছোট্ট খবর, মোটা নথীতে গিয়ে যুক্ত হবে। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁর কায়রোস্থিত প্রতিনিধি-দ্বারা প্রেরিত সেই সংবাদ যে নথীতে গিয়ে সংরক্ষিত হবে তার বিষয়বস্তু হলো হেলওয়ানের রকেট।

উর্দিপরা শোফেয়ার গাড়িটাকে জিনা সার্কাসে প্রায় পূর্ণবৃত্তে ঘুরিয়ে নিয়ে রাজধানীর উত্তরাঞ্চলের দিকে চললো। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক জেনারেলটি নরম গদীতে হেলান দিয়ে মনে মনে ভাবতে থাকেন হেলওয়ান রকেটের কথা, কায়রোর উত্তরে যেগুলো বানানো হচ্ছে…লম্বা ইতিহাস তার…তাঁর…কতগুলো লোক যে প্রাণ দিলো ওই রকেটের পেছনে…পূর্ব-সূরী জেনারেল ইসার হ্যারেল তো চাকরিই খোয়াতে বসেছিলেন…

নাসের যখন তাঁর রকেট দুটিকে কায়রো শহরের রাস্তায় লোকচক্ষের সামনে প্রদর্শনী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার অনেক আগেই, ১৯৬১ সালের কোন একসময়ে, ইস্রায়েলি মোসাদ ওগুলোর অস্তিত্ব টের পেয়ে-ছিলো। মিশর থেকে খবর আসামাত্র ফ্যাক্টরি ৩৩৩-এর ওপর সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখলো তারা।

ওডেসার সহযোগে মিশরীয়রা যে হেলওয়ান রকেটের ওপর কাজ করবার জন্যে প্রচুর সংখ্যায় জার্মান বৈজ্ঞানিক ভর্তি করছে, সে খবরও তারা জানতো। ব্যাপারটা তখনই বেশ গুরুতর ছিলো, কিন্তু ১৯৬২-র বসন্তে চরমে উঠলো।

সেই বছরের মে মাসে বৈজ্ঞানিকদের নিয়োগ করবার বন্দোবস্ত করতো যে জার্মান, সেই হাইনৎস ক্রুগ, ভিয়েনাতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ডঃ অটো ইয়কলেকের সঙ্গে সংযোগ করে। অস্ট্রিয়ান অধ্যাপকটি কাজ তো নিলেনই না, বরং সরাসরি ইস্রায়েলিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা বলে দিলেন। শুনে তো তেল আভিভ চমৎকৃত। মোসাদের যে প্রতি-

নিধিদের পাঠানো হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাদের অধ্যাপক জানালেন যে ইজিপ্সিয়ানরা রকেটগুলোর ওয়ার-হেডে তেজস্ক্রিয় পরমাণবিক আবর্জনা এবং বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু ভরবার পরিকল্পনা করেছে।

খবরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে স্বয়ং মোসাদের কনট্রোলার, জেনারেল ইসার হ্যারেল উড়ে এলেন ভিয়েনায়, ইয়কলেকের সঙ্গে কথা বলতে। জেনারেল হ্যারেলই হলেন সেই লোক যিনি অপহৃত অ্যাডলফ আইখম্যানকে নিজস্ব পাহারায় বুয়েনস আয়ার্স থেকে তেল আভিভে নিয়ে এসেছিলেন। অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে হ্যারেল নিশ্চিত যে তাঁর খবর খাঁটি। আরো প্রমাণ পাওয়া গেলো : কায়রো সরকার জুরিখের একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে এত পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কোবল্ট কিনেছে যা তাদের চিকিৎসাগত প্রয়োজনের অন্তত পঁচিশগুণ বেশী।

ভিয়েনা থেকে ফিরে ইসার হ্যারেল প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়নের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে ইজিপ্টে যে-সমস্ত জার্মান বৈজ্ঞানিক কাজ করছেন বা যাঁরা সেখানে যাবার জন্যে প্রস্তুত তাঁদের বিরুদ্ধে যেন প্রতিশোধ নিতে তাঁকে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ফাঁপরে পড়লেন। একদিকে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ওইসব জঘন্য ষড়যন্ত্র, আবার অন্যদিকে জার্মানী থেকে ট্যাঙ্ক এবং বন্দুক আসবার আসন্ন প্রত্যাশা। জার্মানীর পথে পথে যদি ইস্রায়েলি প্রতিশোধের পালা শুরু হয়ে যায় তো চ্যান্সেলর অ্যাডেনয়ের তাঁর বিদেশ মন্ত্রকের ইস্রায়েল-বিরোধী উপদলের পরামর্শ শুনে অস্ত্রসরবরাহ বন্ধ করে দিতে হয়তো বাধ্য হবেন।

তেল আভিভের মন্ত্রিসভাতেও অস্ত্রচুক্তিটি নিয়ে দ্বিমত, প্রায় বনের মতোই। ইসার হ্যারেল এবং বৈদেশিক মন্ত্রী মাদাম গোল্ডা মেইর জার্মান বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ; ওদিকে শিমন পেরেস এবং সশস্ত্রবাহিনী আতঙ্কিত, যদি অমূল্য জার্মান ট্যাঙ্কগুলো না পাওয়া যায়। বেন গুরিয়ন এই দুইয়ের মাঝে দ্বিধান্বিত।

অবশেষে একটা আপস করলেন তিনি। হ্যারেলকে বললেন যে

নাসেরকে রকেট বানিয়ে দিতে যাচ্ছে যে জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা তাদের পাকেপ্রকারে নিরুৎসাহিত করলে তাঁর কোন আপত্তি নেই।···তবে হ্যারেল অন্তর থেকে জার্মানদের ঘৃণা করতেন, কাজেই কার্যক্ষেত্রে তিনি বেন গুরিয়নের আদেশের সীমা ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২, হাইনৎস ক্রুগ উধাও। আগের রাত্রেই ভোজ খেয়েছে ডঃ ক্লাইন ওয়াখটারের সঙ্গে, রকেট-প্রোপালশন বিশেষজ্ঞ হিসাবে যাঁকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো ক্রুগ। ভোজের টেবিলে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় মিশরীয়ও ছিলো। ১১ তারিখ সকালে মুনিখের শহরতলী অঞ্চলে ক্রুগের বাড়ির কাছেই তার পরিত্যক্ত মোটরগাড়ি পাওয়া গেলো। তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রী অভিযোগ জানালো যে ইস্রায়েলি চরেরা তার স্বামীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। কিন্তু ম্যুনিখের পুলিস কোন সূত্রই খুঁজে পেলো না; ক্রুগের কোন চিহ্ন নেই, তথাকথিত হরণকারীদেরও না। আসলে কিন্তু তাকে যারা হরণ করেছিলো তাদের নেতা একজন প্রায় দেহধারী অশরীরী,—নাম লিওঁ, আর ক্রুগের দেহে ভারী ভারী শেকলের কর্সেট পরিয়ে স্ট্যানবার্গ হ্রদে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

অভিযান তারপর শুরু হলো যে-সমস্ত জার্মান ইতিমধ্যেই মিশরে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে তাদের ওপর। ২৭শে নভেম্বর হাম্বুর্গ থেকে পোস্ট করা একটা রেজেস্ট্রি প্যাকেট এলো অধ্যাপক উলফগ্যাঙ্গ পিলৎসের নামে তাঁর কায়রোর ঠিকানায়। প্যাকেটটা তাঁর সেক্রেটারি মিস হ্যানেলোর ওয়েণ্ডা খুলতে গিয়েই বিরাট বিস্ফোরণে চিরজীবনের জন্যে মেয়েটি পঙ্গু এবং অন্ধ হয়ে গেলো।

নভেম্বরের ২৮ তারিখে আরো একটা পার্শেল এলো ৩৩৩নং ফ্যাক্টরিতে। এটিও হাম্বুর্গ থেকে পাঠানো। মিশরীয়রা ততদিনে সাবধান হয়ে গেছে, সুরক্ষার জাল বসিয়েছে তত্রাগত পার্শেলগুলোর ওপর। অতএব, পার্শেলটির ফিতে কাটলো ডাকঘরের জনৈক মিশরীয় কর্মী। ফল পাঁচজন হত, দশ-জন আহত। ২৯শে তারিখে অন্য একটা পার্শেলকে বিনা বিস্ফোরণেই ডিফিউজ করে দেওয়া গেলো।

১৯৬৩-র ২০শে ফেব্রুয়ারি নাগাদ হ্যারেলের অনুচরেরা আবার জার্মানীর

দিকে দৃষ্টি দিলো। ডঃ ক্লাইনওয়াখটার তখনো মনস্থির করতে পারেননি কায়রোতে যাবেন কি যাবেন না। স্যুইস সীমান্তের কাছে লোয়েরাখে তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে তিনি তাঁর গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ একটা কালো মার্সিডিজ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়লেন, আর ওদিকে উইণ্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে দমাদ্দম অটোমেটিক পিস্তলের সবকটা গুলি এসে ঢুকলো। পুলিস পরে মার্সিডিজটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলো। দেখা গেলো যে ঘটনার দিন সকালবেলায় ওই গাড়িটা চুরি হয়ে গিয়েছিলো। গ্লোভস কম্পার্টমেণ্ট হাঁটকে একটা পরিচয়-কার্ডও পাওয়া গেলো, কর্নেল আলি সামিরের নামে। অনুসন্ধান করে অবগত হওয়া গেলো যে কর্নেল আলি সামির হচ্ছেন ইজিপ্সিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানের নাম। অর্থাৎ ইসার হ্যারেলের অনুচরেরা এবারে তাদের বক্তব্য বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, সঙ্গে রেখেও গেছে খানিকটা স্থূল রসিকতা।

ইতিমধ্যে আক্রোশের অভিযান কাহিনীগুলো জার্মানীতে ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছিলো, সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে খবরগুলো ছাপা হচ্ছিলো। বেন গালের ব্যাপার তো রীতিমতো কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করলো। মার্চের ২রা তারিখে নাসের-রকেটের পুরোধা অধ্যাপক পল গ্যের্কের যুবতী কন্যা হাইডি গ্যের্কে তার ফ্রেইবুর্গের বাড়িতে টেলিফোনে একটা নেমন্তন্ন পেলো। দূরাগত কণ্ঠস্বর তাকে ফোনে জানালো যে সে যেন সীমানার ঠিক ওপারেই সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেলে ত্রিরাজ হোটেলে আহ্বায়কের সঙ্গে দেখা করে।

জার্মান পুলিসকে জানিয়ে দিলো হাইডি, তারা জানালো স্যুইসদের। সাক্ষাৎকারের জন্যে যে কামরা ভাড়া করা হয়েছিলো সেটায় তারা গোপনে বাগিং যন্ত্র লাগিয়ে রাখলো। সেই মিটিঙে কালো চশমা পরা দুজন লোক হাইডি এবং তার ছোট ভাইকে শাসিয়ে গেলো যে ইজিপ্ট থেকে তাদের বাবা যদি না চলে আসেন তো তাঁর প্রাণহানি ঘটবে। চুপিচুপি পিছু ধাওয়া করে সেই রাত্রেই পুলিস তাদের জুরিখে গ্রেপ্তার করে। ব্যাসেলে বিচার শুরু হলো ১০ই জুন ১৯৬৩। আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি কাহিনী। অনুচর দুজনের পাণ্ডা ছিলো ইয়োসেফ বেনগাল, ইস্রায়েলের নাগরিক।

বিচার ভালোভাবেই চললো। অধ্যাপক ইয়কলেক সাক্ষ্য দিলেন প্লেগ-জীবাণু এবং তেজস্ক্রিয় ওয়ারহেডগুলো সম্বন্ধে। বিচারকেরা মর্মাহত হলেন। ইস্রায়েলিরাও চেষ্টার ক্রটি রাখলো না। এই অঘটন থেকে যতটা সম্ভব মিশরীয়দের হীনতম চক্রান্ত সম্পর্কে ফলাও প্রচার হোক। ফলে অভিযুক্ত দুজন মুক্তি পেয়ে গেলো।

কিন্তু এই ঘটনায় ইস্রায়েলে ঘটে গেলো অনেক কিছু। জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাডেনয়ের ব্যক্তিগতভাবে বেন গুরিয়নকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি নিজে হেলওয়ান রকেট নির্মাণে জার্মান বৈজ্ঞানিকদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করবেন। কাজেই বেন গুরিয়ন এই বিশ্রী কাণ্ডটার পর ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন : অ্যাডনয়ের কি ভাববেন, ছি ছি ! রাগের চোটে তিনি ইসার হ্যারেলকে যাচ্ছেতাই করে বকলেন ; জার্মানীর পথেঘাটে অমন প্রকাশ্য গুণ্ডামি কেন, বারণ করা হয়েছিলো না ! হ্যারেলও সমান তেজে পদত্যাগপত্র দিয়ে দিলেন। কিন্তু হ্যারেল ভাবতেই পারেননি যে বেন গুরিয়ন সেটা গ্রহণ করবেন। বোধহয় ওটা গ্রহণ করে বেন গুরিয়ন প্রমাণ করলেন যে তিনি মুখে যা বলেন, কাজেও তাই করেন অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই শাসনতন্ত্রে অপরিহার্য নয়, এমন কি কনট্রোলার অব ইনটেলিজেন্সও না।

সেই রাত্রে…১৯৬৩-র ২০শে জুন…ইসার হ্যারেল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সামরিক ইনটেলিজেন্সের প্রধান, জেনারেল মেইর আমিতের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা বলেছিলেন। আজও সেই আলোচনার কথা জেনারেল আমিতের স্পষ্ট মনে আছে ; সেদিন সেই রাশিয়ান-জাত সংগ্রামী পুরুষ, মুখে মুখে যাঁর নাম ছড়িয়ে গিয়েছিলো ইসার-দি-টেরিব্‌ল্‌ বলে, তাঁর মুখকান্তি ক্ষোভে ক্রোধে ভয়ঙ্কর থমথমে হয়ে উঠেছিলো।

'বুঝলে মেইর, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আজ থেকে ইস্রায়েল আর প্রতিশোধের মধ্যে নেই। রাজনৈতিক নেতারা এখন লাগাম নিয়েছেন। আমি পদত্যাগ করেছি এবং সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি অবশ্য বলেছি যে তোমাকে যেন এখন আমার পদটা দেওয়া হয় ; আশা করছি ওঁরা রাজী হবেন।'

রাজী ওঁরা হলেন। জুনের শেষে জেনারেল আমিত কনট্রোলার অফ

ইঁনটেলিজেন্সের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

অবশ্য এই ব্যাপারেই বেন গুরিয়নও আর মোটে কয়েকটা দিন মাত্র টিকলেন। মন্ত্রিসভার উগ্রপন্থীরা লেভি এশকল এবং তাঁরই বৈদেশিক মন্ত্রী গোল্ডা মেইরের নেতৃত্বে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। ২৬শে জুন ১৯৬৩, লেভি এশকল হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাগে দুঃখে তুষারশুভ্র মাথাটা নাড়তে নাড়তে বেন গুরিয়ন চলে গেলেন নেগেভে তাঁর খামার-বাড়িতে। অবশ্য নেসেতের সদস্যপদে তিনি থাকলেন।

নতুন সরকার কিন্তু ইসার হ্যারেলকে তাঁর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন না। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন যে মেইর আমিতের মতো জেনারেল অন্তত গভর্নমেন্টের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে বেশী তর্কাতর্কি করবেন না; কিন্তু হ্যারেল যে ইতিমধ্যেই ইস্রায়েলি জনমানসে উপকথার নায়ক! তার ওপর তাঁর যা মেজাজ!···বেন গুরিয়নের শেষ আদেশও প্রত্যাহৃত হলো না। রকেট-বিজ্ঞানীদের ব্যাপার নিয়ে জার্মানীতে প্রকাশ্য জুলুমবাজি এখনো চলবে না। অতএব উপায়ান্তর না দেখে জেনারেল আমিত ইজিপ্টের অভ্যন্তরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁদের ওপরেই তাঁর বিভীষিকার গোপন অভিযান চালালেন।

ওই বৈজ্ঞানিকেরা থাকতেন নীলনদের উত্তর তীরে, কায়রো শহর থেকে সাত মাইল দক্ষিণে মিয়াদি নামে এক উপনগরে। সুন্দর জায়গা, তবে চারদিকে মিশরীয় সুরক্ষা ফৌজের বেড়াজাল। জার্মান বাসিন্দাগুলো যেন সোনার খাঁচায় বন্দী। সেই বেড়াজাল টপকানোর জন্যে আমিত ইজিপ্টে তাঁর প্রধান চর উলফগ্যাঙ্গ লুটজকে লাগিয়ে দিলেন। রাইডিং স্কুলের মালিক হলেন লুটজ। কিন্তু ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি এত বেশী ঝুঁকি নিতে আরম্ভ করলেন যে ষোলো মাস পরে তাতেই তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেলো।

জার্মান বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। ১৯৬৩-র শরতে জার্মানী থেকে আসতে শুরু করেছিলো একের পর এক বোমা-পার্শেল। মিয়াদিতে মিশরীয় সুরক্ষা ফৌজের কড়া পাহারা সত্ত্বেও তাঁরা কায়রো থেকেই হুমকি দেওয়া চিঠিপত্র পেতে আরম্ভ করলেন, যেগুলোতে

তাঁদের প্রাণনাশের ভয় দেখানো হয়েছে।

ডঃ জোসেফ আইসিগ যে চিঠিটা পেয়েছিলেন তাতে নিখুঁতভাবে তাঁর বউ, ছেলেমেয়ে দুটি এবং তাঁর কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো যে তিনি যেন ইজিপ্ট ছেড়ে অনতিবিলম্বে জার্মানীতে ফিরে যান। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও সবাই ওই ধরনের চিঠি পেলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর একটা চিঠি ডঃ কিরমেয়ারের মুখের সামনে ফাটলো। অনেকের পক্ষেই এটাই হলো শেষ আঁটি। সেপ্টেম্বরের শেষে ডঃ পিলৎস কায়রো ছেড়ে জার্মানী চলে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন হতভাগিনী ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডাকে।

আরো অনেকেই চলে গেলেন। ক্ষুব্ধত্রস্ত মিশরীয়রা আর তাঁদের আটকাতে পারলেন না, কারণ হুমকি দেওয়া চিঠিগুলোর আসা তো তাঁরা বন্ধ করতে পারেননি।

১৯৬৪ সালের শীতের সেই উজ্জ্বল সকালে গাড়িতে গদিতে গা ডুবিয়ে আরোহীটি ভাবছিলেন যে খবরের টুকরোটা তো এসেছে তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধির কাছ থেকে। লুটজকে তো সবাই ভাবে নাৎসী-দরদী বলে; চিঠি এবং পত্রবোমাগুলোও তাঁরই পাঠানো।

তবু রকেট পরিকল্পনা তো বাতিল হয়ে যায়নি। যে খবরটা রাতভোরে এসেছে তাতে তো সে কথাটাই আবার নতুন করে জাহির হলো। সাঙ্কেতিক অক্ষর-মুক্ত খবরটা তিনি আরেকবার নতুন করে পড়লেন। শুধু জানানো হয়েছে যে কায়রো মেডিক্যাল ইনস্টিট্যুটের পরীক্ষাগারে সাংঘাতিক জাতের একটা তেজী বিউবোনিক ব্যাসিলাসকে জীবন্ত অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হয়েছে, এবং সেই বিশেষ বিভাগটির ব্যয়বরাদ্দ দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গত বছরের গ্রীষ্মে ব্যাসেলের বিচারপর্বে ইজিপ্টের বিরুদ্ধে ফলাও প্রচার সত্ত্বেও ইজিপ্ট গণহত্যার এই মারণাস্ত্র বানাতে দৃঢ়সংকল্প।

হফম্যান দেখতে পেলে নিশ্চয়ই মিলারকে তার দুঃসাহসের জন্যে পুরো

নম্বর দিতো। ছাতের অফিস-ঘর থেকে লিফটে করে ছ'তলায় নেমে মিলার চলে এলো পত্রিকার আইন-আদালতের সংবাদদাতা, ম্যাক্স ডর্নের ঘরে।

চেয়ারে বসতে বসতেই বললো, "হফম্যানের ঘর থেকে আসছি এইমাত্র, আমার কিছু পটভূমিকা দরকার। আপনার মগজে একটু খোঁচা মারি?"

"বলুন," ডর্ন ধরে নেয় যে 'কমেট' পত্রিকার হয়েই বোধহয় কোন কাজে নেমেছে মিলার।

"জার্মানীতে যুদ্ধ-অপরাধগুলোর তদন্ত করে কে?"

চমকে ওঠে ডর্ন। "যুদ্ধ-অপরাধ?"

"হ্যাঁ, যুদ্ধ-অপরাধ। যে সব দেশ আমরা যুদ্ধের সময়ে কব্জা করে নিয়েছিলাম, সে সব জায়গায় কি কি ঘটেছিলো, গণহত্যার জন্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা, এইসব কাজের ভার কার ওপর?"

"ওঃ, বুঝেছি। তা এগুলো হলো গিয়ে পশ্চিম-জার্মানীর প্রদেশগুলোর বিভিন্ন অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিসের কাজ।"

"মানে ওরা সকলেই করে?"

চেয়ারে হেলান দিয়ে জুত হয়ে বসলো ডর্ন। নিজের ক্ষেত্র দেখতে পেয়েছে, তাই ভরসা বেড়ে গেলো অনেক।

"পশ্চিম-জার্মানীতে ষোলোটা প্রদেশ আছে, তাদের প্রত্যেকেরই রাজধানীতে একজন করে অ্যাটর্নি-জেনারেল রয়েছে। প্রত্যেকটি অ্যাটর্নি-জেনারেলের দপ্তরে রয়েছে একটা করে বিভাগ যাদের কাজ 'নাৎসী আমলে হিংসাত্মক অপরাধে'র তদন্ত করা। প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীর ওপর প্রাক্তন রাইখের কোন অংশ বা অধিকৃত কোন দেশের ভার দেওয়া আছে।"

"যেমন?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"যেমন ধরুন স্টুটগার্টের ওপর ভার দেওয়া আছে ইতালি, গ্রীস বা পোলিশ গ্যালিসিয়ায় নাৎসী এবং এস.এস.রা যে সমস্ত অপরাধ করেছিলো সেগুলোর।..."

"বাল্টিক রাজ্যগুলোর ভার কার ওপর?"

"হামবুর্গ," ক্ষণমাত্র দেরি হয় না ডর্নের, "তিনটে বাল্টিক রাজ্য, ড্যান-

জিগ এবং পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ অঞ্চলের ভার হাম্বুর্গের ওপর।”

“হাম্বুর্গ!” মিলার যেন আকাশ থেকে পড়লো, “মানে, বলতে চান, এইখানে, এই হাম্বুর্গে?”

“হ্যাঁ। কেন?”

“আমি···মানে, আমার দরকার রিগা।”

ডর্ন মুখ ছুঁচলো করে তোলে।

“ও:! জার্মান ইহুদী?···তা এইখানেই, এখানকার অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিসেই পাবেন।”

“তাহলে রিগাতে যুদ্ধ-অপরাধের জন্যে যদি কারো বিচার হয়ে থাকে বা কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, সে সব এখানেই মানে হাম্বুর্গেই হয়েছে।”

“বিচার এখানেই হবে,” ডর্ন বলে, “গ্রেপ্তার যে কোন জায়গায় হতে পারে।”

“গ্রেপ্তার করার পদ্ধতি কি?”

“হুঁ! একটা বই আছে ফেরারী তালিকার, যেটাতে প্রত্যেকের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো রয়েছে। সাধারণত বছরের পর বছর ধরে অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস থেকে কেস তৈরি করা হয় গ্রেপ্তারের জন্যে। তৈরি হলে পরে লোকটা যে প্রদেশে বাস করছে সেখানকার পুলিসকে অনুরোধ জানানো হয় তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। জনা দুই গোয়েন্দা পাঠানো হয়, তারা গিয়ে লোকটাকে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু মুশকিল হলো বেশীর ভাগ এস.এস.এর লোকেরাই ছদ্মনামে আছে।”

“হুঁ!” মিলার বললো, “আচ্ছা, রিগাতে অপরাধ করবার জন্যে কি হাম্বুর্গে কারো বিচার হয়েছে?”

“মনে করতে পারছি না,” ডর্ন বললো।

“লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে?”

“হুঁ। ১৯৫০ থেকে আমরা কাটিং রাখতে শুরু করেছি; তার মধ্যে হলে পাওয়া যাবে।”

“দেখতে পারি?” মিলার শুধালো।

"নিশ্চয়ই।"

লাইব্রেরি-ঘরটি ভূতলে। ওরা যেতেই প্রধান গ্রন্থাগারিক তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

ডর্ন জিজ্ঞেস করলো মিলারকে, "কি চান আপনি?"

"রশম্যান, এডুয়ার্ড," মিলার বললো।

"পার্শোন্যাল ইনডেক্স সেকশন এদিকে, আসুন," লাইব্রেরিয়ান ওদের নিয়ে গেলো।

বর্ণক্রমে সাজানো কার্ডগুলো দেখে বললো, "নাঃ, রশম্যান নেই।"

একমুহূর্ত ভাবলো মিলার। তারপর বললো, "আচ্ছা, যুদ্ধ-অপরাধের ওপর কিছু আছে?"

"হ্যাঁ," লাইব্রেরিয়ান জানালো, "যুদ্ধ-অপরাধ এবং যুদ্ধ-বিচার। আসুন, ওদিকটায় আছে।"

সারি সারি আলমারির পাশ দিয়ে আরো শতখানেক গজ গেলো তারা। মিলার বলে উঠলো, "রিগার নীচে দেখুন।"

মই বেয়ে উঠে গেলো গ্রন্থাগারিক। কিছুক্ষণ পরেই নেমে এলো লাল মলাট দেওয়া একটা খাতা নিয়ে যার ওপরে লেবেল সাঁটা, 'রিগা—যুদ্ধ-অপরাধের বিচার'। মিলার সেটা খুলতেই খবরের কাগজের দুটো ছোট্ট টুকরো ফুড়ুৎ করে নীচে পড়ে গেলো। কুড়িয়ে তুলে নিয়ে মিলার পড়ে দেখলো যে দুটো বিচারপর্বই ১৯৫০-এ সমাধা হয়ে গেছে। একটাতে তিনজন এস.এস. জওয়ানের বিচার, ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে রিগাতে অনুষ্ঠিত বর্বরতার জন্যে। আরেকটিতে ওই তিনজনের বিরুদ্ধেই দীর্ঘ-মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। ১৯৬৩-র শেষদিকে অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেছে তারা, কি আর এমন দীর্ঘমেয়াদ!

"বাস্?" মিলার বললো।

"হুঁ, আর কিছু নেই," লাইব্রেরিয়ান জানালো।

ডর্নের দিকে ফিরে মিলার বললো, "মানে বলতে চান যে স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস পনেরো বছর ধরে আমার ট্যাক্সের টাকা খেয়ে খেয়ে শুধু এটুকুই কাজ করেছে?"

প্রশাসনিক কায়দায় গম্ভীর চালে ডর্ন বললো, "যথাসাধ্য করছে তারা।"

"সন্দেহ হচ্ছে।"

তুটো তলা ওপরে উঠে বিদায় নিয়ে মিলার রাস্তায় পা বাড়ালো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ছয়

হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি-জেনারেল অফিসে বিভাগীয় বড়কর্তার দেখা পেতেই সাতদিন লেগে গেলো। মিলারের সন্দেহ হলো যে ডর্ন বোধহয় টের পেয়ে গেছে যে সে হফম্যানের হয়ে কাজ করছে না, তাই দিয়েছে এদের টিপে।

কর্তাটিকে দেখালো যেন কেমন অস্বচ্ছন্দ, পালাই-পালাই ভাব।

"দেখুন," শুরু করলেন তিনি, "আপনার সঙ্গে আমি দেখা করছি নেহাৎ আপনি জেদ ধরেছিলেন তাই—"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ মশাই," মিলারের কণ্ঠস্বরে কিন্তু একটুও কৃতজ্ঞতা ফুটলো না। "আমি এমন একজন লোকের খোঁজ করছি যার সম্বন্ধে আমার ধারণা, আপনাদের তরফ থেকে অনুসন্ধান হয়তো হয়েছে ; লোকটির নাম এডুয়ার্ড রশম্যান।"

"রশম্যান ?" উকিল ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, রশম্যান," মিলার বললো, "১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ অব্দি রিগা ঘেটোর এস.এস. কম্যানড্যান্টের ক্যাপ্টেন। আমি জানতে চাই যে সে বেঁচে আছে কিনা। না থাকলে কোথায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছিলো। আপনারা তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা, কোনদিন সে গ্রেপ্তার হয়েছিলো কি, বা বিচার হয়েছিলো তার ? না হলে, এখন সে কোথায় ?"

ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন তিনি। বললেন, "ওরে বাবা, এসব আমি কি করে বলবো ?"

"কেন বলবেন না? বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণ খুবই আগ্রহী। প্রচণ্ড-

রকম আগ্রহ।"

ততক্ষণে উকিলটি তাঁর ভারসাম্য ফিরে পেয়েছেন। "না, না কি যে বলেন! হলে আমি জানতাম না! অনবরত লোকে খোঁজ করতে আসতো। আমার যদ্দূর মনে হচ্ছে আপনারটাই প্রথম···মানে কোন সাধারণ মানুষ···"

"আসলে আমি কিন্তু প্রেসের সদস্য," মিলার যোগ করে দিলো।

"তা হলেই বা! এই সব ব্যাপারে জনসাধারণকে যতটুকু খবর দেওয়া যায় তার চেয়ে বেশী আপনাদের দেওয়া যায় না।"

"কতটুকু সেটা?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"দেখুন, অনুসন্ধানের বর্তমান অবস্থা কি অর্থাৎ কতটা এগিয়েছে বা না এগিয়েছে, সে সব খবর দেওয়ার এক্তিয়ার আমাদের নেই।"

"বড় অদ্ভুত কথা বলছেন তো!"

"আহা, দেখুন হের মিলার, ক্রিমিন্যাল কেসে কি পুলিস তাদের তদন্তের অগ্রগতি আপনাদের জানায়?"

"জানায় বইকি। পুলিস তো আমাদের রীতিমতো বুলেটিন ধরিয়ে দেয়; কত শীগগির গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, তাদের কিরকম প্রত্যাশা, সব জানিয়ে দেয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তারা নিশ্চয়ই বলবে যে তাদের খবর অনুযায়ী সন্দেহজনক ব্যক্তি জীবিত না মৃত। এতে তাদের জনসংযোগ ভালো হয়।"

কর্তাটি মুখে একটু দেখন-হাসি ফুটিয়ে তুললেন। "হ্যাঁ, সে হিসাবে আপনারা অবশ্য চমৎকার কাজ করেন। তবে আমাদের এই বিভাগের নিয়ম অনুসারে অনুসন্ধানের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরা একটি কথাও বলতে পারবো না।" হঠাৎ একটা ভালো ওকালতি প্যাঁচ যেন পেয়ে গেছেন, এইরকম ভাবে বলে ওঠেন, "দেখুন, ফেরারী আসামী একবার যদি জানতে পারে যে আমরা কদ্দূর এগিয়েছি তাহলে তো উধাও হয়ে যাবে।"

"হতে পারে," মিলার সমানে জবাব দেয়, "কিন্তু নথীপত্রে দেখা যায় যে আপনারা রিগার তিনজন রক্ষীরই শুধু বিচার চালিয়েছিলেন। আর সেটাও ১৯৫০-এ, অর্থাৎ ব্রিটিশরাই হয়তো তাদের বিচারের অপেক্ষায়

জেলে রেখে দিয়েছিলো, তারপর আপনাদের বিভাগকে সঁপে দিয়ে চলে যায়। তাহলে ফেরারী অপরাধীদের উধাও হয়ে যাবার বিশেষ কোন আশঙ্কা আছে কি ?"

"অ্যাঁ ? এইরকম মন্তব্য করাটা আপনার বড়ই অনুচিত।"

"বেশ। আপনাদের অনুসন্ধান না হয় এগিয়েই গেলো। তবু এডুয়ার্ড রশম্যানের তদন্ত আপনারা করছেন কিনা বা বেঁচে থাকলে সে এখন কোথায় আছে, সে খবর দিলে তো আপনাদের অনুসন্ধানের কোন ক্ষতি হবে না।"

"আমি আপনাকে শুধু বলতে পারি যে আমার বিভাগের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সদাসর্বদা অনুসন্ধান করে থাকি। তাহলে, হের মিলার, আর আমার কিছু বলার নেই।"

বলেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে মিলারও।

যেতে যেতে মিলার টিপ্পনি কেটে গেলো, "দেখবেন, বেশী সাহস দেখাতে গিয়ে আবার দমটম বন্ধ না হয়ে যায়।"

আরো সপ্তাহখানেক লেগে গেলো অনুসন্ধানের পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করতে। সেই কটা দিন বাড়িতে বসে বসে মিলার ছটা মোটা বই পড়ে শেষ করে ফেললো···পূর্বরণাঙ্গনে যুদ্ধের ইতিহাস, অধিকৃত পূর্ব-অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন ক্যাম্পের কাহিনী, ইত্যাদি। স্থানীয় পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান ওকে একদিন গল্পচ্ছলে জেড কমিশনের নাম বললো।

"ওটা লুডউইগস্‌বুর্গে আছে। একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম আমি। পুরো নাম 'নাৎসী শাসনকালে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক অপরাধসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকরণের জন্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান'। মস্তবড় নাম, তাই লোকে ছোট করে জার্মানে বলে জেনট্রেল স্টেল। আরো ছোট করে, জেড-কমিশন। ওরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা দেশব্যাপী অথবা কখনো কখনো বিদেশে নাৎসীদের অনুসন্ধান করে বেড়ায়।"

"ধন্যবাদ," উঠতে উঠতে মিলার বলেছিলো, "দেখি, ওরা কিছু সাহায্য করতে পারে কিনা।"

পরদিন সকালে মিলার তার ব্যাঙ্কে গেলো। বাড়িওলার নামে জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসের ভাড়ার চেক লিখে বাকি টাকা তুলে ফেললো। শুধু অ্যাকাউন্ট খোলা রাখবার জন্যে যেটুকু টাকা রাখার দরকার সেটুকুই রেখে দিলো।

ক্লাবে কাজে যাওয়ার আগে মিলারের কাছ থেকে সিগি পেলো একটা সস্নেহ চুম্বন আর সাদামাটা কয়েকটা কথা, 'আমি বাইরে যাচ্ছি হপ্তা-খানেকের জন্যে, দেরিও হতে পারে।' তারপর ভূতলগ্যারেজ থেকে জাগুয়ার বের করে মিলার চললো দক্ষিণমুখো, রাইনল্যাণ্ডের দিকে।

তুষারপাত সবে শুরু হয়েছে। উত্তর সাগরের দিক থেকে হিমবাত্যা আসছে, তীক্ষ্ণ শিসের মতো আওয়াজ তুলে। ব্রেমেনের দক্ষিণে মহাসড়কের ওপর জায়গায় জায়গায় তুষার জমিয়ে তুষারবৃষ্টিটি নিম্নস্যাক্সনির সমতল-খণ্ডের দিকে চলেছে প্রচণ্ড বেগে।

দু ঘণ্টা পর একবার থামলো মিলার, কফির জন্যে। তারপর আবার চললো উত্তর রাইন ওয়েস্টফ্যালিয়ার ভেতর দিয়ে। বাতাসের বেগ সত্ত্বেও গাড়ি চালাতে বেশ লাগে, আবহাওয়া যতই খারাপ হোক। এক্স. কে. ১৫০-এস. মডেলের গাড়িটার ভেতরে ওর মনে হয় ও যেন একটা ধাবমান বিমানের ককপিটে বসে রয়েছে। সামনে জ্বলছে ড্যাশবোর্ডের নিষ্প্রভ আলো আর বাইরে শীতরাত্রের ক্রমঘনীভূত অন্ধকার, হিমঠাণ্ডা, হেড-লাইটের আলোতে ঝলকে ঝলকে উঠছে বাঁকারেখায় নেমে আসা নরম তুষারকণা, উইণ্ডস্ক্রিনে লেগে সেগুলো শূন্যতায় মিলে যাচ্ছে।

অভ্যস্ত রীতিতেই চললো সে, তেমনি বেগে। ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল। হুস হুস শব্দে বিশাল লরিগুলোর পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে চললো।

ছটা নাগাদ হ্যাম জংসন পেরিয়ে এলো। অন্ধকারের মধ্যে দূরে দেখা যায় রুঢ়ের আলোর ছটা। শিল্পসমৃদ্ধ এই অঞ্চল দেখে ও এখনো অবাক হয়; মাইলের পর মাইল শুধু কারখানা, চিমনি, ফারনেসের ঝলসে ওঠা আগুন আর আলোর মালা। কি অদ্ভুত শিল্পবৈভব! চোদ্দ বছর আগে যখন ইস্কুল থেকে যাচ্ছিলো পারীতে তখন শুধু ছিলো খাঁ খাঁ পাথর আর

রুক্ষ প্রান্তর। গর্ব হয় বৈকি; অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে তার দেশের মানুষেরা ভোজবাজি করে ফেলেছে।

হেডলাইটের সামনে চলে এলো কলোন রিঙের বিরাট নিওন বিজ্ঞাপন। সেখান থেকে চললো দক্ষিণ-পূর্ব দিক ধরে। উইসব্যাডেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ম্যানহাইম, হাইলব্রন একের পর এক চলে গেলো।

অবশেষে এসে পৌঁছলো স্টুটগার্ট শহরে একটা হোটেলের সামনে। লুডউইগস্‌বুর্গের নিকটতম শহর। গাড়ি থামিয়ে হোটেলে উঠলো রাত কাটাবার জন্যে।

লুডউইগস্‌বুর্গ একটা ছোট্ট নিরিবিলি শান্ত শহর। প্রদেশের রাজধানী স্টুটগার্ট থেকে পনেরো মাইল উত্তরে, উরটেমবার্গের মনোরম ঢালু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। বড়-সড়ক থেকে খানিকটা ভেতরে জেড-কমিশনের অফিসবাড়ি; শহরের সরল সাদাসিধে বাসিন্দাদের চোখে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থিতিই যেন লজ্জাকর। কমিশনের কর্মীসংখ্যা স্বল্প, মাইনেপত্তরও ভালো না, অথচ কাজ প্রচুর। যুদ্ধের সময় যেসব নাৎসী বা এস.এস. গণহত্যার অপরাধে অপরাধী তাদের খুঁজে বের করাই এদের কাজ। কাজই শুধু নয়, জীবনের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। স্টাট্যুট অফ লিমিটেশন পাস হয়ে যাওয়ার পর হত্যা এবং গণহত্যা ছাড়া এস.এস.দের অন্য সব অপরাধ আইনের চক্ষে বাতিল হয়ে গেছে, নইলে তার আগে এরা অন্য অপরাধে অপরাধী এস.এস.দেরও খুঁজে বেড়াতো, যথা বলপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়, ডাকাতি, দৈহিক পীড়ন ইত্যাদি।

হত্যা-অপরাধে অপরাধীর সংখ্যাও এদের খাতায় ১,৭০,০০০, যাদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতএব এদের বর্তমান লক্ষ্য ওই তালিকার ভেতর থেকে অন্তত কয়েক হাজার গণঘাতককে—যেখানে হোক, যখনই হোক—খুঁজে বের করা।

গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা নেই, কাজেই যখন কাউকে এরা অকাট্যভাবে সনাক্ত করে ফেলে তখন জার্মানীর বিভিন্ন প্রদেশের পুলিসের কাছে যেতে হয় অনুরোধের পত্র নিয়ে। বনের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যৎসামান্য

বার্ষিক ভাতা পায়। কিছুই হয় না তাতে, তবু কাজ করে যায়, কারণ এই কাজেই তারা উৎসর্গীকৃত।

কর্মীদের ভেতরে আছে আশীজন গোয়েন্দা এবং পঞ্চাশজন অনুসন্ধানী অ্যাটর্নি। গোয়েন্দাদের মধ্যে সবাই যুবক, পঁয়ত্রিশের নীচে বয়স, সেই-জন্যে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারুর পক্ষেই ওই সব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকা সম্ভব নয়। উকিলেরা অবশ্য একটু বয়স্ক, তাই তাদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে তবে নেওয়া হয়েছে যে তারা ১৯৪৫-এর পূর্বে ওইসব ঘটনায় বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ করেনি।

উকিলেরা অধিকাংশই এসেছে তাদের নিজস্ব ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে, যেখানে আবার তারা একদিন ফিরে যাবে। গোয়েন্দারা ভালোভাবেই জানে যে তাদের আর কিচ্ছু হবে না জীবনে। জার্মানীর কোন পুলিস ফৌজ লুডউইগস্‌বুর্গের কোন প্রাক্তন গোয়েন্দাকে চাকরি দেবে না। পশ্চিম জার্মানীতে যে সব পুলিসী গোয়েন্দা এস.এস.দের অনুসন্ধান করে বেড়ায় তাদেরও পদোন্নতি চিরদিনের জন্যে বন্ধ।

বহু প্রদেশেই সহযোগিতার আবেদনে কেউ কর্ণপাতও করছে না, ফাইলপত্র ধার দিলে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কারো কাছ থেকে খবর পেয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো, এসব তো জেড-কমিশনের নিত্য-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা। তবু কর্তব্য হিসাবে কাজ করে যায় এরা, যদিও ভালোভাবেই জানে যে দেশবাসীর সমর্থন নেই।

লুডউইগস্‌বুর্গের মতো হাসিখুশী শহরেও রাস্তায় জেড-কমিশনের লোক দেখলে কেউ ডেকে দুটো কথাও বলে না, নমস্কারও জানায় না। বরং পথচারীরা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, ওদের জন্যেই যেন তাদের শহরের এত বদনাম।

পিটার মিলার কমিশনের অফিস-বাড়িতে এসে পৌঁছুলো। ৫৮ নং শর্নডরফার স্ট্রাস, মস্তবড় একটা পুরনো বাড়ি, চারদিকে আট ফুট উঁচু প্রাচীর। বিরাট বিরাট দুটো ভারী লোহার ফটক। ফটক বন্ধ থাকায় গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলো না। গেটের একটা পাশে ছিলো ঘন্টির হাতল। সেটা ধরে টানতেই লোহার পাল্লায় সামান্য ফাঁক হয়ে গিয়ে

একটা মুখ বেরিয়ে এলো। নিঃসন্দেহে দ্বাররক্ষী।

"বলুন ?"

"অনুসন্ধানী উকিলদের কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই," মিলার বললো।

"কার সঙ্গে ?"

"নামটাম জানি না। যে কোন একজন হলেই হবে," মিলার বললো, "এই যে আমার কার্ড।"

ফোকরের ভেতর দিয়ে কার্ডটা গুঁজে দিলো, যাতে লোকটা বাধ্য হয় সেটা নিতে। অন্তত তাহলে নিশ্চিন্ত যে সেটা দালানের ভেতরে গিয়ে পৌঁছুবে। ফোকর বন্ধ করে দিয়ে লোকটা চলে গেলো। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে গেট খুলে দিলো। পাথরে বাঁধানো পাঁচটা সিঁড়ি চড়ে মিলার পৌঁছুলো সামনের দরজায়। সেঁটে বন্ধ, বাইরের হিমবাতাস যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে। ঘরের মধ্যে সেন্ট্রাল হিটিঙের কল্যাণে বদ্ধ গরম। ডান-দিকের কাঁচ-বসানো বুথ থেকে একজন চাপরাশী বেরিয়ে এসে তাকে ছোট্ট একটা বিশ্রামকক্ষ দেখিয়ে দিলো।

"বসুন এখানে। এখুনি আসছেন একজন।" দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে চলে গেলো।

তিন মিনিট পরে যে এলো পঞ্চাশের কোঠায় তার বয়স, মৃদুভাষী, বেশ ভদ্র। মিলারের কার্ডটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "বলুন, কি করতে পারি ?"

গোড়া থেকে শুরু করলো মিলার। টউবেরের ঘটনা বললো, ডায়রির কথা, এডুয়ার্ড রশম্যান সম্বন্ধে তার নিজের অনুসন্ধান, সব জানালো। উকিলটি পরম আগ্রহে শোনে।

শেষ হলে বলে, "চমৎকার।"

"কথা হলো, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?"

"পারলে খুশী হতাম," লোকটি বললো।

তিন সপ্তাহ আগে হাম্বুর্গে যখন রশম্যান সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো তারপর এই প্রথম, মিলারের মনে হলো, এমন একজনের

আছে।" মিলার সোজাসুজি বললো, কোনরকম না রেখে-ঢেকে।

"এখানে মূল্যবান কিছু এলে তাতে ধুলো জমতে আমরা দিই না।"

"বুঝলাম," মিলার উঠলো। "আচ্ছা, এডুয়ার্ড রশম্যানকে কি আপনার এখনো খুঁজছেন? গোপনেই বলুন, কথাটা শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই থাকবে।"

"আমাদের দুজনের মধ্যে বলতে গেলে···হ্যাঁ, ভীষণভাবে খুঁজছি।"

"ধরা যদি পড়ে তো দণ্ড পেতে অসুবিধা নেই তো?"

"কিছুমাত্র না, তার বিরুদ্ধে পাকা কেস। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড নির্ঘাত।"

"বেশ," মিলার বললো, "আপনার ফোন নম্বরটা দিন তো।"

আইনজীবীটি একটুকরো কাগজের ওপরে লিখে মিলারকে দিলো। "এই হলো আমার নাম, আর দুটো টেলিফোন নম্বর। বাড়ির এবং অফিসের। সব সময় আমাকে পাবেন, দিনেরাত্রে যখনই হোক। নতুন কিছু পেলে আমাকে জানাবেন। প্রত্যেকটা প্রদেশে কিছু কিছু পুলিসের লোককে আমি জানি, যাদের বললে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আবার কিছু কিছু লোক আছে যাদের এড়িয়ে থাকতে হয়। সুতরাং আমাকেই আগে জানাবেন, কেমন?"

মিলার কাগজটা পকেটে পুরলো।

যেতে যেতে বললো, "মনে থাকবে।"

"বেশ, সৌভাগ্য কামনা করছি," আইনজীবী জানালো।

স্টুটগার্ট থেকে বার্লিন অনেকটা দূরের পথ। পরের দিনটা প্রা রাস্তাতেই কাটলো মিলারের। সৌভাগ্যবশত আবহাওয়া ভালো ছিলো শুকনো খটখটে দিন। অদম্যগতিতে চললো জাগুয়ার, মাইলের পর মাই উধাও প্রান্তর। ফ্রাঙ্কফুর্ট, ক্যাসেল, গটিঙ্গেন পেরিয়ে হ্যানোভার পৌঁছলো এইখানে এসে ই-৪নং মহাসড়ক ছেড়ে ই-৮ ধরলো মিলার, পূর্ব-জার্মানী সীমান্তের দিকে।

ম্যারিয়েনবর্ন চেকপয়েন্টে এক ঘণ্টা লেগে গেলো। মুদ্রা ঘোষণা ক

কাগজ ভরো, ট্র্যান্জিট ভিসার দরখাস্ত দাও ; পশ্চিম বার্লিন পৌঁছতে হলে পূর্ব-জার্মানীর ভেতর দিয়ে ১১০ মাইল যেতে হবে যে। নীল পোশাক-পরা শুল্ক-দারোগা আর সবুজ উর্দিওলা লোমের টুপি মাথায় জনতার পুলিস তার জাগুয়ারের তলা-ওপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।

সীমান্তের কুড়ি মাইল ভেতরে চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে এলো এল্‌বের ওপরে বিরাট সেতু। এখানেই, ১৯৪৫ সালে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুসরণ করে ব্রিটিশবাহিনী তাদের বার্লিন অভিমুখে অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিলো। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলো মিলার—বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ম্যাগডেবুর্গের জনবসতি। মনে মনে ভাবে, পুরনো কারাগারটা কি এখনো আছে ? পশ্চিম-বার্লিনে ঢুকতে আবার দেরি হলো। আবার গাড়ি সার্চ করা হলো, ব্যাগ থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখা হলো শুল্কচৌকিতে। মনিব্যাগ খুলে দেখলো, শ্রমিকদের স্বর্গরাজ্যে দান করে আসেনি তো ! সব শেষ হয়ে গেলে আবার জাগুয়ারটা চললো রাস্তা গমগমিয়ে। আভুস সারকিট পেরিয়ে ধেয়ে গেলো আলো-ঝলমল কুরফুরস্টেণ্ড্যামের রুপোলী ফিতের মতো চকচকে রাস্তার দিকে। আলোয় আলোয় বাহারি সাজ, ক্রিস্টমাসের সূচনা। ১৭ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যা নামলো।

মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে আর হুট করে যাওয়া নয়, যেমন গিয়েছিলো হাম্বুর্গে অ্যাটর্নি-জেনারেলের দপ্তরে বা লুডউইগস্‌বুর্গে জেড-কমিশনের অফিসে। বেশ বুঝতে পেরেছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে জার্মানীতে কেউই নাৎসীদের ফাইলের ধারে-কাছেও যেতে পারে না।

পরদিন সকালে বড় ডাকঘর থেকে ব্রাণ্ডটকে দূরপাল্লার ফোন করলো। ব্রাণ্ডট তো শুনে অবাক, স্তম্ভিত।

"না না, আমি পারবো না," ফোনের মধ্যেও যেন চমকে ওঠে সে, "বার্লিনে আমি কাউকে চিনি না।"

মিলার দমবার পাত্র নয়। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলো, "ভালো করে ভেবে দেখ্। তোদের পুলিসের কলেজটলেজে পশ্চিম-বার্লিনের কারো না কারো সঙ্গে নিশ্চয়ই তোর দেখা হয়েছে। আমি শুধু চাই যে আমি যখন ওখানে যাবো, সে যেন আমার হয়ে বলে দেয়।"

"তোকে তো আমি বলেইছি আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাই না।"

"জড়িয়ে তো পড়েছিসই।" কয়েক সেকেণ্ড থেমে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লো মিলার, "হয় আমি সরকারীসূত্রে ওই আর্কাইভে যাবো নইলে বলবো তুই আমাকে পাঠিয়েছিস।"

"না, না, না…"

"না মানে, নিশ্চয়ই বলবো। দেশের এক কোনা থেকে আরেক কোনা আর আমি এমন ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে পারি না। কাজেই খুঁজে দেখ্ কে আমাকে ওখানে সরকারী সূত্রে পাঠাতে পারে। হ্যাঁ, দেখ্, ঘাবড়াস না তুই, ফাইলগুলো দেখা হয়ে গেলে এক ঘণ্টার মধ্যে মৌখিক অনুরোধটার কথা আমরা সকলেই ভুলে যাবো।"

"ভাবতে হবে রে," ব্রাণ্ডট বললো। সময় পাবার জন্যে ওর কারচুপি।

"এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি," মিলার বললো, "তারপর আবার ফোন করবো।"

এক ঘণ্টা পরেও ব্রাণ্ডট ঠিক আগের মতোই রেগে ছিলো, তবে ভয় পেয়েছে বোধহয় একটু। আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিলো তার, কেন ডায়রিটা নিজের কাছে রেখে নষ্ট করে ফেলেনি।

"দেখ্," ফোনের মধ্যে বললো, "একজনকেই চিনি শুধু, আমার সঙ্গে ডিটেকটিভ কলেজে ছিলো। খুব ভালোমতন পরিচয় নেই, পশ্চিম-বার্লিন পুলিস ফৌজের এক নম্বর বিভাগে আছে। ওই বিষয় নিয়েই কাজকর্ম।"

"নাম কি?"

"শিলার। ফোকমার শিলার, ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার।"

"আচ্ছা, দেখা করছি ওর সঙ্গে।"

"না, আমার ওপরে ছেড়ে দে তুই। আমি আজ ওকে ফোন করে তোর কথা জানাচ্ছি। তারপর তুই গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারিস। কিন্তু রাজী যদি না হয় আমি কিচ্ছু করতে পারবো না, বার্লিনে আর কাউকে আমি চিনি না।"

দু ঘণ্টা পরে মিলার আবার ব্রাণ্ডটকে ফোন করলো। ব্রাণ্ডটের গলার স্বর এবার উল্লসিত।

"ও এখন ছুটিতে আছে," বললো সে, "ক্রিস্টমাসের ডিউটি পড়েছে ওর, আমাকে বললো। তাই সোমবারের আগে ফিরছে না।"

"আরে, আজ যে মাত্র বুধবার। চারটে দিন আমাকে শুধু হক্কা মারতে হবে?"

"কি করবো বল্? সোমবার সকালে ও ফিরবে, তখন ফোন করবো।"

চারটে দিন পশ্চিম-বার্লিনের এদিক ওদিক করে মিলার কাটিয়ে দিলো। ভীষণ একঘেয়ে লাগে। অবশ্য ১৯৬৩-র সেই ক্রিস্টমাসে বার্লিনে খুব হৈ-চৈ; এই প্রথমবার প্রাচীরের অপর পার থেকে পূর্ব-জার্মান সরকার পাস ইস্যু করছে যাতে পশ্চিম-বার্লিনের লোকেরা ওপারে গিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারে। নগরের দুই প্রান্তে দুই পক্ষ থেকে সমঝোতা চললো কয়েকদিন ধরে; সংবাদপত্রগুলোর শিরোনামাই ওই। সপ্তাহ-শেষের দিনটায় মিলার হাইন স্ট্রাসের চেকপয়েন্ট পেরিয়ে পুবের নগরে গেলো (পশ্চিম-জার্মানীর নাগরিক হিসাবে তার পাসপোর্টের জোরেই সে ওদিকে যেতে পারে)। পূর্ব-বার্লিনের রয়টার সংবাদদাতা তার মুখচেনা ছিলো, দেখা করলো তার সঙ্গে। কিন্তু লোকটা তখন প্রাচীর-পারাপারের কাহিনী নিয়ে খুব ব্যস্ত। তাই ওর সঙ্গে কফি খেয়ে মিলার পশ্চিমে ফিরে এলো।

সোমবার সকালে গেলো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার ফোকমার শিলারের সঙ্গে দেখা করতে। দেখে ভালো লাগলো যে লোকটা প্রায় তারই বয়সী, এবং জার্মানীর আমলাসুলভ মনোবৃত্তির ছিটেফোঁটাও নেই ওর মধ্যে, লাল ফিতে মানে না। বেশি ওপরে ওকে উঠতে হচ্ছে না, মিলার ভাবলো, কিন্তু সে যাক গে, সেটা ওর সমস্যা। মিলার তো খুশী।

সংক্ষেপে মিলার ওকে বললো যে ও কি চায়।

শুনে শিলার বললো, "কেন নয়? অসুবিধা তো দেখছি না। আমেরিকানরা তো আমাদের এক নম্বর বিভাগের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করে থাকে। প্রায়ই তো ওখানে যাচ্ছি আমরা। উইলি ব্রাণ্ডট আমাদের ওপর নাৎসী অপরাধের তদন্তের ভার চাপিয়েছে, সেই সূত্রেই যাতায়াত।"

মিলারের জাগুয়ারেই চললো ওরা দুজন। শহর ছাড়িয়ে চলে এলো

উপকণ্ঠে, তারপর বনজঙ্গল, হ্রদ পেরিয়ে, কোন একটা হ্রদের তীরে এসে পৌঁছলো—বার্লিন-৩৭ এলাকায় জেলেনডর্ফ শহরতলীতে এক নম্বর, ওয়াসের কাফের স্টিয়েগ।

গাছপালার ভেতরে লম্বা সরু একতলা বিল্ডিং। দেখেই অবিশ্বাসের কণ্ঠে মিলার বললো, "এতটুকুই?"

"হ্যাঁ, এই-ই," শিলার জানালো, "তবে যা ভাবছেন তা নয়। মাটির নীচে আছে আটটা তলা, সেখানেই আর্কাইভ, অগ্নিনিরোধক ভল্টে।"

সম্মুখের দরজা দিয়ে ওরা ঢুকলো। ডানদিকেই দপ্তরীর ঘর। গোয়েন্দাটি এগিয়ে গিয়ে তাকে পুলিস-কার্ড দেখাতেই লোকটা একটা ফর্ম বের করে দিলো। ওরা দুজনে একটা টেবিলে গিয়ে ফর্ম ভরলো। গোয়েন্দা তার নিজের নাম, র‍্যাঙ্ক সব লিখে প্রশ্ন করলো, "কি যেন নাম লোকটার?"

"রশম্যান," মিলার বললো, "এডুয়ার্ড রশম্যান।"

ফর্ম ভরে সামনের অফিসে কেরানীটিকে দিয়ে দিলো।

"দশ মিনিট মতো লাগবে," শিলার জানালো। বড় একটা ঘরে এসে ওরা ঢুকলো। সার সার টেবিল চেয়ার। প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে আরেকজন কেরানী এসে নিঃশব্দে টেবিলের ওপর একটা ফাইল রাখলো, প্রায় ইঞ্চিখানেক মোটা, বিষয়ের স্থানটিতে মোহর মারা, 'রশম্যান, এডুয়ার্ড'।

ফোকমার শিলার উঠে দাঁড়ায়।

"কিছু যদি মনে না করেন আমি চলি। এক সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে এসে এখন আর দেরি করা চলে না। যদি কোন কাগজের ফটোস্ট্যাট কপি চান ওই লোকটাকে বলবেন।" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পাঠঘরের অন্যদিকে, ডায়াসের ওপরে বসে থাকা একটা কেরানীকে। নিশ্চয়ই লোকটা ওখান থেকে লক্ষ্য রাখে কেউ কোন ফাইল থেকে কাগজটাগজ সরাচ্ছে না তো।

মিলার উঠে হাত মেলালো। "অনেক ধন্যবাদ।"

"না, না, কিছুমাত্র না।"

টেবিলে বসে আরো দু-তিনজন লোক তাদের পঠিতব্য ফাইলগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। মিলার তাদের দিকে তাকিয়েও দেখলো

না। একমনে পড়ে গেলো শুধু এডুয়ার্ড রশম্যানের ওপর লিখিত এস.-এস.এর নিজস্ব খতিয়ান।

সব কিছু ছিলো ফাইলে। নাৎসী পার্টি নম্বর, এস.এস. নম্বর, এই ছুটোর জন্যে তার স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত, ডাক্তারি পরীক্ষার ফল, প্রশিক্ষণ শেষে তার শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য, নিজের হাতে লেখা তার নিজের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, বদলির হুকুমনামা, অফিসার পদে নিয়োগপত্র, পদোন্নতির সার্টিফিকেট, ১৯৪৫-এর এপ্রিল অব্দি। ছুটো ছবিও ছিলো, এস.এস.এর পঞ্জীয়নের জন্যে ; একটা পুরো মুখের, আরেকটা পাশ থেকে। তা থেকে দেখা গেলো ছ'ফিট এক ইঞ্চি লম্বা একটা মানুষ, ছোট করে ছাঁটা চুল, বাঁদিকে সোজা সিঁথি, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে গম্ভীর মুখ করে, লম্বা তিরতিরে নাক আর ঠোঁটবিহীন ফাঁক যার নাম মুখ। মিলার পড়তে আরম্ভ করলো···

এডুয়ার্ড রশম্যানের জন্ম ২৫শে আগস্ট ১৯০৮, অস্ট্রিয়ান শহর গ্রাৎসে ; অস্ট্রিয়ার নাগরিক ; পিতা বিয়ার কারখানার শ্রমিক, সৎ এবং সম্মানিত। গ্রাৎসেই সে কিণ্ডারগার্টেন, জুনিয়ার এবং হাইস্কুলের পাঠ শেষ করেছিলো। কলেজে ভর্তি হয়েছিলো উকিল হবার জন্যে কিন্তু ফেল করেছিলো। ১৯৩১ সালে তেইশ বছর বয়সে বাবা যে কারখানায় কাজ করতো সেখানেই চাকরিতে ঢোকে। ১৯৩৭-এ কারখানার মেঝে থেকে বিয়ার কোম্পানির প্রশাসনিক বিভাগে বদলি হয়। সেই বছরেই অস্ট্রিয়ান নাৎসী পার্টি এবং এস.এস.এ যোগ দেয়, ছুটোই যখন নিরপেক্ষ অস্ট্রিয়ায় নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত ছিলো। এক বছর পরে হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার করে অস্ট্রিয়ান নাৎসীদের চারদিকে উঁচু উঁচু পদে উন্নীত করেন।

১৯৩৯-এ যুদ্ধ লাগলে স্বেচ্ছায় ওয়াফেন-এস.এস.এ যোগ দেয় : জার্মানীতে পাঠানো হয় তাকে, ১৯৩৯-এর শীতকাল ও ১৯৪০-এর বসন্তকাল ট্রেনিঙে কেটে যায় ; ফ্রান্স অভিযানে সহগামী ওয়াফেন-এস.এস ইউনিটের সদস্য হয়ে যায়। ডিসেম্বর ১৯৪০-এ ফ্রান্স থেকে আবার বার্লিনে বদলি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—এইখানটায় মার্জিনে কেউ লিখে রেখেছে : 'কাপুরুষতা ?'—১৯৪১-এর জানুয়ারিতে এস.ডি.তে কর্মভার দেওয়া হয়,

আর. এস. এইচ.এর তিন নম্বর বিভাগে।

১৯৪১-এর জুলাইয়ে রিগাতে প্রথম এস.ডি.এর শাখা স্থাপনা করে, পরের মাসে রিগা ঘেটোর কম্যাণ্ডাণ্ট নিযুক্ত হয়। ১৯৪৪-এর অক্টোবরে অবশিষ্ট ইহুদীগুলোকে ড্যানজিগের এস.ডি.কে সমর্পণ করে জাহাজে করে জার্মানীতে ফিরে আসে। বার্লিনে এসে রিপোর্ট করে। তারপর থেকে এস.এস.এর বার্লিন হেডকোয়ার্টারের অফিসেই কাজ নিয়ে থাকে পরবর্তী নিয়োগের অপেক্ষায়।

এস.এস. ফাইলের শেষ পৃষ্ঠা অসমাপ্ত। বোধহয় ১৯৪৫-এর মে মাসে বার্লিন এস.এস. হেডকোয়ার্টারের কেরানীটি তাড়াতাড়ি নিজের পুন-র্নিয়োগ করে নিয়েছিলো।

ফাইলের শেষে অন্য একটা কাগজ আটকানো। সম্ভবত যুদ্ধের শেষে আমেরিকানদের সংযোজনা। একটিমাত্র পৃষ্ঠায় টাইপে শুধু কটি কথা লেখাঃ

'ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ এই ফাইল সম্বন্ধে ব্রিটিশ অধিকারী কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করেছিলেন।'

নীচে কোন জি.আই. কেরানীর দস্তখত, তারিখ ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭।

মিলার ফাইল থেকে স্বলিখিত আত্মকাহিনী, ছবি দুটো এবং শেষ পৃষ্ঠাটা খুলে নিয়ে ঘরের ওই কোনায় কেরানীটির কাছে এগিয়ে গেলো।

"এগুলোর ফটো-কপি পেতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়ই।" লোকটা ফাইল ফেরত নিয়ে তার সামনে একটা ট্রেতে রেখে দিলো, মূল কাগজগুলো কপি হয়ে ফিরে এলে ফাইল সম্পূর্ণ করে দেওয়ার অপেক্ষায়। আরেকটা লোকও একটা ফাইল এবং দুটো কাগজ দিলো কপির জন্যে। কপি করবার জন্যে সব কাগজগুলোকে একটা ট্রেতে রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অদেখা হাত সেগুলো নিয়ে গেলো।

"অপেক্ষা করুন একটু, মিনিট দশেক লাগবে," কেরানীটি জানালো। ওরা দুজনে ফিরে গিয়ে আবার টেবিলে বসলো। মিলারের সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু উপায় নেই, ধূমপান নিষেধ। অন্য লোকটা তার সুছাঁদ কালচে ধূসর স্যুটে খুব পরিচ্ছন্নভাবে বসে রইলো, কোলের ওপর দুটো হাত গুঁজে।

দশ মিনিট পরে কেরানীটির পেছনে খসখস আওয়াজ হলো। ফুটোর ভেতর দিয়ে ছুটো খাম বেরুলো। সে ছুটোকে তুলে ধরতেই মিলার এবং ওই লোকটি ছুজনেই তার কাছে গিয়ে হাজির। কেরানীটি একটি খামে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "এডুয়ার্ড রশম্যানের ফাইল ?"

"আমার," বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো মিলার।

"তাহলে এটা আপনার," অন্য খামটা দ্বিতীয় লোকটাকে ধরিয়ে দিলো কেরানী। দরজা পর্যন্ত ওরা ছুজনে পাশাপাশি এলো। বাইরে এসে এক-ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে জাগুয়ারে চড়লো মিলার। শহরের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

একঘণ্টা পর সিগিকে টেলিফোন করলো। "ক্রিস্টমাসে বাড়ি আসছি।"

ছু ঘণ্টা পরে পশ্চিম-বার্লিন থেকে বেরুনোর পথে ড্রেই লিণ্ডেন চেক-পোস্টে ওর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ততক্ষণে ধূসর কোট পরা লোকটা তার স্যাভিনি প্লাৎসের ছিমছাম ফ্ল্যাট থেকে পশ্চিম-জার্মানীর কোন একটা শহরে টেলিফোন করলো। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললো, "আমি আজ ডকুমেণ্ট সেণ্টারে গিয়েছিলাম। জানেনই তো, একটু-আধটু গবেষণা করি, সেই কাজে। ওখানে দেখলাম একটা লোক এডুয়ার্ড রশম্যানের ফাইল পড়ছে। তারপর সে তিনটে কাগজের ফটো-প্রতিলিপি নিলো। সম্প্রতি যে নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে তাইতে ভাবলাম আপ-নাকে ঘটনাটা জানানো উচিত।"

অন্যতরফ থেকে বহু প্রশ্ন হলো।

"নাঃ, নাম জানতে পারিনি। লম্বা একটা কালো স্পোর্টস গাড়ি করে চলে গেলো।...হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়েছি। হাম্বুর্গের নম্বর-প্লেট। নম্বর হলো..."

ধীরে ধীরে সংখ্যাগুলো বলে গেলো। ওদিকের লোকটা লিখে নিলো।

"হ্যাঁ, ভাবলাম দেখে রাখা উচিত। কখন কি হয়, কিছু বলা যায় না, চারদিকে কত টিকটিকি।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ...দয়া আপনার...বেশ, আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম।...শুভ ক্রিস্টমাস, কামেরাড।"

সাত

ক্রিস্টমাস ছিলো বুধবারে। পর্ব মিটে না যাওয়া পর্যন্ত পশ্চিম-জার্মানীর লোকটা বার্লিন থেকে পাওয়া মিলারের সংবাদ কাউকে জানায়নি। তার-পর খবরটা সে দিলো তার খোদ কর্তাকে।

টেলিফোনে খবরটা শুনে সংবাদদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তাব্যক্তিটি তার চামড়া-মোড়া এক্সিকিউটিভ চেয়ারে আয়েস করে বসলো। জানলার বাইরে দৃষ্টি চালিয়ে দেখে পুরনো শহরের বাড়ির ছাতগুলো তুষারে ভরে গেছে।

বিড়বিড় করে ওঠে, "ইস্, কি বিশ্রী ব্যাপার! এখন কেন? অ্যাদ্দিন গেলো, কিচ্ছু হলো না···এখন···ইস্!"

শহরের সবাই জানে যে লোকটি বেশ কৃতী আইনজীবী, গণ্যমান্য ব্যক্তি। আবার পশ্চিম-জার্মানী এবং পশ্চিম-বার্লিনে তার যত এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে, তাদের কাছে তার পরিচয় জার্মানীতে ওডেসা সংগঠনের এক নম্বর ব্যক্তি বলে,—জার্মান-শাখার মহানির্দেশক। তার টেলিফোন নম্বর ডিরেক্টরিতে থাকে না, সাংকেতিক নাম 'ওয়েরউলফ'।

জার্মান ওয়েরউলফ কিন্তু সিনেমা বা গল্পগাথার দানব নয়, পূর্ণিমা রাত্রে যার হাতে এবং পিঠে লোম গজায়; বরং জার্মানিক পুরাকাহিনী অনুসারে আক্রমণকারী বৈদেশিক সৈন্যের দাপটে যখন টিউটনিক সমরনায়করা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো তখন দেশপ্রেমী ওয়েরউলফ দেশেই রয়ে গেলো, প্রতিরোধ গড়ে তুললো ঘন বনজঙ্গলের ভেতর থেকে। চুপিচুপি রাত্রে এসে বিদেশীদের আক্রমণ করে পালিয়ে যেতো, রেখে যেতো শুধু তুষারের ওপর নেকড়ের থাবার চিহ্ন।

যুদ্ধের পর একদল এস.এস. অফিসার কিছু উগ্রপন্থী কিশোর এবং তরুণদের ধ্বংসাত্মক কাজে দীক্ষিত করে তুললো মিত্রশক্তির ওপর হামলা করবার জন্যে। মনে মনে ওদের বিশ্বাস ছিলো যে আক্রমণকারী মিত্রশক্তি-

দের ধ্বংস করা শুধু কিছু সময়ের ওয়াস্তা। ব্যাভেরিয়ায় ওরা ঘাঁটি গাড়লো, আমেরিকানদের অধীনে ছিলো তখন সেই অঞ্চল। ওরাই হলো মূল ওয়েরউলভস। ভাগ্য ভালো যে কিছু করেনি ওরা, নইলে ডাচাউ-এর ঘটনার পর জি.আই.রা অপেক্ষা করছিলো শুধু, কেউ কিছু শুরু করলেই হতো।

ওডেসা যখন চল্লিশ দশকের শেষে পশ্চিম-জার্মানীতে আবার অনুপ্রবেশ করছিলো, তখন তাদের মহানির্দেশক পদে যে প্রথম বসেছিলো সে ছিলো ১৯৪৫-এর তরুণ ওয়েরউলভসদের অন্যতম শিক্ষক। উপাধিটি সেই-ই নিয়েছিলো। সুবিধা হচ্ছে যে এতে একদিকে যেমন বেনামা থাকা যায়, তেমনি অন্যদিকে নামটা বেশ রূপক এবং নাট্য-অনুরাগী জার্মান-মানসে যথেষ্ট মনোগ্রাহী।

১৯৬৩-র শেষে যে ওয়েরউলফ হলো সে এই পদে অনুষ্ঠিত তৃতীয়জন যেমন কঠোর তেমনি চরমপন্থী। আর্জেন্টিনাস্থিত ঊর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে সদাসর্বদা সংযোগ রেখে কর্তব্যপালন করে। প্রধান কর্তব্য হলো পশ্চিম-জার্মানীর ভেতরে প্রাক্তন এস.এস. সদস্যদের, বিশেষত যারা উচ্চপদাধিকারী এবং যাদের বিশেষ করে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, তাদের রক্ষা করা।

অফিসের জানলা দিয়ে লোকটি বাইরে তাকিয়ে রইলো। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো মাদ্রিদ হোটেলে পঁয়ত্রিশ দিন আগে এস.এস. জেনারেল গ্ল্যুকসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। জেনারেল ওকে সাবধান করে দিয়েছিলো যে, যে করেই হোক ভালকান নাম নিয়ে রেডিও-কারখানা খুলেছে যে ব্যক্তি এবং যার কারখানাতে ইজিপ্সিয়ান রকেটের গাইডেন্স সিস্টেম তৈরি হচ্ছে, তার পরিচয় যেন প্রকাশ না পায় এবং তার নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়। জার্মানীর মধ্যে একমাত্র সেই-ই জানে যে···ভালকানের আসল নাম হলেন এডুয়ার্ড রশম্যান।

প্যাডের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়লো গাড়িটির নম্বর। টেবিলের ওপরে রাখা বাজারটি বাজাতেই পাশের ঘর থেকে সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

"হিলডা, গতমাসে ওই ডাইভোর্স কেসে আমরা কোন্ প্রাইভেট

ডিটেকটিভকে লাগিয়েছিলাম ?”

“এক মিনিট…” কাগজ ওল্টানোর শব্দ এলো কানে। “মেমার্স… হাইনজ মেমার্স।”

“ওর টেলিফোন নম্বরটা দাও তো। রিং করতে হবে না, শুধু নম্বরটা দাও।”

মিলারের গাড়ির নম্বরের নীচে ওই টেলিফোন নম্বরটা লিখে ইণ্টারকমের চাবি থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দেওয়ালের দিকে গেলো। সিমেণ্টে গাঁথা আছে একটা দেওয়াল-সিন্দুক। তার মধ্যে থেকে একটা মোটা ভারী বই নিয়ে টেবিলে চলে এলো। পাতা উল্টে উল্টে যেখানটা দরকার সেখানটায় থামলো। দুজন মেমার্স আছে—হাইনরিখ ও ওয়াল্টার। হাইনরিখকেই সাধারণত ছোট করে বলা হয় হাইনজ। বিপরীত পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে তার জন্মতারিখ থেকে এখন কত বয়স হিসাব করে নিলো। বেসরকারী গোয়েন্দাটির মুখ মনে করতে চেষ্টা করলো। বয়স মিলে যাচ্ছে। হাইনজ মেমার্সের সামনে অন্য যে দুটো নম্বর খোলা আছে সেগুলো লিখে নিয়ে টেলিফোন তুলে হিলডার কাছ থেকে বাইরের লাইন চাইলো।

ডায়াল-টোন আসতেই হিলডার দেওয়া নম্বর ঘোরালো। প্রায় বারো বার রিং হবার পর সাড়া এলো, নারীকণ্ঠ।

“মেমার্স বেসরকারী অনুসন্ধান।”

“হের মেমার্সকে দিন,” উকিলটি বলে।

“কে বলছেন বলবো,” মধুর কণ্ঠে সেক্রেটারি জানতে চায়।

“কোন দরকার নেই বলবার। লাইন দিন তাকে। চটপট।”

মুহূর্ত বিরতি। কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে কাজ দিয়েছে।

ভারী গলা ভেসে এলো ঃ “মেমার্স।”

“আপনিই হের হাইনজ মেমার্স ?”

“হ্যাঁ, কে বলছেন ?”

“আমার নামটা থাক, ওটা এমন কিছু জরুরী নয়। শুধু বলুন ২৪৫৭১৮ এই সংখ্যাটা কোন্ অর্থবহন করে আপনার কাছে ?”

ফোনে মৃত-নীরবতা ঘনিয়ে এলো। শুধু শোনা গেলো একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। মেমার্স বুঝতে পেরেছে ওর এস.এস. নম্বরটা ওকেই কে ছুঁড়ে মারলো। ওয়েরউলফের টেবিলে রাখা ওই মোটা বইটার ভেতরে প্রত্যেকটি এস.এস. সদস্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মেমার্সের কণ্ঠস্বর ফিরে এলো, সন্দেহে ঘন: "করা কি উচিত?"

"যদি আমি বলি যে আমার নিজস্ব সংখ্যাটিতে শুধু পাঁচটি অঙ্ক আছে, তাহলে সেটা কি কোন অর্থবহন করবে আপনার কাছে···কামেরাড?"

বিদ্যুতের আঘাত লাগলো যেন ওদিকে। পাঁচ অঙ্ক মানে খুব উঁচু র‍্যাঙ্ক।

"হ্যাঁ, স্যার," মিয়ানো গলা মেমার্সের।

"বেশ," ওয়েরউলফ বললো, "ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। কোন একটি টিকটিকি কামেরাডেনদের একজনের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। লোকটার পরিচয় আমার জানা আবশ্যক।"

"জু বেফে, (আদেশ শিরোধার্য)" ফোনে ভেসে এলো।

"সুন্দর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কামেরাড সম্ভাষণই যথেষ্ট। আমরা তো সকলেই একই পথের পথিক, নয়?"

মেমার্সের গলায় এবার পরিতুষ্টির ভাব, খোসামুদিতে খুব খুশি। "হ্যাঁ, কামেরাড।"

"দেখুন, লোকটার গাড়ির নম্বর শুধু পেয়েছি। হাম্বুর্গের রেজিস্ট্রেশন।" নম্বরটা ধীরে ধীরে পড়ে শোনায় ওয়েরউলফ।

"লিখে নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, কামেরাড।"

"আমার ইচ্ছা আপনি নিজে হাম্বুর্গে যান। লোকটার নাম-ধাম, জীবিকা, পরিবার-পরিজন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা···বুঝলেন তো, সাধারণত যেসব খবর নেওয়া হয়। কত সময় লাগবে আপনার?"

"প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা মতো।"

"বেশ। এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আমি আপনাকে ফোন করবো। হ্যাঁ, একটা কথা, যার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে তাকে কোনরকম প্রশ্ন করা চলবে না। সম্ভব হলে এমনভাবে কাজ করবেন যাতে

সে টেরও না পায়। পরিষ্কার ?"

"নিশ্চয়ই, কোন সমস্যা নেই।"

"কাজ হয়ে গেলে হিসাব করে রাখবেন। যখন আমি ফোন করবো বলে দেবেন সেটা। ডাকে টাকা পাঠিয়ে দেবো।"

মেমার্স হাঁ-হাঁ করে উঠলো, "না না, সে কি, কামেরাড? সতীর্থদের কাজে আবার টাকা কি ?"

"বেশ। তাহলে দুদিন পর টেলিফোন করবো।"

ওয়েরউলফ ফোন রেখে দেয়।

ঠিক সেইদিন অপরাহ্নে মিলার হাম্বুর্গ ছেড়ে রওনা দিলো। এবারকার গন্তব্য বন, নদীর ধারের ছোট্ট একঘেয়ে শহরটি, কনরাড অ্যাডেনয়ের যাকে ফেডারাল রিপাবলিকের রাজধানী বানিয়েছেন, কারণ তাঁর বাসস্থান ওইটিই।

ব্রেমেনের দক্ষিণে মহাসড়কের ওপরে বিপরীত দিক থেকে এসে তীব্র-গতিতে মেমার্সের হাম্বুর্গগামী ওপেল তার জাগুয়ারকে পেরিয়ে গেলো। দুজনের কেউই কিন্তু জানতে পারলো না পরস্পরের কথা।

বনে যখন পৌঁছলো প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। শহরে একটিই লম্বা বড়রাস্তা। ট্র্যাফিক পুলিস দেখে তার পাশে এসে থামলো।

"ব্রিটিশ এম্ব্যাসিটা কোথায় বলতে পারেন ?"

"এক ঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে যে," খাঁটি রাইনল্যাণ্ডের লোক পুলিসপুঙ্গব।

"তবে তো দেরি করা চলবে না," মিলার বললো, "কোথায় সেটা ?"

হাত দিয়ে সোজা দক্ষিণের দিক দেখিয়ে দিলো। "সিধে চলে যান। এই রাস্তাটাই সামনে গিয়ে ফ্রেডরিখ এবার্ট অ্যালি হয়েছে। ট্রামলাইন ধরে যান, বন ছেড়ে যখন বাড গোডেসবার্গে ঢুকবেন বাঁদিকে পাবেন। আলো জ্বলছে দেখবেন, বাইরে ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ।"

মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালো মিলার। পুলিসটার নির্দেশমতো ঠিক পেয়ে গেলো ব্রিটিশ দূতাবাস। কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখলো ডেস্কে

একজন মধ্যবয়স্কা আপ্যায়িকা বসে আছে; পেছন দিকে আর-একটা ঘরে নীল সার্জের স্যুট পরা দুজন লোক, যাদের দেখলেই বোঝা যায় যে আগে তারা সৈন্যবিভাগে সার্জেণ্ট ছিলো।

মিলার ভাঙা-ভাঙা স্কুল-ইংরাজীতে বলে, "প্রেস-অ্যাটাচির সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

শুনে আপ্যায়িকাটির দুশ্চিন্তা হলো। "বলতে পারছি না আছেন কিনা···শুক্রবারের বিকেল তো।"

"একটু চেষ্টা করে দেখুন না।" প্রেসকার্ডটা এগিয়ে দিলো মিলার।

আপ্যায়িকা সেটায় নজর বুলিয়ে অন্তর্টেলিফোনে নম্বর ঘোরালো। ভাগ্য ভালো ছিলো। তখনো ভদ্রলোক যাননি। মিলারকে তাঁর ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো প্রাক্তন সার্জেণ্টদের একজন।

দেখে ওর ভালো লাগলো যে ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের মাঝকোঠায়, সাহায্য করতে উন্মুখ বলেই মনে হচ্ছে।

"বলুন, আপনার কি কাজে আসতে পারি আমি?"

একেবারে সরাসরিই বিষয়টা উত্থাপন করতে মনস্থ করলো মিলার।

ভূমিকায় একটু মিথ্যার আশ্রয় অবশ্য নিতে হলো। "আমি একটা সংবাদপত্রিকার হয়ে খবর যাচাই করে বেড়াচ্ছি। জনৈক ভূতপূর্ব এস.এস. ক্যাপ্টেনের কাহিনী। অত্যন্ত পাজী লোক, আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ তাকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনেছি যে জার্মানীর এই অংশ যখন ব্রিটিশদের অধিকারে ছিলো তখন তাঁরাও ওর নামে হুলিয়া বার করেছিলেন। আচ্ছা, বলতে পারেন কিভাবে জানা যায় ব্রিটিশেরা ওকে কখনো ধরতে পেরেছিলো কিনা বা ধরলে তারপরে কি হয়েছিলো?"

ভদ্রলোক যেন অগাধ জলে পড়লেন।

অ্যাঁ?···না, আমি ঠিক জানি না···বলতে পারবো না। সেই কবে ১৯৪৯ সালে আপনাদের সরকারের হাতে আমরা সমস্ত রেকর্ডপত্র দিয়ে দিয়েছিলাম। যে পর্যন্ত আমরা করে গিয়েছিলাম তার পর থেকে তাঁরাই শুরু করেছিলেন। কাজেই তাঁদের কাছেই পাবেন।"

মিলার বলতে চাইলো না যে জার্মান কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন রকম

সাহায্য করতে রাজী নন। তার বদলে সে বললো, "হুঁ, তা সত্যি, ঠিক বলেছেন আপনি। তবে আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে ১৯৪৯ থেকে আজ অব্দি ফেডারাল রিপাবলিক এই লোকটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়নি। তার মানে ১৯৪৯-এর পর লোকটা কখনো ধরাই পড়েনি। তবু পশ্চিম-বার্লিনের আমেরিকান ডকুমেণ্ট সেণ্টার থেকে জানতে পেরেছি যে তার ফাইল ব্রিটিশেরা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে। নিশ্চয়ই তার একটা কোন কারণ আছে, বলুন ?"

"তা তো বটেই," প্রেস অ্যাটাচি বললেন। পশ্চিম-বার্লিনের আমেরিকান কর্তৃপক্ষ মিলারকে সাহায্য করছে, তিনি যদি এখন কিছু না করেন সেটা বড় বিশ্রী। চিন্তায় ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

"ব্রিটিশদের পক্ষে সে সময় তদন্তভার কাদের ওপর ছিলো, কোন্ বিভাগ ?"

"আঁঃ ?···আর্মির প্রোভোস্ট-মার্শালের দপ্তরে। নুরেমবার্গ ছাড়া, যেখানে গুরুতর যুদ্ধ-অপরাধগুলোর বিচার হয়েছিলো, মিত্রশক্তিরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা করে যুদ্ধ-অপরাধীদের তদন্ত করেছিলো। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে চলেছিলো, অবশ্য রাশিয়ানরা ছাড়া। এই সব তদন্তের ফলেই তো আঞ্চলিক যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোর শুরু হয়েছিলো। বুঝতে পারলেন ?"

"হুঁ।"

"তদন্ত চালাতো প্রোভোস্ট-মার্শালের দপ্তর অর্থাৎ সামরিক পুলিস আর বিচারের জন্যে দলিলপত্র তৈরি করতো আইন বিভাগ। কিন্তু দুটো বিভাগেরই সব ফাইল ১৯৪৯-এ দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। বুঝলেন ?"

"হুঁ," মিলার বললো, "কিন্তু ব্রিটিশেরা নিশ্চয়ই প্রতিলিপি রেখে দিয়েছিলো।"

"সম্ভবত। কিন্তু এতদিনে সেগুলো সেনাবাহিনীর আর্কাইভসে চলে গেছে।"

"সেগুলো দেখতে দেওয়া হয় না ?"

অ্যাটাচি ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেন।

"না না, তা সম্ভব না···মনে তো হয় না। রিসার্চ-স্কলারেরা দরখাস্ত করলে হয়তো অনুমতি পেতে পারে, তবে সেটা সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু আমার মনে হয় না কোন রিপোর্টারকে অনুমতি দেওয়া হবে—মাপ করবেন, কথাটায় দোষ নেবেন না···তবে বুঝলেন তো ?"

"হুঁ, বুঝেছি," মিলার বললো।

"মানে কথাটা হলো গিয়ে—আপনি তো আর ঠিক সরকারী লোক নন, নয় ? আর জার্মান কর্তৃপক্ষকে নারাজ করাটাও উচিত কাজ কি আর ?"

"না না, সে চিন্তা মনেও ঠাঁই দেবেন না," মিলার বললো।

"তবে ব্রিটিশ এম্ব্যাসি আর আপনাকে কি সাহায্য করতে পারে, বলুন ?"

"বেশ।···আচ্ছা একটা কথা শুধু বলুন, তখনকার দিনে কাজ করতেন এমন কেউ এখানে আছেন ?"

"এম্ব্যাসির স্টাফে ? না, মশায়। কতবার বদলি হয়ে গেলো সব।" দোর পর্যন্ত এগিয়ে এলেন মিলারের সঙ্গে। "দাঁড়ান, ক্যাডবেরি আছেন। উনি তো সেই কবে থেকে এখানে রয়েছেন।"

"ক্যাডবেরি ?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"অ্যান্টনি ক্যাডবেরি, বৈদেশিক সংবাদদাতা। এখানে সাংবাদিকদের মধ্যে যথেষ্ট সিনিয়র, ব্রিটিশ সাংবাদিক। জার্মান বউ তাঁর। ঠিক যুদ্ধের পরে-পরেই এখানে এসেছিলেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

"বাঃ, খাসা। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু কোথায় পাবো তাঁকে ?"

"আজ তো শুক্রবার," অ্যাটাচিমশায় বললেন, "কিছুক্ষণ পর ওঁকে তাঁর প্রিয় জায়গাটিতে পাবেন, সার্কল্ ফ্রাঁসায়ের বারে। চেনেন সেটা ?"

"নাঃ, আগে কখনো এখানে আসিনি।"

"ওঃ! তা ওটা হলো গিয়ে একটা রেস্তোরাঁ, ফরাসীরা চালায়। সুন্দর খাবার মশায়, খুব জনপ্রিয়। এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যান, বাড গোডেসবার্গে পাবেন।"

পেয়েও গেলো মিলার। প্রায় রাইন নদীর ওপরেই, কিনারা থেকে

মাত্র একশো গজ দূরে, অ্যাম স্বিমবাড নামে একটা রাস্তার ওপর। বারম্যান ক্যাডবেরিকে খুব ভালো করে চেনে, তবে আজ সন্ধ্যাতে তো দেখেনি। তাহলেও চিন্তার কোন কারণ নেই, সন্ধ্যাবেলায় নাও যদি আসেন, কাল নিশ্চয়ই লাঞ্চের আগে ড্রিঙ্কসের জন্যে এসে যাবেন।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ড্রিসেন হোটেলে ঘর নিলো মিলার। পুরনো বনেদী হোটেল, শতাব্দীর গোড়াতে যার জন্ম। অ্যাডলফ হিটলারের খুব প্রিয় ছিলো এই হোটেল; ১৯৩৮ সালে নেভিল চেম্বারলেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের আয়োজন এইখানেই করেছিলেন।...সার্কল ফ্রাঁসাইতে নৈশভোজন সেরে কফি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো যদি ক্যাডবেরি এসে যান। কিন্তু এগারোটা পর্যন্তও যখন প্রৌঢ় ইংরেজটির দেখা পাওয়া গেলো না, তখন সে রাতের মতো আশা ত্যাগ করে মিলার তার হোটেলে ফিরে গেলো।

পরদিন দুপুর বারোটার কয়েক মিনিট আগে ক্যাডবেরি এসে ঢুকলেন সার্কল ফ্রাঁসায়ের পানশালায়। পরিচিত ব্যক্তিদের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে কোনার দিকে নিজের প্রিয় জায়গাটায় গিয়ে টুলে বসলেন। রিকারের গেলাসে প্রথম চুমুকটা মারতেই, মিলার জানলার পাশ থেকে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো।

"মিঃ ক্যাডবেরি ?"

ইংরেজটি ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেখেই বোঝা যায় বয়সকালে ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এখন অবশ্য চুলগুলো সব সাদা যদিও পরিপাটি করে ওল্টানো। মুখের চামড়া অবশ্য কুঁচকে যায়নি। সাদা ঝুপসি ভুরুজোড়ার নীচে চকচকে নীল চোখ। মিলারের দিকে সন্দেহ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

"হ্যাঁ।"

"আমার নাম মিলার, পিটার মিলার। হাম্বুর্গের একজন রিপোর্টার আমি। আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলতে পারি কি ?"

অ্যান্টনি ক্যাডবেরি হাত দিয়ে তাঁর পাশের টুলটা দেখিয়ে দিলেন। জার্মান ভাষাতেই বললেন, "জার্মানেই কথা বলা যাক, কি বলেন ?" মিলার

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো, তার ইংরেজিতেই বোধহয় মালুম দিয়েছে। ক্যাডবেরি হাসলেন। "বলুন, কি করতে পারি ?"

ওঁর উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে মিলার মনস্থির করে ফেললো। পুরো কাহিনীটাই বললো, টউবেরের মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে। ভদ্রলোক খুব ভালো শ্রোতা, একবারও বাধা দিলেন না। মিলারের বলা শেষ হয়ে গেলে বারম্যানকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর রিকারের গেলাস আরেকবার ভরে দিতে হবে এবং মিলারের জন্যে আরেকটা বিয়ার আনতে হবে।

"স্প্যাটেনব্রাউ, নয় ?"

মিলার মাথা নেড়ে বললো, "হ্যাঁ।" গেলাস ভর্তি করে সফেন পানীয় ভরে নিলো।

"চিয়ার্স," ক্যাডবেরি জানালেন। "হুঁ, সমস্যা বেশ গুরুতর দেখছি। তা হিম্মৎ আছে মশাই আপনার।"

"হিম্মৎ ?"

"নয়তো কি ? আপনার দেশবাসীদের বর্তমান যা মানসিক পরিস্থিতি তাতে এরকম একটা কাহিনী তো আর জনপ্রিয় হয়ে উঠবে না," ক্যাডবেরি বললেন, "বুঝবেন মশাই, সময়ে ঠিকই বুঝে নেবেন।"

"বুঝে গেছি এর মধ্যেই," মিলার বললো।

"হুঁ-উ-উ, তাই ভাবছিলাম।" ইংরেজটি হেসে ফেললেন। "একটু লাঞ্চ হয়ে যাক না—উ ? গিন্নী আজ বাইরে গেছেন আমার।"

লাঞ্চ খেতে খেতে মিলার ক্যাডবেরিকে জিজ্ঞেস করলো যে তিনি কি যুদ্ধের শেষ দিকটায় জার্মানীতে ছিলেন ?

"হ্যাঁ···যুদ্ধের সংবাদদাতা ছিলাম আমি। বয়স অবশ্য তখন অনেক কম ছিলো, প্রায় আপনার বয়সীই হবো। মণ্টগোমারির বাহিনীর সঙ্গে এসেছিলাম। বনে নয় অবশ্য, বনের কথা তখন আর কে শুনেছে ? হেড-কোয়ার্টার ছিলো লুনবার্গ। তারপর আমি রয়েই গেলাম। যুদ্ধের সমাপ্তি দেখলাম···আত্মসমর্পণের ঘোষণা···কাগজে সেইসব বিবরণ পাঠালাম। তারপর কাগজ থেকেই আমাকে এখানে থাকতে বলা হলো।"

"আঞ্চলিক যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোতেও কি আপনি উপস্থিত

ছিলেন ?” মিলার প্রশ্ন করলো।

বড় একটা মাংসখণ্ড চিবুতে চিবুতে ক্যাডবেরি বললেন, “হ্যাঁ, ব্রিটিশ অঞ্চলের সব কটাতেই। নুরেমবার্গ বিচারের সময় কাগজ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছিলো, সেটা হয়েছিলো অবশ্য আমেরিকান অঞ্চলে। আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড় অপরাধী ছিলো জোসেফ ক্রেমার আর ইরমা গ্রিজ। তাদের নাম শুনেছেন ?”

“নাঃ।”

“ওদের বলা হতো বেলসেনের জন্তু ও জন্তুনী। নাম দুটো আমিই আবিষ্কার করেছিলাম কিন্তু চাউর হয়ে গেলো খুব। বেলসেনের কথা শুনেছেন ?”

“ভাসা-ভাসা,” মিলার জবাব দিলো, “আমাদের যুগের লোকদের এই সব কথা তো বিশেষ জানানোই হয়নি, কেউ বলতেও চায় না।”

ঝাপসা-ঝাপসা ভুরুর নীচ থেকে তীক্ষ্দৃষ্টি হেনে ক্যাডবেরি প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু এখন দেখছি আপনি জানতে চাইছেন ?”

“কখনো না কখনো তো জানতেই হতো।···আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?···জার্মানদের কি আপনি ঘৃণা করেন ?”

কয়েক মিনিট ধরে মাংস চিবুতে চিবুতে ক্যাডবেরি প্রশ্নটাকে তাঁর মনের গভীরে ভালো করে যাচাই করে দেখলেন।

“বেলসেন আবিষ্কৃত হওয়ার পর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকেরা সেখানে যায়। জীবনে আমি কোনদিন ওরকম মানসিক সমতা হারাইনি। রণাঙ্গনের কত বিভীষিকাই তো আমি দেখেছি, কিন্তু ওরকম। উঁহুঁ···তখন···হ্যাঁ, মনে হয় সেই মুহূর্তে···ওদের সকলকেই আমি ঘৃণা করেছিলাম।”

“আর এখন ?”

“নাঃ, এখন আর নয়।···মুখোমুখি হওয়া যাক তাহলে ব্যাপারটার সঙ্গে। দেখুন, ১৯৪৮ সালে আমি একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করি, এখনো আমি এখানেই বাস করছি। ১৯৪৫-এ আমার মনে জার্মানদের বিরুদ্ধে যে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠেছিলো তা যদি থাকতো তাহলে তো

আমি কবে ইংলণ্ডে ফিরে যেতাম।"

"কিন্তু মনের ভাব পাল্টালো কি করে?"

"সময়ে···সময়ের স্রোতে। বুঝতে পারলাম সব জার্মান মানুষই জোসেফ ক্রেমার নয়···বা ওই যে কি যেন নাম, রশম্যান?···রশম্যানও নয়। তবু, শুনে রাখুন, আমার সমকালের জার্মানদের দেখলে এখনো আমার মনে দ্বিধা জাগে।"

"আর আমাদের যুগের?" হাতের ওয়াইনগ্লাসটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলো মিলার; রক্তবর্ণ তরল পানীয়ের ভেতর দিয়ে আলোর ছটার কম্পমান প্রতিসরণ।

"তারা ভালো," ক্যাডবেরি বললেন, "ভালো হতেই হবে আপনাদের।"

"আপনি আমাকে সাহায্য করবেন রশম্যান তদন্তে? আর কেউ করছে না।"

"যদি আমার দ্বারা হয়, নিশ্চয়ই," ক্যাডবেরি বললেন, "কি জানতে চান আপনি?"

"ব্রিটিশ এলাকায় কি ওর বিচার হয়েছিলো বলে আপনার মনে পড়ে?"

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাডবেরি। "উঁহু"। কিন্তু আপনিই বললেন যে জন্মসূত্রে লোকটা অস্ট্রিয়ান, সেই সময় অস্ট্রিয়াও তো চতুঃশক্তির দখলে ছিলো। তবে আমি নিশ্চিত যে ব্রিটিশ এলাকায় ওর বিচার হয়নি, হলে নামটা আমার মনে থাকতো।"

"তাহলে বার্লিনের আমেরিকানদের কাছ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কেন তার জীবনবৃত্তান্ত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলেন ক্যাডবেরি।

"রশম্যান হয়তো কোন কারণে ব্রিটিশদের নজরে এসে পড়েছিলো। সেই সময় রিগার কথা কেউ জানতোও না। চল্লিশের শেষদিকে রাশিয়ানরা ভীষণ ক্ষ্যাপা, অসম্ভব বদমেজাজ তাদের, পূর্ব-অঞ্চল থেকে কোনরকম কোন খবর দিতো না। অথচ গণহত্যার জঘন্যতম সব অপরাধ ওই অঞ্চলেই ঘটেছিলো। অতএব, দেখুন, কি অদ্ভুত অবস্থা,···এখন যেটাকে আমরা

লৌহ-যবনিকা বলি তার পূর্বদিকে মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধগুলোর আশী শতাংশ ঘটেছিলো কিন্তু সেইসব অপরাধের জন্যে যারা দায়ী তাদের নব্বই শতাংশ রয়ে গেলো তিনটে পশ্চিমী এলাকায়। শয়ে শয়ে অপরাধী আমাদের হাত এড়িয়ে নির্বিবাদে পালিয়ে চলে গেলো কারণ আমরা জানতেই পারলাম না হাজার মাইল পূবে তারা কি করেছিলো। অবশ্য ১৯৪৭-এ যদি রশম্যান সম্পর্কে কোনরকম তদন্ত হয়ে থাকে তবে তার নাম নিশ্চয়ই আমাদের নজরে এসেছে।"

"সেই কথাই তো বলছি," মিলার বললো, "কোন্‌খান থেকে শুরু করা যায় বলুন তো, ব্রিটিশ রেকর্ডস দেখতে হলে কোথায় যেতে হবে?"

"আমার নিজস্ব ফাইলগুলো থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমার বাড়িতেই আছে সেগুলো। আসুন, বেশী দূরে নয়।"

ওঁর অফিস-ঘরে ঢুকে ক্যাডবেরি বললেন, "বাড়িতেই আমার দপ্তর। ফাইল সাজানোর কায়দাও আমার নিজস্ব, অন্য কেউ ধরতেও পারবে না। আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

ফাইলিং ক্যাবিনেট দুটোর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এই যে দেখছেন, এগুলোর একটায় রয়েছে লোকজনদের নাম-অনুসারে বর্ণানুক্রমে সাজানো ফাইল, আর দ্বিতীয়টায় বিষয়সূচী অনুসারে। প্রথমটা থেকেই শুরু করা যাক। রশম্যানের নাম খুঁজে দেখি।"

কিন্তু বৃথা অনুসন্ধান। রশম্যান নামের ওপর কোন নথী নেই।

"আচ্ছা, এবারে বিষয়সূচী অনুসারে সাজানো ফাইলগুলো দেখা যাক," ক্যাডবেরি বললেন, "চারটে বিষয় আছে যেগুলো হয়তো কাজে আসতে পারে। প্রথমটা হলো 'নাৎসী', দ্বিতীয়টা 'এস.এস.'। তারপর খুব মোটা একটা ফাইল আছে,—'বিচার'। সেগুলোতে যত বিচারকাহিনী সবগুলোর কাটিং জমানো আছে, তবে বেশীর ভাগই ১৯৪৯ থেকে অনুষ্ঠিত ফৌজদারি বিচারের বিবরণ। শেষেরটা হলো 'যুদ্ধ-অপরাধ', ওটা কাজে আসতে পারে বোধহয়। দেখা যাক সবগুলো।"

মিলারের চেয়ে ক্যাডবেরি পড়েন অনেক দ্রুত। তবু চারটে ফাইলের কয়েকশো কাটিং আর ক্লিপিং পড়ে দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেলো। শেষ

ফাইলটা আলমারিতে তুলে রেখে ক্যাডবেরি বললেন, "আজ রাত্রে আমার ডিনারের নেমন্তন্ন আছে যে। এগুলো তো এখনো দেখাই হয়নি।" বলেই দেওয়াল-সংলগ্ন ছুটো তাক দেখিয়ে দিলেন, যেগুলোর ওপর কিছু বক্স-ফাইল শোভা পাচ্ছিলো।

"ওগুলো কি?" মিলার প্রশ্ন করে।

"উনিশ বছর ধরে আমার কাগজে যত বার্তা পাঠিয়েছি তার নকল আছে ওই ওপরের তাকে," ক্যাডবেরি বলেন, "আর নীচের তাকের ওগুলো হচ্ছে কাগজে এই উনিশ বছর ধরে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে যত সংবাদ বা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তাদের কাটিং। প্রথমটার অনেক কিছুই দ্বিতীয়টায় ছাপা আছে দেখবেন, সেগুলো আমার পাঠানো। কিন্তু দ্বিতীয়টায় অন্য সাংবাদিকের পাঠানো খবরও তো রয়েছে। আবার তেমনি আমার পাঠানো অনেক খবর কাগজে হয়তো ছাপেনি এমনও রয়েছে। এক এক বছরের কাটিংয়ে প্রায় ছটা করে বক্স-ফাইল ভরেছে। কাজেই মাল-মশলা প্রচুর, খাটতে হবে বেশ। তবে সুখের বিষয় কাল রবিবার, সমস্ত দিনটাই পাওয়া যাবে।"

"আপনি যে আমার জন্যে এত কষ্ট করছেন—"

"আরে না না, কাল আমার করারই কিছু নেই। তাছাড়া ডিসেম্বরের শেষে বন শহরে রোববারগুলো বড়ই একঘেয়ে, ভীষণ নিরানন্দ। গিন্নীও কাল সন্ধ্যার আগে ফিরছেন না। কাল সাড়ে এগারোটা সার্কল ফ্রাঁসাইতে চলে আসুন, তেষ্টা মিটিয়ে আমরা এখানে কাজে লেগে যাবো।"

রবিবার বিকেল নাগাদ সন্ধান মিললো। নিজের পাঠানো ডেসপ্যাচগুলো নিয়ে বসেছিলেন ক্যাডবেরি। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৭-এর তাড়াটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইউরেকা'; স্প্রিং-ক্লিপ খুলে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজ বের করে নিলেন, প্রায়-বিবর্ণ হয়ে এসেছে, বহুদিন আগে টাইপ করা, তারিখ দেওয়া আছে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪৭।

"কাগজে যে ছাপায়নি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই," বললেন তিনি, "ক্রিস্টমাসের আগে কে আর বন্দী এস.এস.এর কাহিনী পড়তে যাচ্ছে, বলুন! তাছাড়া তখন কাগজ যা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিলো, ক্রিস্টমাস-ইভের

সংস্করণও বোধহয় এই অ্যাত্তটুকুই ছিলো।”

লেখার টেবিলে কাগজটা রেখে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলেন। মিলার ঝুঁকে পড়ে দেখলো লেখা আছে ঃ

‘ব্রিটিশ সামরিক সরকার, হ্যানোভার, ২৩শে ডিস—কুখ্যাত এস.এস.-এর একজন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন অস্ট্রিয়ান গ্রাৎসে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হয়েছেন। ব্রি.সা.স.এর সদরদপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ এখানে জানান যে বিশদ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ধরেই রাখা হবে।

‘লোকটিকে এডুয়ার্ড রশম্যান নামে সনাক্ত করেছিলেন অস্ট্রিয়ান শহরটির কোন এক প্রাক্তন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অধিবাসী। তিনি অভিযোগ করেছেন যে রশম্যান ল্যাটভিয়ার একটি ক্যাম্পের কম্যাণ্ডাণ্ট ছিলেন। প্রাক্তন ক্যাম্প অধিবাসীটি তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাড়ি দেখে আসবার পর, গ্রাজের ব্রিটিশ ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের সদস্যেরা রশম্যানকে গ্রেপ্তার করে।’

‘মুখপাত্রটি আরো জানান যে ল্যাটভিয়ার রিগাতে অবস্থিত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পটির বিশদ খবরাখবরের জন্যে পটসডামের সোভিয়েত আঞ্চলিক সদরদপ্তরের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্যে অনুসন্ধান চলছে। ইতিমধ্যে বার্লিনস্থ এস.এস. ইনডেক্স থেকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের ভিত্তিতে ধৃত ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে এডুয়ার্ড রশম্যান বলে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।—সংবাদ সমাপ্ত।—ক্যাডবেরি।’

এই ছোট্ট সমাচারটুকু চার-পাঁচবার করে পড়লো মিলার।

“হা-ঈশ্বর,” জোরে জোরে দম ফেলে বলে, “পেয়েছিলেন তাহলে ওকে।”

“তবে ড্রিঙ্কস হয়ে যাক এখন,” ক্যাডবেরি বললেন।

শুক্রবার সকালে যখন মেমার্সকে টেলিফোন করেছিলো, তখন ওয়েরউলফের মনেও ছিলো না যে আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে রবিবার পড়ে যাবে।

তা সত্বেও, সেদিন বাড়ি থেকে মেমার্সকে যখন ফোন করলো, ঠিক সেই সময়েই বাড গোডেসবার্গে ওরা দুজনে রশম্যানের পুরনো খবর খুঁজে বের করেছে।…টেলিফোনে কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

পরের দিন বেলা সাড়ে নটায় অফিসে টেলিফোন এলো।

মেমার্স বললো, "কি যে আনন্দিত হলাম কামেরাড, আপনি টেলিফোন করলেন। কাল হাম্বুর্গ থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিলো।"

"খবর পেয়েছেন?" ওয়েরউলফ জিজ্ঞেস করে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। লিখে যদি নিতে চান…"

"বলুন।" প্রায় ধমক দেওয়ার মতো কণ্ঠস্বর।

মেমার্স গলাটলা সাফ করে নিজের নোটবই থেকে পড়তে আরম্ভ করলো ঃ

"গাড়িটার মালিক জনৈক স্বাধীন সাংবাদিক, নাম পিটার মিলার। চেহারার বিবরণ ঃ বয়স উনত্রিশ, উচ্চতা প্রায় ছ ফিট, বাদামী চুল, বাদামী চোখ। বিধবা মা আছে, হাম্বুর্গের শহরতলী অডর্ফে থাকে। ও নিজে হাম্বুর্গ শহরের মাঝখানে স্টাইণ্ড্যামের কাছে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে।"

মিলারের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর ও পড়ে শোনালো।

"মিস সিগ্রিড রাহ্‌ন নামে একটি মেয়েকে নিয়ে ও থাকে, পেশায় মেয়েটি স্ট্রিপ-টিজ নাচিয়ে। মিলার মূলত সচিত্র পত্রিকাগুলোর হয়ে কাজ করে। উপার্জন, মনে হয়, বেশ ভালো। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে ওর বিশেষত্ব। মানে, যা বলেছিলেন, কামেরাড, পাকা টিকটিকি একটা।"

"কে ওকে এই কাজটার ভার দিয়েছে সে বিষয়ে কোন খোঁজ পেলেন?" ওয়েরউলফ জিজ্ঞেস করলো।

"নাঃ, সেটাই বরং একটা রহস্য। ও যে এখন কাদের হয়ে কাজ করছে তা কেউই জানে না। আমি মেয়েটাকে টেলিফোন করেছিলাম, এমন ভাব দেখিয়েছিলাম যেন মস্তবড় কোন পত্রিকা-অফিস থেকে বলছি। মেয়েটি বললো মিলার কোথায় আছে সে জানে না, তবে বিকেলের দিকে ওর টেলিফোন পাবে বলে আশা করছে।"

"আর কিছু?"

"ওর গাড়িটা ; যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে সেটার। কালো জাগুয়ার, ব্রিটিশ মডেলের, পাশ দিয়ে লম্বালম্বি একটা হলুদ দাগ। দু' সীটের স্পোর্টসকার, তবে আঁটা ছাত, খোলা যায় না। মডেলের নাম এক্স. কে. ১৫০। ওর গ্যারাজে গিয়ে সন্ধান নিয়েছি।"

ওয়েরউলফ মন দিয়ে খবরটা শুনে নিয়ে বললো, "দেখুন, ও এখন কোথায় আছে আমি জানতে চাই।"

"হাম্বুর্গে নেই," চটপট জবাব দেয় মেমার্স, "শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজের সময় চলে গিয়েছিলো, মানে আমি যখন ওখানে যাচ্ছিলাম। ক্রিস্টমাস ওখানেই কাটিয়েছিলো, তার আগে অন্য কোথাও ছিলো।"

"সে আমি জানি," ওয়েরউলফ বলে।

"কোন্ কাহিনী নিয়ে অনুসন্ধান করে ফিরছে তা বের করতে পারবো," ভরসা দিতে চায় মেমার্স, "খুব বেশি তো অনুসন্ধান করতে পারিনি কারণ আপনিই বলে দিয়েছিলেন যে ও যেন বুঝতে না পারে ওর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে।"

"আমি জানি কোন্ কাহিনী নিয়ে সে কাজ করছে। আমাদেরই কোন সতীর্থকে ফাঁস করে দিতে।" এক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার ওয়েরউলফ বললো, "কোথায় আছে এখন, বের করতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, মনে তো হয়। বিকেলে আবার ওই মেয়েটাকে ফোন করবো; বলবো যে বড় কোন পত্রিকার দপ্তর থেকে বলছি, মিলারকে এক্ষুনি দরকার। সেবার টেলিফোনে মনে হলো মেয়েটা বেশ সরল।"

"তাই করুন তাহলে," ওয়েরউলফ বললো, "বিকেল চারটের সময় আবার আমি টেলিফোন করবো।"

সেই সোমবারের সকালবেলায় ক্যাডবেরি এলেন বনে। মন্ত্রীদের একটা সাংবাদিক সম্মেলন আছে। সাড়ে দশটায় ড্রিসেন হোটেলে মিলারকে ফোন করলেন। "আঃ, ধরতে যে পারলাম আপনাকে,...ভাগ্য মশায়! শুনুন, চারটে নাগাদ সার্কল ফ্রাঁসায়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

মধ্যাহ্নভোজের আগে সিগিকে টেলিফোন করে মিলার জানিয়ে দিলো

যে সে ড্রিসেনে আছে।

দেখা হতেই ক্যাডবেরি চায়ের ফরমাস দিলেন।

"সকালে ওই হতচ্ছাড়া সংবাদ বৈঠকটায় বসে বসে একটা কথা মনে পড়লো," মিলারকে বললেন তিনি, "বুঝলেন, রশম্যান যদি তখন গ্রেপ্তার হয়ে থাকে এবং ফেরারী আসামী হিসাবে যদি তার সনাক্তকরণ হয়ে থাকে তবে জার্মানীর তৎকালীন ব্রিটিশ-অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের গোচরে আসবেই সে-কথা, কেননা তখন জার্মানী এবং অস্ট্রিয়াতে এইসব ব্যাপারে সব ফাইলপত্তর তিন কপি হয়ে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে চলে যেতো।···লিভারপুলের লর্ড রাসেলের নাম শুনেছেন?"

"না তো," মিলার জানায়।

"সেই সময় যুদ্ধ-অপরাধের সমস্ত মামলাতেই তিনি ছিলেন ব্রিটিশ জঙ্গীলাটের আইন-উপদেষ্টা। পরে তিনি একটা বই লিখেছিলেন, 'স্বস্তিকার কশাঘাত'। বুঝতেই তো পারছেন কি নিয়ে লেখা। জার্মানীতে সেজন্যে অবিশ্যি তিনি কিছু জনপ্রিয় হয়ে ওঠেননি, তবে যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক রচনা। নৃশংসতার ওপরে।"

"উনি আইনজীবী?"

"ছিলেন," ক্যাডবেরি বললেন, "খুব ভালো উকিল,···দারুণ। সেই জন্যেই তো ওই পদে তাঁকে নেওয়া হয়েছিলো। এখন অবসর নিয়ে উইম্বলডনে থাকেন। আমাকে তাঁর এখনো মনে আছে কিনা বলতে পারবো না, তবে একটা পরিচয়পত্র লিখে দিতে পারি আপনাকে।"

"অতদিন আগের ঘটনা মনে থাকবে তাঁর?"

"থাকতে পারে। এখন অবশ্য বুড়ো হয়ে গেছেন তবে বয়সকালে তাঁর খ্যাতি ছিলো যে তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার তো নয় যেন ফাইলিং ক্যাবিনেট। রশম্যানের মামলা যদি কখনো তাঁর কাছে এসে থাকে অভিযুক্তিপত্র তৈরি করবার জন্যে তো আমি নিশ্চিত যে তার প্রতিটা খুঁটিনাটি এখনো তাঁর স্মরণে আছে।"

মাথা নেড়ে মিলার চায়ে চুমুক দেয়।

"আমি লণ্ডনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।"

পকেট হাতড়ে ক্যাডবেরি একটা খাম বের করে আনলেন।

"চিঠিটা আমি লিখেই রেখেছি।" পরিচয়পত্র মিলারের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "আচ্ছা, তাহলে আসি।...গুডলাক।"

ঠিক চারটের সময় ওয়েরউলফ যখন টেলিফোন করলো, মেমার্স খবর নিয়ে তৈরি।

"বান্ধবীকে টেলিফোন করেছিলো," মেমার্স জানালো, "ও আছে বাড গোডেসবার্গে, ড্রিসেন হোটেলে।"

ফোন রেখে দিয়ে ওয়েরউলফ একটা ঠিকানার খাতা বের করে কি যেন খোঁজে। নামটা পেয়ে যেতেই আবার টেলিফোন তুলে, বন/বাড গোডেসবার্গ অঞ্চলের একটা নম্বর ঘোরায়।

হোটেলে ফিরে এসেই মিলার কলোন এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে পরের দিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বরের ফ্লাইটে লণ্ডন যাবার জন্যে একটা সীট বুক করলো। ফোন করে আপ্যায়ন ডেস্কের কাছে এসে পৌঁছুতেই মেয়েটি একমুখ উজ্জ্বল হাসি হেসে প্রতীক্ষালয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, "হের মিলার, আপনার অপেক্ষায় একজন ভদ্রলোক বসে আছেন।"

জানলার ধারে ছায়াকুঞ্জে কুশনে ঢাকা অনেকগুলো চেয়ার। চারটে করে করে চেয়ার গোল গোল টেবিলের চারপাশে বৃত্তাকারে সাজানো। কাঁচের সার্সির ওধারে বহমান রাইন নদী।

মিলার দেখলো যে একজন মধ্যবয়সী লোক, কালো গরম কোট পরে, এক হাতে একটা কালো হোমবার্গ আর অন্য হাতে সযত্নে গুটোনো ছাতা, চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছে। অবাক হয়ে গেলো সে, এখানে যে আছে সে খবর পেলো কি করে!

"আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?" প্রশ্ন করতেই লোকটা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো।

"হের মিলার?"

"হ্যাঁ।"

"হের পিটার মিলার ?"

"হ্যাঁ।"

লোকটা পুরনো আমলের জার্মানদের মতো সামান্য মাথা নাচিয়ে অভিবাদন করলো। "আমার নাম স্মিড্‌ট্‌…ডাঃ স্মিড্‌ট্‌।"

"কি করতে পারি বলুন ?"

একটু কষ্টের হাসি হেসে লোকটা জানলার বাইরে দৃষ্টি চালনা করলো। নির্জন চত্বরের উজ্জ্বল আলোকমালার নীচে রাইনের কালো জল যেন শোকগাথা।

"শুনেছি আপনি একজন সাংবাদিক ? নয় ? স্বাধীন সাংবাদিক, অত্যন্ত সুদক্ষ।" তারা ফোটালো যেন এবার হাসির ছটায়, "শুনেছি আপনি নাকি ধৈর্য হারান না কিছুতেই, একবার ধরলে আর ছাড়েন না।"

মিলার নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করে লোকটা কখন আসল কথা পাড়বে।

"আমার কোন কোন বন্ধুবান্ধব বলছিলো আপনি নাকি এখন পুরনো ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন…মানে, বহুদিন আগে যেগুলো ঘটে গেছে। অনেক দিন আগে।"

শক্ত হয়ে গেলো মিলার। মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ছুটে ছুটে চলে…কে হতে পারে ওর সেই বন্ধুবান্ধব যারা তার কাজের কথা জানে ? কিন্তু তক্ষুনি মনেও পড়লো এ আর এমন কি কথা, দেশের সর্বত্রই তো সে রশম্যানের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

"হ্যাঁ, কোন এক এডুয়ার্ড রশম্যানের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি।…কি হয়েছে তাতে ?" গলার স্বর বেশ কঠোর করে তুললো মিলার।

"হুঁ হুঁ,…এডুয়ার্ড রশম্যান, বটেই তো ! তা আমি ভাবলাম, আমি বোধহয় আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।" নদী থেকে চোখ দুটো সরিয়ে এনে মিলারের ওপরে রাখলো, ঘন কোমল দৃষ্টি। বললো, "রশম্যান মারা গেছেন।"

"তাই বুঝি ? জানতাম না তো ?"

ডাঃ স্মিড্‌ট্‌ খুশি হয়। "জানবেন কি করে ? আপনার তো জানার কোন প্রশ্নই নেই। কথাটা কিন্তু খাঁটি। মিথ্যা সময় নষ্ট করছেন আপনি।"

মিলার যেন হতাশ হয়ে পড়লো। "কবে মরেছে বলুন তো ?"

লোকটা প্রশ্ন করলো, "ওঁর মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো জানতে পারেননি ?"

"না। আমি ওর সম্বন্ধে শেষ যা জানতে পেরেছি তা এপ্রিল ১৯৪৫-এর ঘটনা। তখনও বেঁচে ছিলো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বটেই তো," খবরগুলো জানতে পেরে কৃতার্থ হয়ে গেলো যেন ডাঃ স্মিড্‌ট্, "তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। স্বদেশে অস্ট্রিয়াতে ফিরে যান এবং সেখানেই আমেরিকানদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ১৯৪৫-এরই প্রথমার্ধে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ সনাক্তও করেছিলেন তাঁরই পরিচিত কয়েকজন।"

"...হুঁ...অসাধারণ ব্যক্তি!" মিলার বলে ওঠে।

ডাঃ স্মিড্‌ট্ মাথাটা্ধা নাড়িয়ে সহমত জ্ঞাপন করে। "বটেই তো... কেউ কেউ তাই ভাবতো...আমাদের মধ্যে কিছু লোকেরও সেই ধারণা, বুঝলেন ?"

"মানে," মিলার এমনভাবে বলে যায় যেন তার কথার মাঝখানে কোন ছেদ পড়েনি, কোন বাধা না। "যীশুখৃষ্টের পর মৃত্যু থেকে জীবন লাভ আর অন্য কারো ভাগ্যে ঘটেনি, অতএব অসাধারণ তো বটেই।...অস্ট্রিয়ার গ্রাৎসে ব্রিটিশরা তাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করেছিলো ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৭।"

জানলার বাইরে ছুঁচোলো স্তম্ভগুলোর ওপরে তুষার পড়ে ঝকঝক করছিলো। সেইদিকে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার।

"মিলার, ভীষণ বোকামি করছেন আপনি...ভীষণই বোকামি। আমি যথেষ্ট বয়স্ক, আপনার চেয়ে অনেক বড়; একটু উপদেশ দিচ্ছি আপনাকে, কিছু মনে করবেন না...এই অনুসন্ধান ছেড়ে দিন।"

পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় মিলার বললো, "আপনাকে বোধহয় ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

"উপদেশ যদি গ্রহণ করেন তো দিতে পারেন," ডাক্তার বললো।

"না, আবার আপনি ভুল বুঝছেন," মিলার বললো, "এই বছর

অক্টোবরের মাঝামাঝি হাম্বুর্গে নাকি রশম্যানকে দেখা গিয়েছিলো ; খবরটা আমি প্রমাণিত বলে ধরে নিতে পারিনি। কিন্তু এখন পারছি, আপনার কথাতেই তার প্রমাণ।"

"আবার আমি বলছি, এই অনুসন্ধান যদি আপনি ছেড়ে না দেন তো আপনার পক্ষে সেটা নিতান্ত মুর্খামি হবে।" ডাক্তারের দৃষ্টি আগের মতোই শীতল, তবু তাতে যেন একটু সামান্য উদ্বেগের ছায়া।

মিলার রেগে উঠতে থাকে ; রাগের দাহ ক্রমশ তার কলার থেকে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

"হের ডক্টর, আপনাকে দেখে আমি অসুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করেছি। আপনি এবং আপনার দলের শয়তানগুলো···দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছেন আপনারা !··· মানী লোকের মুখোশ এঁটে থাকেন অথচ আমার দেশের সর্বাঙ্গে শুধু নোংরা কাদা ছেটান আপনারা।···যদ্দিন না আমি তাকে খুঁজে পাই, অনুসন্ধান আমি চালিয়েই যাবো, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

চলে যেতে উদ্যত হয়, কিন্তু বয়স্ক লোকটি বাহু ধরে ওকে থামিয়ে দেয়। মুখোমুখি, ছ ইঞ্চির ব্যবধানে, ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

"আপনি তো ইহুদী নন, মিলার, আপনি আর্য। আপনি আমাদেরই সগোত্র। আমরা আপনার কি ক্ষতি করেছি, বলুন, ঈশ্বরের দোহাই নিয়ে বলুন, আমরা কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি ?"

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলো মিলার।

"যদি এখনো তা না জেনে থাকেন, হের ডক্টর, কোনদিনও বুঝতে পারবেন না।"

"হ্যাঃ, আজকালকার ছেলেছোকরা সব, সবাই একরকম। যা করতে বলা হয়, করো না কেন তোমরা ?"

"কারণ, এই যুগের ছেলেরা অমনই, অন্তত আমি তো।"

দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে ডাক্তার ওকে দেখে। "তুমি তো মুর্খ নও মিলার, কিন্তু বোকার মতোই যে কাণ্ড করছো। যেন তুমি ওই হাস্যাস্পদ জীবদেরই অন্যতম যারা বিবেক নামে কোন একটা অদ্ভুত জিনিসের দোহাই পাড়ে সব কাজে। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ওরকম হওয়াটা···আমার সন্দেহ আছে ; মনে

হচ্ছে যেন এই বিষয়টায় তোমার কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে।"

মিলার যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

"হয়তো আছে," বলেই লবি দিয়ে গটগট করে হেঁটে ভেতরে চলে গেলো।

আট

লণ্ডনের উইম্বলডন পাড়ায় একটা নিরিবিলি রাস্তার ধারে বাড়িটাকে পেয়ে গেলো মিলার। ঠিকানা খুঁজতে বেগ পেতে হয়নি। লর্ড রাসেল নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধ, গায়ে পশমী কার্ডিগান, গলায় বো-টাই।

মিলার নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, "আমি কাল বনে যখন মিঃ অ্যাণ্টনি ক্যাডবেরির সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম তখন তিনি আমায় আপনার নাম জানালেন এবং একটা পরিচয়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে, স্যার।"

সিঁড়ির ওপর থেকেই তিনি মিলারের দিকে চেয়ে রইলেন, মুখে স্পষ্ট বিভ্রান্তির ছাপ। "ক্যাডবেরি? অ্যাণ্টনি ক্যাডবেরি? উঁহুঁ, মনে করতে পারছি না তো···"

"ব্রিটিশ সাংবাদিক তিনি," মিলার জানালো, "যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জার্মানীতে এসেছিলেন। আপনি যখন ডেপুটি জজ-অ্যাডভোকেট ছিলেন, তখন তিনি যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোতে তাঁর কাগজের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন। জোসেফ ক্রেমার এবং অন্যান্যরা, বেলসেনের ঘটনা··· মনে আছে আপনার সেইসব বিচারের কথা···"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, মনে পড়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাডবেরি, হ্যাঁ, খবরের কাগজের সেই ছোকরা তো? মনে পড়েছে তাকে। উঃ, কতদিন আগের কথা!···আরে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, আমি

তো আর আগের মতো যুবক নই। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।”

১৯৬৪-র নববর্ষের দিন। লর্ড রাসেলের পেছনে পেছনে বসার ঘরে চলে এলো মিলার, আসবার পথে হলঘরের হুকে কোট ঝুলিয়ে এসেছিলো। অগ্নিকুণ্ডে স্নিগ্ধ আগুন জ্বলছে।

ক্যাডবেরির চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলো মিলার। লর্ড রাসেল সেটা নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন।

ভুরু উঁচিয়ে বললেন, “হুম্‌…একজন নাৎসীকে খুঁজে দিতে সাহায্য করতে হবে? সেইজন্যেই আপনি এসেছেন, অ্যাঁ?” মিলার কিছু বলতে পারবার আগেই লর্ড রাসেল আবার বললেন, “আরে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন, বসুন। দাঁড়িয়ে কি কোন কথা হয়?”

আগুনের দু পাশে দুটো ফুল-ফুল ঢাকনি দেওয়া চেয়ারে ওরা বসে পড়ে।

কোনরকম ভূমিকা না করে লর্ড রাসেল বললেন, “কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? তরুণ একজন জার্মান সাংবাদিক নাৎসীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে?” ওঁর এমন সরাসরি প্রশ্ন শুনে মিলার অপ্রস্তুত।

“আমি বরং গোড়া থেকে আপনাকে বলি,” মিলার বললো।

“হ্যাঁ, তাই বলুন।” অগ্নিকুণ্ডের ধারে পাইপটাকে ঠুকে পরিষ্কার করে নিয়ে পরিপাটি করে তামাক ভরেন, ধরান তারপর, এবং জার্মানটি যখন তার কাহিনী শেষ করলো তখন আয়েশ করে তিনি ধুঁয়ো ছাড়ছেন।

কাহিনীর শেষে লর্ডের কোনরকম প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না, তাই দেখে মিলার বলে উঠলো, “আমার ইংরেজি বোধহয় তেমন ভালো নয়—”

লর্ড রাসেল যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন, “না না, আমার জার্মানের চেয়ে অনেক ভালো। এতগুলো বছর তো…ভুলে যাই, বুঝলেন।”

“রশম্যানের ব্যাপারটা—”

“হুঁ, বেশ মনোগ্রাহী।…তা আপনি ওকে খুঁজে বের করতে চান, কেমন?…কিন্তু কেন?”

শেষের প্রশ্নটা দুম করে ছুঁড়ে দিলেন মিলারের দিকে। মিলার দেখলো ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ।

“কারণ আছে বৈকি,” কাঠ-কাঠ গলায় বলে মিলার, “

ওকে খুঁজে বার করে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসা যাবে।"

"হুম্‌···আমাদের সকলেরই কি ওরকমই বিশ্বাস।···কিন্তু প্রশ্ন হলো যাবে কি? কখনো কি তা হবে?"

মিলায় সোজা জবাব দিলো, যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে।

"খুঁজে যদি বার করতে পারি, নিশ্চয়ই তার বিচার হবে। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

মিলারের আশ্বাস কিন্তু ব্রিটিশ লর্ডটির মনে কোন রেখাপাত করলো না। পাইপ থেকে ক্রমান্বয়ে ধুঁয়োর কুণ্ডলী উঠে শুধু ছাতের দিকে চলে যায়। নীরব থাকেন তিনি খানিকক্ষণ। বিরতিকে দীর্ঘায়িত হতে দেখে মিলার জিজ্ঞেস করে, "প্রশ্ন হচ্ছে, মাই লর্ড, ওর কথা কি আপনার মনে আছে?"

চমকে উঠলেন যেন লর্ড রাসেল।

"মনে আছে?···হ্যাঁ, মনে আছে, অন্তত নামটা। কিন্তু যদি নামটাতে একটা চেহারা বসাতে পারতাম, কিংবা একটা মুখ! বুড়ো মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিভ্রংশ হয়, জানেনই তো। আর সে সময় এরকম কতশত লোক ছিলো।"

"আপনাদের সামরিক পুলিস ওকে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে গ্রাৎসে বন্দী করেছিলো," মিলার জানায়।

বুকপকেট থেকে রশম্যানের দুটো ফটো বের করে তাঁর হাতে দেয়—একটা সামনাসামনি ছবি, একটা পাশ থেকে। ছবি দুটো দেখে লর্ড রাসেল চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিলেন, গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন তিনি।

"হ্যাঁ," অবশেষে বলে উঠলেন, "পেয়েছি এতক্ষণে, মনে পড়ছে। ফাইলটা আমাকে হ্যানোভারে পাঠানো হয়েছিলো কয়েকদিন পরে গ্রাৎস ফিল্ড সিকিউরিটি থেকে। ওখান থেকেই ক্যাডবেরি তার সংবাদ আহরণ করেছিলো, হ্যানোভারে আমাদের অফিস থেকে।"

থমকে দাঁড়িয়ে মিলারের দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বললেন যে টউবের ওকে শেষ দেখেছিলো ৩রা এপ্রিল ১৯৪৫-এ, অন্য কয়েকজনের সঙ্গে গাড়ি করে ম্যাগডেবুর্গের ভেতর দিয়ে পশ্চিমদিকে যেতে?"

"হ্যাঁ, ডায়েরিতে তাই লিখেছে।"

"হু-উ-উ-ম্। তারও আড়াই বছর আগে আমরা ওকে ধরেছিলাম।··· জানেন তখন ও কোথায় ছিলো?"

"নাঃ," মিলার বললো।

"একটা ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দী শিবিরে।···কি আস্পর্ধা!···আচ্ছা ঠিক আছে, যুবক, আমি যতটুকু জানি তোমাকে বলছি···"

এডুয়ার্ড রশম্যান এবং তার অন্যান্য এস.এস. সহকর্মীদের নিয়ে গাড়িটা ম্যাগডেবুর্গের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেই দক্ষিণমুখে বাঁক নিয়েছিলো ব্যাভেরিয়া এবং অস্ট্রিয়ার পথে। এপ্রিল মাস শেষ হবার আগে ওরা সবাই কোনরকমে ম্যুনিখ পর্যন্ত একসঙ্গে আসতে পেরেছিলো। তারপরে দলটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। রশম্যানের পরিধানে ততদিনে এসে গেছে জার্মান সৈন্যবাহিনীর জনৈক করপোরালের উর্দি, পরিচয়পত্রটত্র যদিও নিজের নামে তবুও বিবরণের খাতে লেখা আছে যে সে সৈন্যবাহিনীর লোক।

ম্যুনিখের দক্ষিণে মার্কিনী সৈন্যেরা ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র তখন জোর টহল দিচ্ছে। বেসামরিক অধিবাসীদের নিয়ে তাদের কোনই মাথাব্যথা নেই, কারণ তাদের সমস্যা তখন শুধু প্রশাসনিক, সামরিক নয়। সৈন্যবাহিনী-দের ব্যস্ততা অন্য কারণে; গুজব রটেছিলো নাৎসীরা নাকি হিটলারের বার্থটেসগ্যাডেনের বাড়ির আশেপাশে ব্যাভেরিয়-আল্পসের একটি পার্বত্য দুর্গে আশ্রয় নেবে এবং সেখান থেকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাবে। প্যাটনের বাহিনীরা তাই সমস্ত ব্যাভেরিয়া তখন তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে অথচ শয়ে শয়ে নিরস্ত্র জার্মান সৈনিক যারা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দিকে তাদের মোটেই লক্ষ্য নেই।

নিশাচরের মতো শুধু রাত্রে ভ্রমণ করে, দিনের বেলায় কাঠুরেদের কুটিরে বা খড়ের গাদায় লুকিয়ে থেকে, রশম্যান অবশেষে অস্ট্রিয়ায় এসে পৌঁছুলো। সীমান্তের কোন বালাই নেই; সেই ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া অধিকার করে নেবার পর থেকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়াঁর মধ্যে সীমারেখা অবলুপ্ত। দক্ষিণের পথ ধরে রশম্যান তার নিজস্ব শহর গ্রাৎসের দিকে চললো।

অনেক পরিচিত ব্যক্তি আছে সেখানে, বিপদে যারা আশ্রয় দিতে পারবে।

ভিয়েনাকে পাশ কাটিয়ে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলো গ্রাৎসে, কিন্তু পড়বি তো পড় একেবারে ব্রিটিশ পেট্রলের সামনে, ৬ই মে তারিখে। বোকার মতো ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকোতেই একঝাঁক গুলি এসে পড়লো সেখানে। তার মধ্যে একটা সোজা এসে তার বুককে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেলো একটা ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে। অন্ধকারে এদিক-ওদিক খানিকটা খুঁজে ব্রিটিশ টমিরা দ্রুত এগিয়ে গেলো, ঝোপের মধ্যে কিন্তু পড়েই রইলো আহত রশম্যান, তাকে তারা দেখতেও পেলো না। সেখান থেকে হামাগুড়ি মেরে মেরে সে চলে এলো একটা চাষীর কুটিরে আধ মাইল দূরে।

তার জ্ঞান তখনো ছিলো। গ্রাৎসের এক পরিচিত ডাক্তারের নাম বললো চাষীটিকে। অন্ধকার রাত এবং কারফিউ সত্ত্বেও চাষী চললো সাইকেল করে ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তিন মাস ধরে বন্ধুবান্ধবেরা তার সেবা করলো, প্রথমে ওই চাষীর কুটিরে, তারপর গ্রাৎস শহরেরই একটা বাড়িতে। উঠে হেঁটে চলবার মতো যখন অবস্থা হলো তখন তিন মাস হলো যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেছে, অস্ট্রিয়া এসে পড়েছে চতুঃশক্তির অধিকারে। গ্রাৎস ব্রিটিশ এলাকার একেবারে মাঝখানে।

প্রত্যেকটি জার্মান সৈন্যকে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধবন্দী শিবিরে দু মাস থাকতে হতো। রশম্যান ভাবলো যে এইটাই সুযোগ, এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর নেই। অতএব সে ধরা দিলো। দু বছর থাকলো ক্যাম্পে—১৯৪৫-এর আগস্ট থেকে ১৯৪৭-এর আগস্ট পর্যন্ত, অথচ সেই সময়টাতেই বড় বড় এস.এস. হত্যাকারীর জন্যে তুমুল অনুসন্ধান চলছিলো চারদিকে। রশম্যান কিন্তু পরম নিশ্চিন্ত, যুদ্ধবন্দীর শিবিরে তার অন্য নাম; ধরা দেওয়ার সময়ে সৈন্যবাহিনীভুক্ত জনৈক বন্ধুর নাম নিয়েছিলো, যে বেচারা কবেই উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে মারা গেছে। কিন্তু খবর কে রাখে! হাজার হাজার জার্মান সৈনিক তখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনরকম পরিচয়পত্রও তাদের কাছে নেই, অতএব যে নাম বলছে মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে তাই মেনে নেওয়া হচ্ছে। নইলে উপায়ই বা কি! অত সময় কার,

…ব্যাপক অনুসন্ধান করে যে দেখবে আর্মি-করপোরালটি তার সত্যিকারের নাম দিয়েছে কিনা তেমন প্রশাসনিক বন্দোবস্তই বা কোথায়?…১৯৪৭-এর গ্রীষ্মে রশম্যান ছাড়া পেয়ে গেলো, ভাবলো বাইরে আর বোধহয় তেমন বিপদ নেই। কিন্তু ভুল করলো সেইটাই।

রিগা ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিলো। ভিয়েনার জনৈক অধিবাসী; রশম্যানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সে নেবেই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তার। লোকটা গ্রাৎসের পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, একবার রশম্যান ফিরে আসুক। আসতেই হবে; কারণ তার বাপ-মা গ্রাৎসে রয়েছে, ছুটিতে এসে ১৯৪৩ সালে যাকে বিয়ে করেছিলো, সেই বৌ হেলা রশম্যানও গ্রাৎসে আছে। রশম্যানদের বাড়ি আর তার শ্বশুরবাড়ির ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখলো লোকটা, কখন ফেরে সেই এস.এস. দুর্বৃত্ত।

মুক্তি পাবার পর গ্রাৎস শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলেই রয়ে গেলো রশম্যান কিছুদিন, ক্ষেতে দিনমজুরের কাজ করতো। বাড়ি ফিরলো ১৯৪৭-এর ২০শে ডিসেম্বর, ইচ্ছা ছিলো যে বড়দিন কাটাবে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে। বুড়ো লোকটা কিন্তু ওত পেতেই ছিলো। যেই দেখলো যে শ্বশুরবাড়ির দিকে আসছে সে, অমনি থামের আড়ালে লুকলো। সেইখান থেকে দেখলো যে রশম্যান এদিক-ওদিক দু-একবার তাকিয়ে কড়া নেড়ে টুপ করে ঢুকে গেলো তার বৌয়ের বাড়িতে।

এক ঘণ্টার মধ্যে বুড়ো ফিরে এলো, সঙ্গে ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের দুজন ষণ্ডা ব্রিটিশ সার্জেন্ট। সার্জেন্টরা বোধহয় তখনো ঠিক বিশ্বাস করেনি, সন্দেহ ছিলো তাদের। বাড়িটা সার্চ করে রশম্যানকে পাওয়া গেলো খাটের তলায়। ওটাই তার ভুল হয়েছিলো। যদি সাহস করে সামনে এসে দাঁড়াতো, বুক ঠুকে বলতো আমি রশম্যান নই, তবে সার্জেন্টরা হয়তো ভাবতো বুড়োর ভুল হয়েছে। কিন্তু খাটের তলায় লুকনোতেই সব সন্দেহ প্রমাণিত হলো। ধরে নিয়ে গেলো তাকে। এফ.এস.এস.এর মেজর হার্ডি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে চটপট সেলে পুরে ফেললেন। অনুরোধ পাঠানো হলো বার্লিনে: এস.এস.এর আমেরিকান ইনডেক্সের জন্যে।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে খবর এসে গেলো। সনাক্তকরণ পাকা, ছদ্ম-

সাজের বেলুন গেলো ফেটে। পটসডামে অনুরোধ গেলো রাশিয়ানদের কাছে, রিগার কীর্তিকলাপ সপ্রমাণ করবার জন্যে তাদের সাহায্য চাই। কিন্তু তার আগেই আমেরিকানরা রশম্যানকে কিছুদিনের জন্যে ম্যুনিখে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলো, যাতে ডাচাউয়ে গিয়ে সে রিগার আশ-পাশের অন্যান্য ক্যাম্পগুলো সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে, যেখানে তখন কিছু এস.এস. বন্দীর বিচার চলছিলো। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজী হয়ে গেলো।…

১৯৪৮-এর ৮ই জানুয়ারি ভোর ছটায় গ্রাৎস স্টেশনে রশম্যানকে সালজবুর্গ এবং ম্যুনিখ-গামী ট্রেনে চড়িয়ে দেওয়া হলো। পাহারায় দুজন সার্জেন্ট,—একজন রয়্যাল মিলিটারি পুলিসের আর একজন ফিল্ড সিকিউরিটির।

লর্ড রাসেল পায়চারি থামিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে পাইপ ঠুকতে থাকেন।

"তারপর কি হলো?" মিলার উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"পালিয়ে গেলো।"

"কি?"

"পালিয়ে গেলো। চলন্ত ট্রেনের পায়খানার জানলা থেকে লাফ মেরে-ছিলো। ট্রেনে উঠেই বলে দিয়েছিলো যে জেলের খানা খেয়ে খেয়ে তার পেটের অসুখ। পাহারাদার দুজনে যতক্ষণে পায়খানার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলো, ততক্ষণে তুষারের ভেতরে সে কোথায় অদৃশ্য। খুঁজে আর পায়নি তাকে। অনুসন্ধান করা হয়েছিলো বটে, ফৌজিদলও পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু ওই পর্যন্তই—পাওয়া আর গেলো না। তুষারে ঢাকা মাঠপ্রান্তর ভেঙে নিশ্চয়ই চলে গিয়েছিলো নাৎসীদের যারা গোপনে গোপনে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে তাদের সন্ধানে। তার এক বছর চার মাস পরে, ১৯৪৯-এর মে-তে, আপনাদের নতুন প্রজাতন্ত্র কায়েম হলো, আমরাও আমাদের সব ফাইলপত্র বনকে সঁপে দিলাম।"

লেখা শেষ করে মিলার তার নোটবই নামিয়ে রাখলো।

"আচ্ছা, পরের ঘটনাগুলো কোত্থেকে জানা যাবে?"

লর্ড রাসেল গাল দুটো ফুলিয়ে সশব্দে হাওয়া ছাড়লেন।

"আপনাদের দেশেই, আপনাদের লোকদের কাছ থেকেই বোধহয়। রশম্যানের জীবনী আপনি পেলেন, জন্ম থেকে ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৮ পর্যন্ত, বাকিটুকু জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে আছে।"

"কোন্ কর্তৃপক্ষ?" প্রশ্ন করেই কিন্তু মিলারের ভয় ধরলো, না জানি কি শুনতে হয়।

"রিগার ব্যাপার যখন তখন হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস বলেই মনে হয়।"

"আমি সেখানে গিয়েছিলাম।"

"বিশেষ সাহায্য-টাহায্য পাননি?"

"বিন্দুমাত্র না।"

লর্ড রাসেল হাসেন। "বটে! অবাক হচ্ছি না কিন্তু।...তা আপনি লুডউইগসবুর্গে গিয়েছিলেন?"

"হুঁ, যথেষ্ট সৌজন্য দেখালো, কিন্তু সাহায্য পেলাম না মোটেই। রীতি-বিরুদ্ধ কাজ তো," মিলার বলে।

"ও!...তাহলে অনুসন্ধানের সরকারী সূত্রগুলো তো শেষ। হ্যাঁ, তা আর একজন রয়েছে, ওই একজন মাত্রই। সিমন উইজেনথালের নাম শুনেছেন?"

"উইজেনথাল? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।"

"ভিয়েনায় থাকেন তিনি। ইহুদী; গোড়াতে পোলিশ গ্যালিসিয়া থেকে এসেছিলেন। চার বছর কাটিয়েছেন নানা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, সবসুদ্ধ বারোটাতে। ফেরারী নাৎসী অপরাধীদের খুঁজে বের করাই তাঁর এখন সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মারদাঙ্গাটাঙ্গা নয় অবিশ্যি। শুধু খবর আহরণ করে বেড়ান, যতখানি সাধ্য। তারপর যখন নিশ্চিত হন যে হ্যাঁ, একজন ফেরারীকে পাওয়া গেছে ঝুটা নামের অন্তরালে, পুলিসকে খবর দেন তারা। যদি কিছু না করে, সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সব জানিয়ে দেন। সুতরাং জার্মানী বা অস্ট্রিয়া কোন দেশেরই আমলাতন্ত্র তাঁকে বিশেষ সুনজরে দেখেন না। উনি তো বলেনই যে নাৎসী হত্যাকারীদের শাস্তি দেবার

ব্যাপারে যথেষ্ট ঢিলেমি হচ্ছে, খুঁজে বের করা তো দূরস্থান। প্রাক্তন এস.এস.রা ওঁর সাহসে ভীত, অন্তত বার দুয়েক ওঁকে খুন করবার চেষ্টা করেছে; সরকারী আমলারা ওঁর ওপর বিরক্ত, শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না যে; কিন্তু সাধারণ মানুষে ওঁকে যথেষ্ট তারিফ করে, যদ্দুর সম্ভব সাহায্য করে থাকে।"

"হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। অ্যাডলফ আইখম্যানকে উনিই খুঁজে বের করেছিলেন না?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

ঘাড় নাড়লেন লর্ড রাসেল। "হুঁ, উনিই সনাক্ত করেছিলেন বুয়েনস আয়ার্সে রিকার্ডো ক্লেমেণ্ট নামে যে বাস করছে সেই আইখম্যান। তারপর ইস্রায়েলিরা তার ভার নিয়ে নিলো। আরো বহু, প্রায় কয়েক শো নাৎসী অপরাধীকে তিনি খুঁজে বার করেছেন। আপনার এডুয়ার্ড রশম্যান সম্বন্ধে যদি আরো কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য থাকে তো তিনি জানবেন।"

"আপনি চেনেন তাঁকে," মিলার প্রশ্ন করলো।

"হুঁ," লর্ড রাসেল ঘাড় নাড়লেন, "আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি আমি। বহু লোক আসে ওঁর কাছে খবরের প্রত্যাশায়, তাই চিঠি দিলে সুবিধে হবে।"

লেখার টেবিলে গিয়ে স্বীয় নামাঙ্কিত একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে চিঠি লিখলেন। নিপুণভাবে সেটা ভাঁজ করে খামে পুরে বন্ধ করে দিলেন।

"আচ্ছা, ভাগ্য প্রসন্ন হোক আপনার; সৌভাগ্যের দরকার হবে মশায় আপনার।···গুডবাই!"

মিলার বেরিয়ে এলো।

পরদিন সকালে মিলার বি.ই.এর ফ্লাইটে কলোনে ফিরে এলো। নিজের গাড়িটাকে পার্কিং প্লেস থেকে তুলে জাতীয় সড়ক ধরে চললো স্টুটগার্ট-মুনিখ-সালজবুর্গ-লিনৎস হয়ে ভিয়েনা।···ভিয়েনায় এসে যখন পৌঁছলো বিকেল প্রায় গড়িয়ে এসেছে। তারিখ ৪ঠা জানুয়ারি। হোটেলে-টোটেলে না উঠে সোজা শহরের মাঝখানে এসে রুডলফ স্কোয়ারের খোঁজ করলো।

সাত নম্বর বাড়ি অনায়াসেই পেয়ে গেলো। ভাড়াটেদের নামতালিকায় দেখলো তিনতলায় 'ডকুমেণ্টেশান সেণ্টার'। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাঁশুটে রঙের দরজাটায় করাঘাত করে। দরজা খুলে দেবার আগে মনে হলো কে যেন ছিদ্রপথে চোখ রেখে তবে তালা খুলেছে। স্বর্ণকেশী এক সুন্দরী এসে দাঁড়ালো দোরের সামনে।

"বলুন ?"

"আমার নাম মিলার, পিটার মিলার। হের উইজেনথালের সঙ্গে দেখা করতে চাই, সঙ্গে করে একটা পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছি।"

চিঠিটা বের করে মেয়েটির হাতে দিলো। মেয়েটি একটু মুচকি হেসে ওকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেলো।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে ওকে ভেতরে আহ্বান করলো। দরজা পেরিয়ে একটা অলিন্দ। মেয়েটির পেছনে পেছনে সেই অলিন্দের শেষে মোড় ঘুরে ফ্ল্যাটটার পশ্চাৎ অংশে এসে পড়লো। ডানদিকে একটা খোলা দরজা। ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিমন উইজেনথাল অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন।"

মিলার মনে মনে ওঁর যে ছবি এঁকে রেখেছিলো, দেখলো আদতে তার চেয়ে মানুষটা বৃহদাকার। প্রায় ছ ফুট লম্বা, সবল মূর্তি, মোটা টুইডের কোট পরা। একটুখানি ঝুঁকে রয়েছেন, যেন সব সময়েই কোন-না-কোন কাগজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। লর্ড রাসেলের চিঠিটা ওঁর হাতে ধরা ছিলো।

অপরিসর অফিস-ঘরটি প্রায় ঠাসা বোঝাই। একটা গোটা দেওয়াল জুড়ে, ছাদসমান উঁচু, অনেকগুলো তাক। প্রত্যেকটা বইয়ে ভর্তি। সামনের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে নানারকম নক্‌শা-কাটা বাহারদার প্রশংসাপত্র,—এস.এস.দের দ্বারা নির্যাতিত মানবদের একাধিক প্রতিষ্ঠানের কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন। পেছনের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো আছে একটা লম্বা সোফা, সেটাও বইয়ে বোঝাই। দরজার বাঁ পাশে ছোট্ট জানলা, সেটা দিয়ে নীচে অঙ্গন দেখা যায়। জানলার অন্য পাশে রয়েছে ডেস্ক, তার সামনে অভ্যাগতদের চেয়ারে বসলো মিলার। ভিয়েনার নাৎসী-শিকারীটি ডেস্কের পেছনের

চেয়ারে বসে লর্ড রাসেলের চিঠিটা আরেকবার পড়লেন।

"লর্ড রাসেল লিখেছেন আপনি নাকি একজন ভূতপূর্ব এস.এস. হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?" কোন ভনিতা-ফনিতা না করেই শুরু করলেন তিনি।

"হ্যাঁ।"

"নামটা জানতে পারি কি?"

"রশম্যান, ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যান।"

সিমন উইজেনথাল ভুরু উঁচিয়ে শিসের মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়লেন।

"তার নাম শুনেছেন নাকি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"রিগার কশাই? আমার প্রথম পঞ্চাশজন সন্ধিত লোকদের মধ্যে অন্যতম," উইজেনথাল বললেন, "কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ কেন জানতে পারি কি?"

মিলার সংক্ষেপে সারতে চাইলো।

"উঁহুঁ, গোড়া থেকে আরম্ভ করুন বরং," উইজেনথাল বললেন, "এই ডায়রিটা কি ব্যাপার?"

অগত্যা পুরো কাহিনী বলতে হলো মিলারকে। লুডউইগসবুর্গ, ক্যাডবেরি এবং লর্ড রাসেলের পর এই নিয়ে চতুর্থবার হলো। প্রত্যেকবারই দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে। লর্ড রাসেলের দেওয়া খবরটুকু জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমি জানতে চাই তারপর কি হলো? ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথায় গেলো লোকটা?"

জানলা দিয়ে দুরের ফ্ল্যাটগুলোর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন উইজেনথাল। পেঁজা তুলোর মতো নরম তুষারকণাগুলো গিয়ে জমছে তিনতলার নীচে আঙিনার ওপর।

কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "ডায়রিটা আছে আপনার কাছে?" নীচু হয়ে ব্রিফকেস খুলে মিলার সেটা বের করলো। টেবিলে রাখতে রাখতে দেখলো খাতাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উইজেনথাল। "অপূর্ব, অদ্ভুত!" যেন শব্দ দুটো তাঁর অজান্তেই বেরিয়ে এলো কণ্ঠ থেকে। পরক্ষণেই মিলারের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন,

"ঠিক আছে, আপনার কাহিনী সত্যি বলে মেনে নিলাম।"

"কেন ? সন্দেহ ছিলো নাকি ?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে সিমন উইজেনথাল জানালেন, "সন্দেহ তো থাকতেই পারে,হের মিলার। আপনার কাহিনী যে বড়ই আশ্চর্য।...এখনো তো আমি বুঝতে পারছি না রশম্যানকে খুঁজে বার করবার পেছনে আপনার উদ্দেশ্য কি।"

শূন্যে দু হাত ছুঁড়ে মিলার বলে, "আমি সাংবাদিক...কাহিনীটার আকর্ষণ রয়েছে।"

"কিন্তু প্রেসকে বেচতে পারবেন না কোনদিনই এই কাহিনী। তার জন্যে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট করা!...উঁহু!...আপনি কি নিশ্চিত ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই এর পেছনে ?"

মিলার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। "আপনি দেখছি 'কমেট' পত্রিকার হফম্যানের মতো কথা বলছেন। সেও ঠিক এই একই প্রশ্ন করেছিলো। কিন্তু থাকবে কেন বলুন ? আমার বয়স সবে উনত্রিশ ; এসব ঘটনা তো আমাদের অনেক আগেই ঘটে গেছে।"

"তা বটে।" উইজেনথাল ঘড়িতে চোখ বুলিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। "ওঃ, পাঁচটা বেজে গেছে ! শীতের সন্ধ্যাগুলোতে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই বুঝলেন, গিন্নী একা থাকে।...ডায়রিটা নিয়ে যাচ্ছি, রাতে পড়ে দেখবো ?"

"বেশ তো।"

"আচ্ছা, তাহলে আপনি সোমবার সকালে আসুন। রশম্যান সম্বন্ধে যতটুকু জানি আপনাকে জানাবো।"

সোমবার বেলা দশটায় এসে মিলার দেখলো সিমন উইজেনথাল তাঁর দপ্তরে একতাড়া চিঠি নিয়ে বসেছেন। মিলার আসতেই বসবার চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে একমনে খামগুলোর প্রান্ত অতি সযত্নে কেটে কেটে চিঠিগুলো বার করতে থাকেন।

"আমি ডাকটিকিট জমাই কিনা, তাই খামগুলো নষ্ট করতে চাই না।"

ব্যাখ্যাটুকু করে দিয়ে আবার কাজে মন দেন।

কয়েক মিনিট পরে সব চিঠিটিঠি খোলা হয়ে গেলে, মিলারের দিকে চেয়ে বললেন, "কাল রাতে বাড়িতে পড়লাম ডায়েরিখানা…অদ্ভুত !"

"অবাক হয়ে গেছেন ?" মিলার শুধালো।

"নাঃ, অবাক হইনি। সকলেই প্রায় আমরা ওই একই ভোগান্তি ভুগেছি, একটু-আধটু রকমফের ছাড়া। তবে কাহিনীর ব্যাখ্যান অত্যন্ত নিপুণ, টউবের খুব ভালো সাক্ষী হতে পারতো। আনুপূর্বিক সবকিছু লক্ষ্য করেছিলো, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি। লিখেও রেখেছিলো—এবং তৎকালীন সময়ে। জার্মান বা অস্ট্রিয়ান আদালতে দণ্ডবিধান পাবার পক্ষে সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে এখন মৃত।"

কয়েক মুহূর্ত ধরে বিষয়টার অনুধাবন করে মিলার। তারপর চোখ তুলে তাকায়।

"দেখুন, হের উইজেনথাল, আমি আজ পর্যন্ত কোন নির্যাতিত ইহুদীর সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাইনি, আপনিই প্রথম। তাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই,—টউবেরের ডায়রিতে লেখা একটা কথা আমাকে খুব আশ্চর্য করেছে, সে বলেছে যে যৌথ অপরাধ বলে কোন জিনিস নেই। কিন্তু আমাদের, প্রত্যেকটা জার্মানকে, কুড়ি বছর ধরে বোঝানো হয়েছে যে আমরা সকলেই অপরাধী। আপনার কি মত এই বিষয়ে ?"

"টউবের ঠিক কথাই বলেছে," উত্তাপহীন স্বর নাৎসী-শিকারীটির।

"তা কি করে বলছেন, যখন আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছি ?"

"এই কারণে যে ব্যক্তিগতভাবে আপনি সেখানে ছিলেন না, আপনি নিজে কাউকে হত্যা করেননি। টউবের খাঁটি কথাই বলেছে যে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো আসল অপরাধীদের বিচারের জন্যে আনা হয়নি।"

"তাহলে," উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মিলার, "এতগুলো মানুষকে হত্যা করবার জন্যে কে আসলে দায়ী ?"

সিমন উইজেনথাল ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। "এস.এস.এর বিভিন্ন শাখাগুলোর কথা আপনি জানেন ? তাদের সেইসব বিভাগের কথা

যাদের ওপর ওই লক্ষ লক্ষ মানুষগুলোকে হত্যা করার ভার ছিলো ?”

“না।”

“তবে শুনুন। রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদরদপ্তরের নাম শুনেছেন ? যাদের ওপর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ওইসব হতভাগ্যকে যতরকমভাবে সম্ভব হয় শোষণ করবার দায়িত্ব দেওয়া ছিলো ?”

“হ্যাঁ, ওইরকম কিছু পড়েছি বটে।”

হের উইজেনথাল বললেন, “তাদের কাজটা হলো গিয়ে গোটা প্রকল্পটার মাঝখানের কাজ।···

“বাকী কাজগুলোর মধ্যে ছিলো দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে থেকে বাছাই করা, হত্যার জন্যে যারা চিহ্নিত তাদের জড়ো করা, তাদের পরিবহন এবং তাদের অর্থনৈতিক শোষণের পর একেবারে শেষ করে ফেলা। এই কাজগুলোর ভার ছিলো আর.এস.এইচ.এর ওপর,—রাইখের নিরাপত্তার সদরদপ্তর। এরাই আসলে ওই লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিলো। দপ্তরটার নামের মধ্যে ‘নিরাপত্তা’ কথাটার ব্যবহার হয়েছিলো নাৎসীদের এক অদ্ভুত ধারণা থেকে যে ওই হতভাগ্য মানুষগুলো রাইখের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে, অতএব ওদের কাছ থেকে রাষ্ট্রকে সাবধানে থাকতে হবে। আর.এস.এইচ.এর অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিলো ওদের একসঙ্গে জড়ো করা, জিজ্ঞাসাবাদ চালানো, কনসেনট্রেশন শিবিরগুলোতে রাইখের অন্যান্য শত্রুদেরও অবরুদ্ধ করে রাখা, যেমন কম্যুনিস্টদের, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, লিবারেল, কোয়েকার বা সেইসব সাংবাদিক বা যাজক যারা অসুবিধাজনক কথাটথা বলতো, দখলে-আনা দেশগুলোর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের, এবং পরে সৈন্যবাহিনীর কিছু অফিসারকেও যথা, ফিল্ড-মার্শাল এরউইন রোমেল ও অ্যাডমিরাল উইলহেলম ক্যানারিস—এই দুজনকেই তো হিটলার-বিরোধী মনোভাব পুষে রাখবার সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিলো।

“আর.এস.এইচ.এর ছটা বিভাগ ছিলো, প্রত্যেকটাকে বলা হতো অ্যাম্‌ট্। এক নম্বর অ্যাম্‌টের কাজ ছিলো প্রশাসন এবং কর্মীসংস্থান ; দু নম্বরের, অর্থ ও প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা। তিন নম্বর অ্যাম্‌ট্ ছিলো ভয়াবহ—

নিরাপত্তা ফৌজ এবং নিরাপত্তা পুলিস। নেতৃত্ব ছিলো রাইনহার্ড হেই-ড্রিখের ওপর ; ১৯৪২ সালে প্রাগে আততায়ীর হাতে সে নিহত হলে তিন নম্বর অ্যাম্‌টের ভার পড়েছিলো আর্নস্ট কালটেনব্রুনারের ওপর, পরে মিত্র-শক্তি তাকে মৃত্যুর দণ্ড দেয়। এই দল তুটোই যতরকম যন্ত্রণা দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো যাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তির মুখ খুলে যায় ; জার্মানীর ভেতরে বা দখল-করে-নেওয়া দেশগুলোতে যথেচ্ছ প্রয়োগ হতো ওইসব উদ্ভাবনের।

"চার নম্বর অ্যাম্‌ট্‌ ছিলো গেস্টাপো যার নেতা ছিলো হাইনরিখ ম্যুলের (এখনো নিখোঁজ) আর যার ইহুদী বিভাগের—বি.৪. শাখার—ভার ছিলো অ্যাডলফ আইখম্যানের হাতে, যাকে আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ করে এনে ইস্রায়েলিরা জেরুজালেমে মৃত্যুর দণ্ড দিয়েছে। অ্যাম্‌ট্‌ পাঁচ হলো অপরাধীদের পুলিস আর অ্যাম্‌ট্‌ ছয় বিদেশে ইনটেলিজেন্স কাজকর্ম।

"তিন নম্বর অ্যাম্‌টের প্রধান হেইড্রিখ এবং পরে তার উত্তরাধিকারী কালটেনব্রনারের হাতে সামগ্রিকভাবে আর.এস.এইচ.এর নেতৃত্বভার ছিলো। এদের তুজনের কার্যভারের সময়েই সহকারী নেতা ছিলো এক নম্বর অ্যাম্‌টের প্রধান, এস.এস.এর তিন-তারাওলা জেনারেল ব্রুনো স্ট্রেখেনবাখ। হাম্বুর্গে সে এখন একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে খুব উঁচু মাইনের চাকরি করে, ফোগেলউইডে থাকে।

"কাজেই অপরাধ যদি নির্ধারিত করতে হয়, তবে বেশীর ভাগ দায়িত্বই এস.এস.এর এই তুই বিভাগের ওপর এসে পড়ে ; তার সংখ্যাও কয়েক হাজারেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান জার্মানীর সমস্ত লক্ষ-কোটি মানুষের ওপর দায়িত্ব মোটেও অর্শায় না। জার্মানীর সমগ্র ছ কোটি মানুষের ওপর এই অপরাধের যৌথ দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রথমে এসেছিলো মিত্রশক্তির কাছ থেকেই, তবে এস.এস.এর প্রাক্তন সদস্যদের পক্ষে ভারি সুবিধা হয়ে গেলো তাতে। কেন না যতদিন যৌথ-দায়িত্বের কলঙ্ক নিয়ে জার্মানরা বেঁচে থাকবে, ততদিন কেউ আর স্বতন্ত্রভাবে আসল অপরাধীদের খুঁজে বেড়াবে না, বেড়ালেও তেমন কিছু বিশেষ চেষ্টা করবে না। কাজেই

এস.এস.এর আদত খুনীরা আজও যৌথ-অপরাধের তত্ত্বের নীচে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।"

মিলার ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা ঘুরে যায় ওর, এ-ত লোক! প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। তাদের প্রত্যেককে একক ব্যক্তি হিসাবে ভেবে নেওয়া কঠিন। তার চেয়ে বরং হাম্বুর্গ শহরের বৃষ্টিভেজা রাস্তায় স্ট্রেচারে শয়ান মৃতদেহটার সম্বন্ধে চিন্তা করা অনেক সহজ।

"টউবের আত্মহত্যার কারণ যা দর্শিয়েছে," মিলার প্রশ্ন করলো, "তা বিশ্বাস করেন আপনি?"

একটা লেফাফার ওপরে ছুটো সুন্দর আফ্রিকান স্ট্যাম্প নিবিষ্ট হয়ে দেখতে দেখতে হের উইজেনথাল বললেন, "হ্যাঁ···অপেরার সিঁড়িতে সে রশম্যানকে দেখেছে একথা কেউই বিশ্বাস করবে না বলে যে ভেবেছিলো তা সত্যি।"

"কিন্তু পুলিসের কাছেও তো যায়নি," মিলার বললো।

আরেকটা খাম উল্টেপাল্টে দেখতে থাকেন সিমন উইজেনথাল। একটু পরে বলে উঠলেন, "না, যায়নি। বিধি অনুসারে অবশ্য যাওয়াই উচিত ছিলো। তবে তাতে যে কিছু ফল হতো তা আমি মনে করি না। অন্তত হাম্বুর্গে নয়।"

"কেন, হাম্বুর্গ কি দোষ করলো?"

"আপনি সেখানকার প্রাদেশিক অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিসে গিয়েছিলেন না?" মৃতুকণ্ঠে শুধালেন উইজেনথাল।

"হ্যাঁ, তারা এমন কিছু সাহায্য করেনি।"

উইজেনথাল চোখ তুলে চাইলেন।

"হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস সম্বন্ধে আমাদের কিছু নিজস্ব ধারণা আছে।···ধরুন, টউবেরের ডায়রিতে যার নাম আছে এবং আমিও যার নাম একটু আগেই করলাম···গেস্টাপো-প্রধান এবং এস.এস. জেনারেল ব্রুনো স্ট্রেখেনবাখ? মনে পড়ছে নামটা?"

"নিশ্চয়ই। কি হয়েছে তার?"

জবাব দিতে গিয়ে ডেস্কের ওপরে একগাদা কাগজ থেকে খুঁজে একটা

কাগজ বার করে আনলেন উইজেনথাল। কাগজটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এই তো। পশ্চিম-জার্মানীর বিচার-বিভাগে, তার পরিচয় হলো নথী নং ১৪১ জে.এস. ৭৪৭/৬১। শুনতে চান তার কথা ?"

"বলুন, আমার সময় আছে," মিলার জানালো।

"আচ্ছা। তবে শুনুন।…যুদ্ধের আগে হামবুর্গে গেস্টাপো-প্রধান। ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিলো এস.ডি. এবং এস.পি.তে, অর্থাৎ আর.এস.এইচ.এর নিরাপত্তা ফৌজ এবং নিরাপত্তা পুলিস বিভাগে। ১৯৩৯ সালে নাৎসী-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে উন্মূল-ফৌজের সংগঠন করে। ১৯৪০-এ সমগ্র পোল্যাণ্ডের মধ্যে এস.এস.এর এস.ডি. ও এস.পি. বিভাগের অধিকর্তা হয় ; তথাকথিত সাধারণ সরকারের নেতা হয়ে ক্র্যাকাউ-এ দপ্তর খোলে। সেই সময়ে পোল্যাণ্ডে এস.ডি. ও এস.পি. বিভাগ থেকে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো, বিশেষত তাদের 'এ. বি. অভিযান' দ্বারা।

"১৯৪১-এর গোড়ায় বার্লিনে ফিরে আসে ; পদোন্নতি হয়ে এস.ডি.র কর্মীসংস্থানের প্রধান হয়। সেইটা হলো আর.এস.এইচ.এ তিন নম্বর অ্যামৃট। ওর ওপরওলা ছিলো রাইনহার্ড হেইড্রিখ, ও হলো সহকারী। রুশ আক্রমণের অল্প কয়েকদিন আগেই সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে যাবার জন্যে উন্মূলবাহিনী গড়ে তুললো। স্টাফের কর্তা হিসাবে নিজেই কর্মী বাছাই করলো এস.ডি. শাখা থেকে।

"আবার পদোন্নতি হলো। এবারে আর.এস.এইচ.এর ছটা বিভাগেরই কর্মীসংস্থানের সর্বময় কর্তা। সমগ্র আর.এস.এইচ.এ গরিষ্ঠতা অনুসারে দ্বিতীয়, ঠিক নেতার নীচেই। প্রথমে কিছুদিন তার ওপরওলা ছিলো হেইড্রিখ ; ১৯৪২ সালে যখন প্রাগে চেক প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের গুপ্তঘাতকের হাতে সে নিহত হলো তখন লিদিসে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। তারপর নেতা হলো আর্নস্ট কালটেনব্রুনার। তার নীচেও সহকারী হয়ে রইলো সে। অতএব যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত নাৎসী-অধিকৃত পূর্বাঞ্চলে এস.ডি. বিভাগগুলোর সংগঠন এবং সমস্ত ভ্রাম্যমাণ উন্মূলবাহিনী গড়ে তোলার সার্বিক দায়িত্ব তারই।"

"এখন কোথায় সে ?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"হাম্বুর্গে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, বাতাসের মতোই মুক্ত," উইজেনথাল জানালেন।

মিলার হতবাক। "সে কি! তাকে গ্রেপ্তার করেনি?"

"কে করবে?"

"কেন, হাম্বুর্গের পুলিস?"

উত্তর না দিয়ে উইজেনথাল তাঁর সেক্রেটারিকে মোটা একটা ফাইল আনতে বললেন যার ওপরে লেখা ছিলো 'বিচার-বিভাগ—হাম্বুর্গ'। ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করে সেটাকে ঠিক মাঝবরাবর লম্বালম্বি ভাঁজ করে মিলারের সামনে ধরলেন। মিলার দেখলো লেখার দিকটাই ওপরে আছে।

"এই নামগুলো চেনেন?" উইজেনথাল শুধালেন।

ভুরু কুঁচকে নাম দশটা পড়ে নিলো মিলার।

"নিশ্চয়ই," সে বললো, "আমি কয়েক বছর ধরে হাম্বুর্গে পুলিস রিপোর্টারের কাজ করেছি। এরা তো সবাই হাম্বুর্গের বড় বড় পুলিস অফিসার।...কেন?"

"কাগজটা ভাঁজ খুলে সামনে করে নিন," উইজেনথাল বলেন।

খুলতেই মিলার দেখে লেখা রয়েছে:

নাম	নাৎসী পার্টি নং	এস.এস. নং	র‍্যাঙ্ক	পদোন্নতির তারিখ
ক	—	৪,৫৫,৭৩৬	ক্যাপ্টেন	১. ৩. ৪৩
খ	৫৪,৫১,১৯৫	৪,২৯,৬৩৯	প্র. লেফট	৯. ১১. ৪২
গ	—	৩,৫৩,০০৪	প্র. লেফট	১. ১১. ৪১
ঘ	৭০,৩৯,৫৬৪	৪,২১,১৭৬	ক্যাপ্টেন	২১. ৬. ৪৪
ঙ	—	৪,২১,৪৪৫	প্র. লেফট	৯. ১১. ৪২
চ	৭০,৪০,৩০৮	১,৭৪,৯০২	মেজর	২১. ৬. ৪৪
ছ	—	৪,২৬,৫৫৩	ক্যাপ্টেন	১. ৯. ৪২
জ	৩১,৩৮,৭৯৮	৩,১১,৮৭০	ক্যাপ্টেন	৩০. ১. ৪২
ঝ	১৮,৬৭,৯৭৬	৪,২৪,৩৬১	প্র. লেফট	২০. ৪. ৪৪
ঞ	৫০,৬৩,৬৩১	৩,০৯,৮২৫	মেজর	৯. ১১. ৪৩

চোখ তুলেই আর্ত বিস্ময়ধ্বনি করে ওঠে মিলার, "ক্রাইস্ট !"

"এখন বুঝলেন তো হাম্বুর্গের রাস্তায় কেন আজো একজন এস.এস. লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবাধে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে ?"

মিলার আবার তালিকাটির দিকে তাকিয়ে দেখে, বিশ্বাস করতে যেন প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

"সেইজন্যেই ব্রাণ্ডট বলেছিলো যে প্রাক্তন এস.এস.দের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়ার কাজে হাম্বুর্গের পুলিসদের বিশেষ উৎসাহ নেই।"

"স্বাভাবিক," উউজেনথাল বলেন, "অ্যাটর্নি-জেনারেলের দপ্তরও তেমন কিছু উৎসাহী নয়। তাদের অফিসে একজন মাত্র উকিল আছেন যাঁর এ বিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ, কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল থেকে তাঁকে বরখাস্ত করবার অনেক চেষ্টা হয়েছে।"

সুন্দরী সেক্রেটারিটি দরজার কাছে এসে শুধালো, "চা, না কফি ?"

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর মিলার আবার ফিরে এলো। সিমন উইজেনথাল টেবিলে তাঁর সামনে অনেকগুলো কাগজটাগজ ছড়িয়ে বসেছিলেন। মিলার তার চেয়ারটায় বসে, নোটবই বের করে, অপেক্ষা করতে থাকে।

সিমন উইজেনথাল তারপর বলতে শুরু করলেন রশম্যানের কাহিনী, ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৮ থেকে।...

ব্রিটিশ ও আমেরিকান কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিলো যে ডাচাউ-এ সাক্ষ্যদানের পর রশম্যানকে জার্মানীর ব্রিটিশ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে, সম্ভবত হ্যানোভারে। যতদিন না তার বিচার সেখানে শেষ হয় ততদিন সে সেখানে থাকবে; বিচারে তার ফাঁসি ছিলো অবধারিত। গ্রাৎসের কয়েদখানায় থাকবার সময়েই সে পালিয়ে যাবার মতলব ভাঁজছিলো।

অস্ট্রিয়ায় তখন নাৎসীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান কাজ করতো, তাদের নাম ছিলো 'ছয়মাথা তারা'। ইহুদীদের প্রতীক ষষ্ঠশীর্ষ-তারকার সঙ্গে এর কোন মিল ছিলো না। নামটা দেওয়া

হয়েছিলো শুধুই এই কারণে যে অস্ট্রিয়ার ছটি বড় শহরে ছিলো এদের প্রভাব।···রশম্যান তাদের সঙ্গে সংযোগ করেছিলো।···

৮ তারিখের ভোর ছটায় রশম্যানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গ্রাৎস স্টেশনে নিয়ে গিয়ে একটা অপেক্ষমাণ ট্রেনে তুলে দেওয়া হলো। কামরায় ওঠার পর মিলিটারি পুলিস সার্জেণ্ট এবং ফিল্ড সিকিউরিটি সার্জেণ্টের মধ্যে কিছু কথান্তর হয়েছিলো। সামরিক পুলিসের লোকটা বলেছিলো যে রশম্যানের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েই রাখা হোক, কিন্তু অন্য লোকটা সেটা খুলে দেবার পক্ষে ছিলো।

রশম্যান যখন বললো যে জেলের খাবার খেয়ে খেয়ে তার পেটের অসুখ হয়েছে, পায়খানায় যেতে হবে তাকে, তখন হাতকড়ি খুলে ফেলতেই হলো। সার্জেণ্টদের মধ্যে একজন দরজার বাইরে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না শেষ হয়। দুধারে তুষারঢাকা মাঠঘাট, তারই মাঝে ঝকঝক করে ট্রেন চললো। তিন-তিনবার রশম্যান গেলো পায়খানায়। নিশ্চয়ই সে-সময়ে সে পায়খানার জানলাটা জোরজার করে খুলে ফেলেছিলো যাতে ওপরে নীচে ওঠনামা করতে পারে কামরার অন্যান্য জানলাগুলোর মতন।

রশম্যান জানতো যে সালজবুর্গে ওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেওয়া হবে, তারপর মোটরে করে আমেরিকানরা ওকে ম্যুনিখে তাদের কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। অতএব, সালজবুর্গের আগেই তাকে পালাতে হবে। অথচ স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে, গাড়ির গতিবেগের কমতি নেই। হ্যাল্লিনে এসে ট্রেন থামলো; সার্জেণ্টদের একজন প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলো কিছু খাবারটাবার কিনতে। রশম্যান বললো যে ও আবার পায়খানায় যাবে। এফ.এস.এস.এর ভালমানুষ সার্জেণ্টটি ওর সঙ্গে সঙ্গে চললো শৌচালয়ের দ্বার পর্যন্ত। হ্যাল্লিন থেকে যখন ট্রেনটা ধীরে ধীরে রওনা দিলো, রশম্যান জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো তুষারাবৃত প্রান্তরে। দশ মিনিট পরে সার্জেণ্টরা দরজা ভেঙেছিলো, কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে খুব জোরে ছুটে চলেছে সালজবুর্গের উদ্দেশ্যে।

পুলিসী অনুসন্ধানের ফলে পরে জানা গিয়েছিলো যে তুষারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রশম্যান এসে পৌঁছেছিলো একটি কৃষকের কুটিরে।

সেখানেই সে আশ্রয় নিয়েছিলো সেইদিনটার মতো। পরদিন উত্তর অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে সালজবুর্গ প্রদেশে আসে; সেখানে এসে 'ছয়মাথা তারা'র দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা ওকে একটা ইটের ভাঁটিতে মজুরের কাজে লাগিয়ে দেয়। তারপর ওডেসার সঙ্গে সংযোগ করে, ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে।

সেই সময় ফরাসী বিদেশ ফৌজের রঙরুট দপ্তরের সঙ্গে ওডেসার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো, ফলে বহু ভূতপূর্ব এস.এস. সৈন্য সেখানে গিয়ে পালিয়েছিলো। ওদের সঙ্গে সংযোগ করবার চারদিন পর ফরাসী নাম্বার প্লেটওলা একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো অস্টারমিয়েটিঙ গ্রামের বাইরে। রশম্যান এবং অন্য পাঁচজন পলাতক নাৎসী এসে সেই গাড়িতে চড়লো। বিদেশফৌজের ড্রাইভারটির কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর ছিলো যা দিয়ে বিনা সার্চে গাড়ি সীমান্তঘাঁটি পেরিয়ে যেতে পারে। সেই ছজন এস.এস. ইতালির সীমানা দিয়ে ঢুকে মেরানোতে পৌঁছুলো। সেখানকার ওডেসার প্রতিনিধিটি ড্রাইভারটাকে যাত্রী-পিছু বেশ মোটা টাকা দিলো।

মেরানো থেকে রশম্যানকে নিয়ে আসা হলো রিমিনির অন্তরীণ শিবিরে। এইখানে শিবিরের হাসপাতালে তার ডান পায়ের পাঁচটা আঙুলই অ্যাম্প্যুট করা হয়, কারণ ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবার পর তুষারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওগুলো ফ্রস্টবাইটে পচে গিয়েছিলো। তখন থেকেই ও ডান পায়ে অর্থপেডিক জুতো পরে থাকে।

রিমিনি শিবির থেকে ওর বৌ ওর একটা চিঠি পায় অক্টোবর ১৯৪৮-এ। সেই প্রথমবার সে ওর নতুন নেওয়া নামটা ব্যবহার করে—ফ্রিৎজ বার্নড ওয়েগনার।

তার কিছুদিন পরেই ওকে রোমের ফ্রান্সিস্কান মোনাস্টেরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাগজপত্র ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর নেপলস বন্দর থেকে সে জাহাজে চড়ে বুয়েনস-আয়ার্সে রওনা হয়ে যায়। ভায়া সিসিলিয়ার মোনাস্টেরিতে যতদিন ছিলো, বেশ সুখেই ছিলো। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলো অনেক কমরেডদের, এস.এস. এবং নাৎসী পার্টির। বিশপ আলোয়া উদাল নিজে তাদের যত্নআত্তি করতেন, দেখতেন যেন তাদের কোন কিছুর

অভাব না ঘটে।

আর্জেন্টিনার রাজধানীতে এসে পৌঁছুলে ওডেসার তরফ থেকে রশম্যানকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।। তারাই ক্যালে ইপ্পোলিতো ইরিগয়েনে জনৈক জার্মান পরিবারের সঙ্গে তার থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। জার্মানটির নাম ছিলো ভিডমার। কয়েক মাস সেখানেই সে একটা সুসজ্জিত কক্ষে বসবাস করলো। ১৯৪৯-এর গোড়ার দিকে বর্ম্যান-তহবিল থেকে তাকে ৫০,০০০ আমেরিকান ডলার ধার দেওয়া হলো। সেই অর্থে সে রপ্তানি ব্যবসা খুললো, দক্ষিণ-আমেরিকার কাঠ পাঠাবে পশ্চিম-ইউরোপে। ফার্মের নাম হলো 'স্টেমলার ও ওয়েগনার', কারণ রোমের ভ্যাটিক্যান থেকে আনীত ঝুটা কাগজপত্তরের ফলে পাকাপাকিভাবে ওর নাম তখন হয়ে গেছে ফ্রিৎজ বার্নড ওয়েগনার, জন্ম ইতালির দক্ষিণ-তাইরল প্রদেশে।

সেক্রেটারি রাখলো একটি জার্মান মেয়েকে, ইর্মট্রউড সিগ্রিড ম্যুলের। ১৯৫৫-র প্রারম্ভে তাকে বিয়ে করলো, যদিও প্রথম বৌ হেলা তখনো জীবিত এবং গ্রাৎসে থাকতো। ১৯৫৫-র বসন্তকালে আর্জেন্টিনার ডিক্টেটরের স্ত্রী এবং সিংহাসনের মুল অধীশ্বর, ইভা পেরন ক্যান্সারে মারা গেলেন। পেরনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, রশম্যান তা বুঝলো। এবং পেরন গেলেই যে সে-দেশে প্রাক্তন-নাৎসীদের পাট উঠে যাবে তাও বুঝলো। নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে রশম্যান মিশরে চলে গেলো।

সেই বছরের গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটিয়ে শরৎকালে চলে এলো পশ্চিম-জার্মানীতে। কেউ কিছু জানতে পারতো না, যদি তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর ক্রোধ এসে না পড়তো তার ওপর। তার প্রথমা স্ত্রী হেলা রশম্যান গ্রাৎস থেকে তাকে একটা চিঠি লিখেছিলো বুয়েনস-আয়ার্সে ভিডমার পরিবারের ঠিকানায়। ততদিনে রশম্যান চলে গেছে, ভিডমারের কাছেও কোন ঠিকানা রেখে যায়নি। ভিডমার চিঠিটা খুলেছিলো। উত্তরে গ্রাৎসে হেলা রশম্যানকে জানিয়ে দিলো যে তার স্বামী জার্মানী ফিরে গেছে এবং তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করেছে।

তার বৌ তখন স্বামীর নতুন পরিচয় পুলিসকে জানালো। ফলে পুলিস রশম্যানের খোঁজখবর শুরু করে দিলো, একাধিক বিবাহের চার্জে। পশ্চিম-

জার্মানীর সর্বত্র ফ্রিৎজ বার্নড ওয়েগনার নামের জনৈক ব্যক্তির সন্ধানে তৎপর হলো তারা।

"পেয়েছিলো তাকে?" মিলার জিজ্ঞাসা করলো।

উইজেনথাল মুখ তুলে চাইলেন। "নাঃ, আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। নিশ্চয়ই আরেক দফা ঝুটা পরিচয়পত্রটত্র যোগাড় করেছিলো, এই জার্মানীতেই। সেইজন্যেই আমি বিশ্বাস করি যে টউবের ওকে দেখেও থাকতে পারে। জানা তথ্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে।"

"প্রথম বৌ কোথায়, হেলা রশম্যান?"

"সে এখনো গ্রাৎসে।"

"তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে লাভ হবে?"

মাথা ঝাঁকালেন উইজেনথাল।

"উহুঁ, মনে হয় না। একবার ফাঁস হয়ে গিয়েছে, অতএব রশম্যান তার ঠিকানা তাকে জানাবে না, নতুন নামও না। ওয়েগনার নামটা ফেঁসে যাওয়ায় নিশ্চয়ই প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলো, ভীষণ তাড়াতাড়ি নতুন করে আবার ঝুটা পরিচয় বানিয়ে নিতে হয়েছে।"

"সেইসব কাগজপত্তর তাকে কে বানিয়ে দিয়েছে?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"ওডেসা নিশ্চয়ই।"

"আচ্ছা, ওডেসা কি? রশম্যানের কাহিনী বলতে গিয়ে আপনি কয়েকবার এই নামটা নিলেন।"

"শোনেননি কোনদিন?" উইজেনথাল প্রশ্ন করেন।

"না, আজ পর্যন্ত শুনিইনি।"

চট করে ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিলেন উইজেনথাল।

"আচ্ছা, কাল সকালে আসুন, ওদের সব কথা আমি জানাবো।"

নয়

পরদিন সকালে পিটার মিলার আবার সিমন উইজেনথালের অফিসে এলো।

"বলেছিলেন যে আজ ওডেসা সম্বন্ধে বলবেন।···দেখুন একটা কথা কিন্তু আপনাকে আমি আগেই জানাবো ভেবেছিলাম, কাল ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে।"

ড্রিসেন হোটেলের ঘটনাটা বললো।···ডাঃ স্মিড্‌টের আগমন··· রশম্যানের অনুসন্ধান ছেড়ে দিতে বলা···তাকে সাবধান করে দেওয়া···সব সবিস্তারে জানালো।

ঠোঁট কামড়ে নীরবে শুনে গেলেন উইজেনথাল। শেষ হলে পরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "হুঁ! ওদের টনক নড়েছে দেখছি। কিন্তু সাধারণত তো ওরা এরকম করে না···সাংবাদিকদের এভাবে সতর্ক করে দেওয়া···আর এত শীগগিরই···উঁ-হুঁ!···রশম্যান তাহলে ওদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ···কি করছে সে, জানতে পারলে হতো!"

তারপর দু ঘণ্টা ধরে নাৎসী-শিকারীটি মিলারকে ওডেসা সম্বন্ধে বলে গেলেন। প্রতিষ্ঠানটার শুরু কিভাবে হয়েছিলো···চিহ্নিত এস.এস. অপরাধীদের নিরাপদ স্থানে গোপনে চলে যেতে সাহায্য করা থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ সেটা প্রাক্তন এস.এস. সদস্যদের এবং তাদের সাহায্যকারী ও সমর্থকদের একটা দুনিয়াজোড়া ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে পরিণত হয়েছে।

মিত্রশক্তি যখন ১৯৪৫ সালে ঝড়ের বেগে জার্মানীতে ধেয়ে এলো, তখন তাদের নজরে পড়লো একটার পর একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আর তাদের নানাবিধ পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের চিহ্নাবশিষ্ট। স্বভাবতই তারা জার্মান নাগরিকদের কাছ থেকে জানতে চাইলো কারা এইসব পাশবিকতা চালিয়েছিলো। সব জায়গা থেকে একই উত্তর এলো—'এস.এস.'। কিন্তু

কোথায় এস.এস., কোথাও তাদের চিহ্ন নেই। গেলো কোথায় তারা? তারা তখন হয় ডুব দিয়েছে জার্মানী বা অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন স্থানে, নয় তো বিদেশে পালিয়ে গেছে। যেখানেই যাক, তাদের আত্মগোপন কিন্তু তন্মাত্র ঘটনা নয়। মিত্রশক্তিরা তখন বুঝতে পারেনি (অনেক পরে বুঝেছিলো অবশ্য) যে প্রত্যেকটি লোক তাদের নিজের নিজের আত্মগোপনের পন্থা বহু আগে থেকেই অতি সযত্নে ছক কষে রেখে দিয়েছিলো।

এস.এস-এর তথাকথিত স্বাদেশিকতার এটা আরো একটা অদ্ভুত নিদর্শন যে তারা প্রত্যেকেই, হাইনরিখ হিমলার থেকে শুরু করে সবাই, নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নিখুঁত সব পরিকল্পনা করে রেখেছিলো; বাকি কোটি কোটি জার্মান মানুষ শত্রুদের হাতে মরুক বা বাঁচুক, কিচ্ছু এসে যায় না। আগে থাকতে সেই নভেম্বর ১৯৪৪-এরই, হাইনরিখ হিমলার সুইডিস রেড-ক্রশের কাউন্ট বার্নাদোতের মারফত নিজের নিরাপদ অবস্থানের চেষ্টা চালিয়েছিলো, কিন্তু মিত্রশক্তি তাকে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিলো। জার্মান জাতের উদ্দেশ্যে যখন নাৎসী ও এস.এস.এরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছিলো যে চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও যুদ্ধ, অমোঘ আশ্চর্য অস্ত্র এসে গেলো বলে, তখনই কিন্তু তারা দূর বিদেশে কোথাও আরামপ্রদ জীবনের সন্ধানে সবকিছু পরিকল্পনা করে রেখেছিলো। তারা তো জানতো আশ্চর্য অস্ত্রটস্ত্র বলে কিছু নেই; রাইখের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং হিটলার যদি কিছু করতে যায় তো সমগ্র জার্মান জাতিই যাবে লোপ পেয়ে।

পূর্ব-রণাঙ্গনে রুশদের বিরুদ্ধে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যেতে প্ররোচিত করা হয়েছিলো—জয়ের গৌরব অর্জন করবার জন্যে নয়, সময় পাবার জন্যে, যাতে এস.এস.রা তাদের নিজেদের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গড়ে নিতে পারে। সেনাবাহিনীর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছিলো এস.এস.এরা, কেউ এক পা পিছিয়ে এলেই গুলি করতো বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো; অথচ সামরিকবাহিনী তখন এমনভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছিলো সমর-ইতিহাসে যা অকল্পনীয়। হাজার হাজার জার্মান সৈন্য এইভাবে এস.এস.দের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলো।

এস.এস.এর পাণ্ডারা যখন জানতে পেরেছিলো যে পরাজয় অবধারিত, তখন থেকে লোকক্ষয় করে করে অযথা বিলম্ব ঘটিয়ে ছ মাস কাটিয়ে দিয়েছিলো ; কাজেই পরাজয় যখন এলো তখন তারা অদৃশ্য। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সব এস.এস. নায়কেরা তাদের পদ থেকে নীরবে সরে এসে বেসামরিক পোশাক পরে নিলো, নিখুঁতভাবে জাল-করা (সরকারী সূত্রেই) কাগজপত্র পকেটে পুরে জনস্রোতে ভেসে পড়লো। ১৯৪৫-এর মে মাসে জার্মানীর জনসাধারণ বলতে যাদের ছেড়ে এলো তারা হচ্ছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর দরজায় দরজায় কিছু বৃদ্ধ হোমগার্ড, যুদ্ধবন্দীর শিবিরে কিছু অবসন্ন ওয়েরম্যাখট (জার্মান সৈন্য) এবং ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া জার্মান শিশু বা নারী।

কুখ্যাতজনেরা বিদেশে পাড়ি জমালো ; কারণ তারা জানতো যে তারা এত সুপরিচিত যে বেশীদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না। ওডেসার কাজ শুরু হলো তখন। যুদ্ধসমাপ্তির অনতিপূর্বে এই প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছিলো, এদের কাজ ছিলো তখন অনুসন্ধিত এস.এস. নেতাদের জার্মানীর বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যেই জুয়ান পেরনের আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাদের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো; সাত হাজার ফাঁকা পাসপোর্টও সেই দেশ থেকে ইস্যু করে দেওয়া হয়েছে, ওয়াস্তা শুধু শরণার্থী যে কোন একটা মিথ্যা নাম তাতে ভরে নিজের ফটোগ্রাফ সেঁটে দেবে; আর্জেন্টিন কন্সাল চোখ বুজে সেটায় মোহর মেরে দেবার জন্যে সদাপ্রস্তুত, তারপরেই জাহাজে উঠে চলে যাও বুয়েনস-আয়ার্স বা মধ্যপ্রাচ্য।

হাজার হাজার এস.এস. ঘাতক অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে ইতালির দক্ষিণ-তাইরল প্রদেশে এসে পড়লো। রাস্তা জুড়ে বহু নিরাপদ আস্তানা ; একের পর এক সেগুলো বদল করে করে হয় ইতালির জেনোয়া বন্দরে নইলে আরো দক্ষিণে রিমিনি কিংবা রোমে আনা হলো তাদের। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান, যারা সত্যিই অনাথ-আতুরের সেবায় নিয়োজিত ছিলো, তারাও কিন্তু ওদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলো। কারণ যে কি তা তারাই জানে, তবে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কল্পনা করতে ভালবাসতো যে এস.এস. শরণার্থীদের সঙ্গে মিত্রশক্তি অযথাই খুব বেশী কঠোরতা অবলম্বন করেছে।

রোমে 'রক্তপুষ্প' নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা হাজার হাজার পলাতক এস.-এস.কে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রোমের জার্মান বিশপ আলোয়া উদাল। এস.এস. হত্যাকারীদের লুকিয়ে রাখবার প্রধান জায়গা ছিলো রোমের ফ্রান্সিস্কান মোনাস্টেরি। যতদিন না কাগজপত্তর ঠিকঠাক হয়ে উঠতো, ততদিন তাদের সেখানেই গোপনে রাখা হতো, তারপর তারা রওনা দিতো দক্ষিণ-আমেরিকার উদ্দেশ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে চার্চের হস্তক্ষেপে রেডক্রস থেকে দেওয়া ছাড়পত্রেও এস.এস.এরা ভ্রমণ করেছে, এবং সেই জাতীয় বহুক্ষেত্রেই টিকিট ভাড়াও দিয়ে দিয়েছে 'ক্যারিটাস' নামক দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

ওডেসার প্রথম কর্তব্য ছিলো এইটাই, সহস্র সহস্র এস.এস. হত্যাকারীকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া। যথেষ্ট কৃতকার্যও হয়েছিলো সে কাজে। কত হত্যাকারীকে যে তারা এরকমভাবে বিপন্মুক্ত করেছিলো তার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও, নির্ভুল অনুমান হলো যে অন্তত আশী শতাংশ মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধীদের তারা নিরাপত্তার মধুর-শরণে রেখে এসেছিলো।

অর্থের অভাব ছিলো না ওডেসার। গণহত্যার স্ফীত তহবিল তাদের নামে স্যুইস ব্যাঙ্কে। ফোর্থ রাইখ প্রতিষ্ঠা করবার আদি কল্পনা তাদের নেতারা অবাস্তব বলে ত্যাগ করেছিলো। ১৯৪৯-এর মে মাসে পশ্চিম-জার্মানী গণরাজ্যের যখন প্রতিষ্ঠা হলো, তখন তারা নিজেদের জন্যে পাঁচটা কর্তব্যের নতুন কর্মসূচী রাখলো।

প্রথমত নব জার্মানীর জনজীবনে প্রতিটি স্তরে প্রাক্তন নাৎসীদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে এবং পঞ্চাশ দশকে নাৎসীরা অবিরল অসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে আবার প্রবেশ করলো, আইনজীবীর ব্যবসায় ফিরে এলো, বিচারকের পদে এসে বসলো, পুলিসে ঢুকলো, স্থানীয় প্রশাসনে বা ডাক্তারদের সার্জারিতেও এলো। যতই নীচু পদ হোক, সেখান থেকেও তারা পরস্পরের স্বার্থরক্ষা করে চলতো ; কারো বিরুদ্ধে তদন্ত তল্লাশী বা গ্রেপ্তারের প্রশ্ন উঠলে নিপুণভাবে তা ঠেকিয়ে

রাখতো এবং বিশেষ করে প্রত্যেকেই ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে কোন সদস্যের (নিজেদের ওরা কামেরাড বলে সম্বোধন করে) বিরুদ্ধে কোন অনুসন্ধান বা অভিযুক্তির পালা শুরু হলে সেটাকে যতদূর সম্ভব শ্লথগতি বা নিরঙ্কুশ করে দেবার প্রচেষ্টায় রত হতো।

দ্বিতীয় কর্তব্য হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে গিয়ে কোন রকমে লিপ্ত হওয়া। উঁচুমহলগুলো এড়িয়ে, প্রাক্তন নাৎসীরা সরকারী দলের একেবারে নিম্নস্তরে গিয়ে যোগ দিলো…ওয়ার্ড বা কনস্টিট্যুয়েন্সির পর্যায়ে। প্রাক্তন নাৎসী হলে যে রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারবে না, এমন তো কোন আইন নেই। অতএব, বাধা ছিলো না কিছু। অবাক কাণ্ড এই যে দেখা গেছে আজ পর্যন্ত কোন লোক যে নাৎসী অপরাধীদের অনুসন্ধান বা বিচার নিয়ে পরম আগ্রহী, সে বিধানসভা বা বিধানপরিষদে কখনো নির্বাচিত হয়নি—কেন্দ্রেও নয়, প্রদেশেও নয়। ব্যাপারটা হয়তো নিছক কাকতালীয়, কিন্তু তা তো মনে হয় না। একজন রাজনীতিক তো খুব সহজ ভাষায় এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা হলো স্রেফ অঙ্ক। ষাট লক্ষ মৃত ইহুদী ভোট দেয় না, কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ প্রাক্তন নাৎসীরা ভোট দিতে পারে এবং প্রতি নির্বাচনে দিয়েও থাকে।'

দুটো কাজেরই উদ্দেশ্য ছিলো অত্যন্ত সরল: প্রাক্তন নাৎসীদের সম্পর্কে তদন্ত বা অভিযুক্তি হয় থামিয়ে দেওয়া নয়তো ধীরগতি করে দেওয়া। এই ব্যাপারে ওডেসার সুহৃদ ছিলো লক্ষ লক্ষ সাধারণ জার্মান মানুষের মনের বিবেকদংশন। অল্পবিস্তর সবাই ভাবতো আমরাও তো প্রকারান্তরে দায়ী। হয়তো কিছু সাহায্য করেছি, তা যত সামান্যই হোক, নইলে ঘটনাগুলো ঘটছে জেনেও তো চুপ করে ছিলাম, সেটাও তো একধরনের সহযোগ! বহু দিন, বহু বছর পরেও নাৎসী অপরাধগুলোর জোরদার তদন্ত-টদন্তের কথা শুনলে তাদের অনীহা জাগতো, ভয়—পাছে অনেক দূর দেশে কোন আদালতে যেখানে কোন নাৎসীর বিচার হচ্ছে সেখানে হয়তো নাম উঠবে অথচ এখন তো সে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কত গণ্যমান্য!

ওডেসার তৃতীয় কর্তব্য ছিলো যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে অনুপ্রবেশ। পঞ্চাশের গোড়ার দিকে কিছু প্রাক্তন নাৎসীকে

নিজেদের ব্যবসা খুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, টাকা এসেছিলো জুরিখ তহবিল থেকে। পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভে ব্যবসার বাজার ছিলো তেজী, যে-কোন সুব্যবস্থিত ব্যবসাই উন্নতি করতে পারতো। পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের অর্থনৈতিক ইন্দ্রজালের ছোঁয়ায় সেগুলো ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে হয়ে মস্ত বাণিজ্যগৃহে পরিণত হলো। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো লাভের অঙ্ক থেকে বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন-স্থান কিনে নিয়ে নাৎসী-অপরাধ সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোর মতামত প্রভাবান্বিত করা বা যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে যে সব এস.এস. প্রশিক্ষিত প্রচার-পুস্তিকা বেরুতো সেগুলোকে চালানো, অথবা কিছু গোঁড়া দক্ষিণপন্থী প্রকাশনা-ভবন খুলে রাখা, এবং সর্বোপরি ছিলো দুঃস্থ কামেরাডদের চাকরিবাকরি দেওয়া।

চতুর্থ কর্তব্য ছিলো যদি কোন নাৎসীর অভিযুক্তি কোনমতে রোধ না করা যায়, তবে বিচারচলাকালীন সময়ে তার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট আইনজীবী নিয়োগ করা। পরের দিকে তারা অবশ্য চমৎকার ফন্দী বার করেছিলো; প্রথমদিকে খুব সুদক্ষ এবং দামী উকিল নিযুক্ত করতো আসামী-পক্ষে, তারপর কয়েকটা শুনানির পর জানিয়ে দিতো যে উকিলকে দেওয়ার মতো টাকা নেই, তখন আদালত থেকে আইন অনুসারে সেই উকিলকেই আসামী পক্ষে কৌঁসুলি নিযুক্ত করা হতো। পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় এবং মাঝখানে যখন লাখ লাখ জার্মান যুদ্ধবন্দী রাশিয়া থেকে দেশে ফিরে এসেছিলো, তখন অ্যামনেস্টি-বহির্ভূত এস.এস. অপরাধীদের বেছে বেছে ফ্রিয়েডল্যাণ্ড শিবিরে নিয়ে রাখা হয়েছিলো। সেখানে শিবিরে তাদের মধ্যে সুন্দরীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো, যাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা করে ছোট্ট সাদা কার্ড। সেগুলোতে লেখা ছিলো আসামীদের প্রত্যেকের জন্যে নির্বাচিত উকিলের নাম।

পঞ্চম কর্মসূচী ছিলো প্রচার। নানানরকম তার ধরন। দক্ষিণপন্থী পুস্তিকা বিতরণে উৎসাহ জোগানো থেকে শুরু করে 'স্ট্যাটুট্যট অব লিমিটেশনস'-এর অন্তিম অনুমোদনের সপক্ষে জনমত তৈরি করা পর্যন্ত। শেষের কাজটা করতে পারলে নাৎসীরা আইনের চোখে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে, অপরাধগুলোর বিচার করবার সময়সীমা শেষ, সব তামাদি।

আজকের জার্মানদের বোঝানোর প্রবল চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে মৃত ইহুদী বা রাশিয়ান বা পোল বা অন্যান্যদের সংখ্যা মিত্রশক্তি-ব্যবহৃত সংখ্যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—ইহুদী মরেছে মোটে এক লাখ, এটাই বলা হয়ে থাকে। একথাও প্রচার করা হয় যে পশ্চিমী তুনিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে ঠাণ্ডাযুদ্ধ হচ্ছে সেটাই তো প্রমাণিত করে যে হিটলারই ঠিক ছিলেন।

তবে ওডেসা প্রচারযন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো আজকের পশ্চিম-জার্মানীর ছ কোটি জার্মানকে বোঝানো (বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছে) যে এস.এস.রাও ওয়েরম্যাখটের মতোই দেশপ্রেমিক সৈনিক এবং প্রাক্তন কমরেডদের মধ্যে ঐক্যসূত্র বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এটাই হলো ওদের সবচেয়ে অদ্ভুত পরিকল্পনা, অত্যন্ত কূট।

যুদ্ধের সময় ওয়েরম্যাখট কখনো এস.এস.দের সঙ্গে মাখামাখি করতো না, দূরে দূরেই থাকতো বরং। এস.এস.দের সম্বন্ধে তাদের ছিলো যথেষ্ট বিরূপ মনোভাব, আবার এস.এস.এরাও ওয়েরম্যাখটের সঙ্গে ঘৃণিত ব্যবহার করতো। লক্ষ লক্ষ ওয়েম্যাখটকে ওরা হয় মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিলো নয়তো রাশিয়ানদের কারাগারে, শুধু যাতে এস.এস.রা নিজেদের সুবিধা করে নিতে পারে, সময়মতো পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র আয়েশী জীবন কাটাতে পারে। কাজেই কি করে জার্মান আর্মি, নেভি বা এয়ারফোর্সের লোকেরা এস.এস.দের কামেরাড বলে গণ্য করতে পারে? বা তাদের তদন্ত বা বিচারের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে? অথচ, সেরকমই ঘটেছিলো, ওডেসার সেই সাফল্যের তুলনা নেই।

মোটকথা হলো যে, এস.এস. ঘাতকদের পশ্চিম-জার্মানীর পক্ষ থেকে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসবার প্রচেষ্টা যাতে সার্থক না হয় ওডেসার সেই চেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছে। সাফল্যলাভের কারণ তাদের সাংগঠনিক দৃঢ়তা, প্রয়োজনবোধে নিজেদের লোকেদের ওপরেও নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত মিত্রশক্তির কিছু ভুলভ্রান্তি, ঠাণ্ডা লড়াই, এবং জার্মানজাতের অদ্ভুত মানসিকতা যার ফলে সামরিক কর্ম বা অন্যান্য যে কোন বিশিষ্ট কর্তব্য যথা যুদ্ধোত্তর জার্মানীর পুনর্গঠনে তারা

প্রচণ্ড সাহসের অধিকারী হয়, কিন্তু নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই তারা সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলে কাপুরুষ হয়ে যায়।

সিমন উইজেনথাল তাঁর বিবরণ শেষ করতেই মিলার নোটবই নামিয়ে রাখলো। অনেক লিখেছে সে। চেয়ারে একটু ঠেস দিয়ে বসে বললো, "বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না আমার।"

"খুব কম জার্মানেরই আছে," উইজেনথাল বললেন, "ওডেসার নাম শুনেছেই বা কজন? জার্মানীতে তো ওই নাম নেওয়াই হয় না। যেমন মার্কিনী পাতালরাজ্যের কিছু কিছু লোক মাফিয়া বলে যে কিছু আছে সেই কথা স্বীকার করতে চায় না, তেমনি যে কোন প্রাক্তন এস.এস. ওডেসার অস্তিত্ব অস্বীকার করবে। নামটা অবশ্য এখন আগের মতো ব্যবহারও হয় না। এখন শুধু বলা হয় 'দি কমরেডশিপ', যেমন আমেরিকায় মাফিয়াদের এখন বলা হয় কোসা নস্ত্রা। কিন্তু নামে কি এসে যায়? ওডেসা এখনো আছে, এবং থাকবেও—যতদিন পূর্বতন কোন এস.এস. অপরাধী বেঁচে আছে।"

"এদের বিরুদ্ধেই কি আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে?" মিলার শুধালো।

"নিশ্চয়ই, কোন সন্দেহ নেই। বাড গোডেসবার্গে আপনাকে যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিলো সেটা ওদেরই কর্ম। সাবধানে থাকবেন, এরা বিপজ্জনক।"

মিলারের মন কিন্তু তখন অন্য কোথাও। "আচ্ছা, রশম্যান যখন ১৯৫৫-তে উধাও হয়ে গেলো, আপনি যে বললেন নতুন পাসপোর্টের দরকার হয়েছিলো তার?"

"নিশ্চয়ই।"

"কেন, পাসপোর্ট কেন?"

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে সিমন উইজেনথাল বললেন, "আপনার বিভ্রান্তির কারণটা আমি বুঝতে পারছি। দাঁড়ান, আমি আপনাকে বলছি। যুদ্ধের পর জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ায় হাজার হাজার লোক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, কোনরকম সনাক্তপত্র তাদের ছিলো না। কেউ

কেউ হয়তো সত্যি সত্যিই সেগুলো খুইয়েছিলো, আবার কেউ বা সেগুলো কোন কারণবশত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। নতুন করে বানাতে গেলে জন্ম-পত্রিকার দরকার হতো, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক তখন চলে এসেছে জার্মানীর সেই সব অঞ্চল থেকে যা রাশিয়ানদের অধীনে চলে গেছে। অতএব কে বলবে দরখাস্তকারী সত্যি সত্যিই পূর্বপ্রুশিয়ার সেই গণ্ডগ্রামে, যা সে দাবি করছে, সেখানে আদৌ জন্মেছিলো কি না? সে-অঞ্চল তো লৌহযবনিকার অনেক ভেতরে। অন্যান্য ক্ষেত্রে জন্ম-খতিয়ানগুলো আবার যে দালানে গচ্ছিত ছিলো সেই দালান কবে বোমার ঘায়ে ভেঙে গেছে।···সুতরাং পদ্ধতি খুব সহজ। শুধু দুটো সাক্ষীর দরকার; যারা বলবে, হ্যাঁ, লোকটা তার নাম যা বলছে, আসলে সে তাই। বাস্, নতুন ব্যক্তিগত সনাক্তপত্র ইস্যু হয়ে যাবে। যুদ্ধবন্দীদের কাছেও কোন কাগজপত্র থাকতো না। শিবির থেকে ছাড়া পাবার সময়, মার্কিন বা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুক্তিপত্র সই করে দিয়ে দিতো তাকে; তাতে লেখা থাকতো, ধরুন, করপোরাল জোহান শুম্যান যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে মুক্তি পেলো। সেই কাগজ নিয়ে সৈন্যটি চলে যেতো বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে, তারা তখন ওই নামে সনাক্তপত্র লিখে দিতো। কিন্তু অনেক সময়েই লোকটা আদিতে মিত্রশক্তির কর্তৃ-পক্ষের কাছে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে অন্য নাম বলেছে। জোহান শুম্যান হয়তো জোহান শুম্যান নয়, অন্য কেউ,—কেউ তো পরখ করে দেখেনি। লোকটা পেয়ে গেলো নতুন এক পরিচয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এরকমটাই চলছিলো; এস.এস. অপরাধীদের অধিকাংশই তখন নতুন নতুন নাম পেয়ে গিয়েছিলো এইভাবে। কিন্তু রশম্যানের মতো ব্যক্তি, যার মিথ্যা পরিচয়ের কথা এই সেদিন ১৯৫৫-তে চাউর হয়ে গিয়েছিলো, তার বেলায় কি হবে? সে তো আর কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে তখন বলতে পারে না যে আমি যুদ্ধের সময় কাগজপত্তর হারিয়ে বসে আছি। তারা তাহলে জিজ্ঞেস করবে, দশ বছর ধরে কি করছিলে, কোন্ নামে চালাচ্ছিলে? অতএব, তার প্রয়োজন একটা পাসপোর্টের।"

"এই পর্যন্ত তো বুঝলাম," মিলার বললো, "কিন্তু পাসপোর্ট কেন? ড্রাইভিং লাইসেন্স নয়, কেন বা একটা সনাক্তপত্র?"

"কারণ গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরেই জার্মান কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলো বহু লোক, হয়তো কয়েক হাজার, মিথ্যা পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা তখন ভেবে দেখলো যে ভালো করে পরীক্ষা-টরীক্ষা করে, তদন্ত করে, একটা পাকা পরিচয়পত্র যদি একবার দেওয়া যায় তাহলে সেটার ভিত্তিতে অন্যগুলো দিতে কোন অসুবিধা নেই। পাসপোর্টের পরিকল্পনা হলো এইভাবে। জার্মানীতে পাসপোর্ট বের করতে হলে, আগে আপনাকে জন্মপত্রিকা পেশ করতে হবে, কতগুলো পরিচিত ব্যক্তির নাম দিতে হবে, আরো কত দলিলপত্র। সবগুলো পরখ-টরখ করে তবে পাসপোর্ট দেয়।…অন্যদিকে আপনার যদি একবার পাসপোর্ট হয়ে থাকে, তার ভিত্তিতে যা খুশি তাই পেতে পারেন। আমলাতন্ত্রের মজাই তো এই। পাসপোর্টটা দেখলেই অফিসের বাবুটি ভাববেন যে আগেকার আমলারা যখন সব পরীক্ষাটরীক্ষা করে পাসপোর্ট ইস্যু করেছিলেন, তখন সব ঠিক আছে, আবার নতুন করে পরখ করার দরকার নেই। নতুন পাসপোর্ট হাতে আসামাত্র রশম্যান নিশ্চয়ই বাকি সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করিয়ে নিয়েছিলো—ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড। এখনকার জার্মানীতে সবরকম দলিলপত্র অনায়াসে পাবার মন্ত্র হচ্ছে আপনার পাসপোর্টখানা।"

"কিন্তু পাসপোর্টটা ওর আসবে কোত্থেকে?"

"ওডেসা থেকে। নিশ্চয়ই তাদের কাছে কোন জালিয়াত আছে যে বানিয়ে দেয়।" হের উইজেনথালের স্বর শুনে মনে হলো তাঁর কোনই সন্দেহ নেই এ বিষয়ে।

মিলার খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললো, "আচ্ছা, পাসপোর্ট জাল করে যে লোকটা, তাকে যদি কোনমতে খুঁজে বার করা যায়, তাহলে তো রশম্যানের এখনকার পরিচয় জানা যাবে।"

উইজেনথাল কাঁধ ঝাঁকালেন। "যেতে পারে, কিন্তু সে তো বহু দূরের পাল্লা। আর তা করতে হলে, ওডেসার ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হবে। এস.-এস. না হলে তো তা হবে না।"

"তাহলে? অতঃ কিম?"

"এক কাজ করতে পারেন, রিগা ক্যাম্প থেকে যদি কেউ ফিরে এসে থাকে তাকে ধরতে পারেন। জানি না আপনাকে সে সাহায্য করতে পারবে কি না, তবে গররাজি হবে না। আমরা সবাই তো রশম্যানকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।···দাঁড়ান—"

ডেস্কের ওপরে রাখা ডায়রিটার পাতা উলটে গেলেন।

"অলি অ্যাডলার নামে একটা মেয়ের কথা লেখা আছে দেখুন। রশ-ম্যানের সঙ্গে ছিলো সে যুদ্ধের সময়ে। ম্যুনিখের মেয়ে, হয়তো বেঁচে ফিরে এসেছে দেশে।"

মিলার জিজ্ঞেস করলো, "এসে থাকলে কোথায় নাম রেজিস্ট্রি করবে?"

"ইহুদী কম্যুনিটি সেণ্টারে। এখনো আছে সেটা। ম্যুনিখের ইহুদী সম্প্রদায়ের যাবতীয় ঠিকুজি রয়েছে সেখানে, মানে যুদ্ধের সময় থেকে। বাকি সব কবে ধ্বংস হয়ে গেছে।···সেখানে চেষ্টা করতে পারেন।"

"ঠিকানা আছে আপনার কাছে?"

ঠিকানার খাতাটা ওলটাতে ওলটাতে সিমন উইজেনথাল বললেন, "হ্যাঁ, এই যে, লিখে নিন।···রাইখেনবাখ স্ট্রাস, ২৭ নম্বর, ম্যুনিখ।"

মিলার ঠিকানাটা লিখে নেওয়ার পর উইজেনথাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সলোমন টউবেরের ডায়রি বোধহয় ফেরত চান?"

"হ্যাঁ,···নিয়ে যেতে চাই।"

"ইস! রাখতে পারলে হতো। কি অদ্ভুত ডাইরি!"

উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দরজা পর্যন্ত মিলারের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। "আচ্ছা, গুড লাক,···জানাবেন কদ্দুর কি হয়।"

সে রাতে মিলার গোল্ডেন ড্রাগনে গিয়ে ডিনার খেলো। বনেদী হোটেল, সেই ১৫৬৬ সাল থেকে চলছে। মনে সন্দেহ জাগে রিগা-প্রত্যাগত কাউকে পাবে কি না, পেলেও রশম্যানের অনুসন্ধানে কতখানি সাহায্য করতে পারবে তাতে কি নিশ্চয়তা! তবু চেষ্টা করতে হবে, আশা বলে কথা।

পরদিন সকালে ম্যুনিখের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো

দশ

ম্যুনিখে এসে পৌঁছলো ৮ই জানুয়ারির মাঝসকালে। শহরে ঢোকার মুখে খবরের কাগজের দোকান থেকে ম্যুনিখের রাস্তার একটা ম্যাপ কিনে নিয়েছিলো। সেই ম্যাপ দেখে দেখে অনায়াসে ২৭ নম্বর রাইখেনবাখ স্ট্রাসে এসে পৌঁছুলো। গাড়ি রেখে ইহুদী কম্যুনিটি সেণ্টারের দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। পাঁচতলা বাড়ি, সামনের দিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। নীচ-তলার বাইরেটা শুধু সিমেণ্টের পলেস্তারা লাগানো, কোনরকম চুনকাম বা রঙ ফেরানো নেই। দালানের ওপরে লাল টালির ছাদ, পাঁচতলায় সারি-সারি জানলা। নীচতলার বাঁ প্রান্তে কাঁচের ডবল দরজা।…দালানের ভেতরে নীচতলায় আছে একটা সনাতনী ইহুদী গোস্ত-কাবাবের দোকান, ম্যুনিখ শহরে এধরনের 'কোশের রেস্তোরাঁ' আর দ্বিতীয়টি নেই। দো-তলায় আবাসী বৃদ্ধদের আড্ডাখানা, তিনতলায় অফিস আর দপ্তর, চারতলা আর পাঁচতলায় অতিথি-আলয় আর যারা এখানে থাকে সেই অসহায় বৃদ্ধদের শয়নকক্ষ। পেছনদিকে আছে একটা সিনাগগ।

গোটা দালানটা ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০-এ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়ে-ছিলো। ছাত থেকে পেট্রোল-বোমা ফেলা হয়েছিলো। ধোঁয়াতে দম বন্ধ হয়ে সাতজন মারা গিয়েছিলো। সিনাগগে স্বস্তিকা-চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছিলো।…

তিনতলায় উঠে মিলার এনকোয়ারি-ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

অপেক্ষা করতে করতে ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সার সার বই, সব ঝকঝকে নতুন। পুরনো লাইব্রেরি তো সেই কবে নাৎসীরা পুড়িয়ে ফেলেছে। লাইব্রেরির তাকগুলোর মাঝখানে, দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে, ইহুদী সম্প্রদায়ের গুরুও যাজকদের ছবি ঝুলছে। ঘন দাড়ি-গোঁফের ওপর দিয়ে তাঁদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ফ্রেমের মধ্যে থেকে। চেহারাগুলো ঠিক পাঠ্যবইয়ে ছাপা ধর্মগুরুদের ছবির মতো। কারো কারো কপালে আবার কবচ বাঁধা, সকলেরই মাথায় হ্যাট।

একটা তাক ভর্তি খবরের কাগজ, কিছু জার্মান বাকি সব হিব্রু। ইস্রায়েল থেকে আসে বলেই মনে হলো। একটা বেঁটেখাটো কালচে চামড়ার মানুষ একটা হিব্রু খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা পরম মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলো।···

"আপনার জন্যে কিছু করতে পারি?"

প্রশ্নটা শুনেই চোখ ফিরিয়ে মিলার তাকালো এনকোয়ারি-ডেস্কের দিকে। এতক্ষণ যে আসনটা খালি ছিলো, সেখানে এখন এসে বসেছে একটি চল্লিশোর্ধ্বা মহিলা, ঘন কালো চোখের তারা তার। চোখের ওপরে ক্ষণেক্ষণেই তার একগোছা চুল এসে পড়ে, মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে সেটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে দেয়।

মিলার তার অনুরোধটা জানালো: অলি অ্যাডলার কি যুদ্ধের পরে ম্যুনিখে ফিরেছিলো, তার কোন খোঁজখবর পাওয়া কি সম্ভব?

"কোত্থেকে তার ফেরার কথা?" জিজ্ঞাসা করলো মহিলা।

"ম্যাগডেবুর্গ থেকে। তার আগে স্টুটহফ, তার আগে রিগা।"

"ওমা, রিগা!" স্ত্রীলোকটি যেন আর্তধ্বনি করে উঠলো। "না, রিগা থেকে ফিরেছে এমন কারো নাম আমাদের তালিকায় আছে বলে মনে হয় না। তারা সবাই···উবে গেছে···জানেন তো। তবু আমি দেখছি, দাঁড়ান।"

পেছনের ঘরে চলে গেলো। মিলার ওখান থেকেই দেখতে পেলো যে নামের সূচী খুঁজে খুঁজে দেখছে সে। এমন কিছু বড় তালিকা নয়, পাঁচ মিনিটেই ফিরে এলো। বললো, "নাঃ, পেলাম না। ও নামের কেউ নেই।"

'ওঃ!" মিলার বললো, "কি আর করা যাবে তাহলে! আচ্ছা,··· দুঃখিত, শুধু-শুধু আপনাকে হয়রান করলাম।"

"না না, তাতে কি। আপনি এক কাজ করুন বরং," মহিলা জানায়, "আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান সংঘে খোঁজ নিন, নিরুদ্দিষ্ট লোকদের খোঁজখবর নেওয়া আসলে ওদেরই কাজ। গোটা জার্মানীর সব জায়গার লোকদের তালিকা আছে ওদের কাছে, আর আমাদের কাছে তো আছে শুধু যারা ম্যুনিখ থেকে চলে গিয়েছিলো, পরে ফিরে এসেছে।"

"কোথায় সেটা ?" মিলার প্রশ্ন করে।

"আরোলসেন-ইন-ওয়ালডেকে। হ্যানোভারের ঠিক বাইরে, লোয়ার স্যাক্সনিতে। রেডক্রশ থেকে চালানো হয়।"

মিলার একমুহূর্ত ভাবলো।

"আচ্ছা, ম্যুনিখে কি এমন কেউই আসেনি যে রিগাতে ছিলো ? আমি আসলে তখনকার কমাণ্ড্যাণ্টের কিছু খোঁজখবরের চেষ্টা করছি।"

ঘরে নীরবতা ছেয়ে গেলো। মিলার বুঝতে পারে খবরের কাগজ পড়ছিলো যে লোকটা সে চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। স্ত্রীলোকটিও যেন দমে গেলো।

"থাকতে পারে, বলতে পারছি না। যুদ্ধের আগে, এখানে এই ম্যুনিখে প্রায় ২৫,০০০ ইহুদী ছিলো। মাত্র তার দশভাগের একভাগ ফিরে এসেছিলো। এখন আবার আমাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার অর্ধেকই ১৯৪৫-এর পরে জাত। রিগাতে ছিলো এমন কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাহলে আমাকে আবার প্রথম থেকে পুরো তালিকা দেখতে হবে, যারা ফিরে এসেছে তাদের সবায়ের নামধাম। প্রত্যেকের নামে নামে তাদের শিবিরগুলোর নামও তো দেওয়া আছে।… কাল আসতে পারবেন আপনি ?"

মিলার উত্তর দিতে দেরি করে। বুনো হাসের পেছনে অনর্থক ছোটাছুটি করে বোধহয় লাভ নেই। তবু বলে, 'বেশ, কাল আসবো আমি।… ধন্যবাদ।"

রাস্তায় বেরিয়ে পকেট হাতড়ে গাড়ির চাবি খুঁজছিলো, পেছনে শুনলো কার পদশব্দ।

"মাপ করবেন…"

ঘুরে তাকায় মিলার। ওহো, সেই লোকটা যে খবরের কাগজ পড়ছিলো।

"আপনি, শুনলাম রিগার খোঁজখবর নিচ্ছেন…সেখানকার কমাণ্ড্যাণ্টের ? কার সম্বন্ধে—ক্যাপ্টেন রশম্যান কি ?"

"হ্যাঁ তাই," মিলার বললো, "…কেন ?"

"আমি রিগাতে ছিলাম, রশম্যানকেও চিনি। হয়তো আমি আপনার কাজে আসতে পারি।"

লোকটা বেঁটেমতন, গিঁটপাকানো চেহারা। বয়স প্রায় মধ্যচল্লিশ, চকচকে বোতামের মতো বাদামী চোখ। তাকে দেখে মনে হয় যেন ভিজে চড়ুয়ের মতো বিপর্যস্ত।

বললো, "আমার নাম মর্ডেচাই, কিন্তু লোকে ডাকে মোট্টি বলে।··· আসুন না, কফি খেতে খেতে একটু আলোচনা করা যাক।"

কাছাকাছি একটা কফিখানায় এসে ওরা ঢুকলো। সঙ্গীটির অনর্গল বকবকমে মিলার গলে যায়। গোটা কাহিনী তাকে বলে; আলটনার গলি থেকে আরম্ভ করে ম্যুনিখের কম্যুনিটি সেণ্টার পর্যন্ত সমস্ত। লোকটা নীরবে শুনে যায় শুধু, মাঝেসাঝে কখনো-কখনো ঘাড়ফাড় নাড়ায় কিন্তু ওই পর্যন্তই. কথাটিও বলে না।

মিলারের কথা শেষ হলে তখন বললো, "বাব্বাঃ! অভিযান বটে একখানা।···কিন্তু আপনি জার্মান হয়ে রশম্যানকে কেন খুঁজে বের করতে চান?"

"কিছু এসে যায় তাতে?···দেখুন মশাই এই প্রশ্নটা এতবার আমাকে করা হয়েছে যে এখন এটা আমার স্নায়ুর ওপরে গিয়ে উঠবে। কয়েক বছর আগে যেসব কাণ্ড হয়েছিলো তাতে কি কোন জার্মান রাগও করতে পারে না?"

শূন্যে হাতফাত ছুঁড়লো মোট্টি। "না, তা নয়। তবে একটু অসাধারণ।··· যাকগে, রশম্যান যে ১৯৫৫-তে আবার গায়েব হয়ে গেলো, তা আপনার কি ধারণা তার ঝুটা পাসপোর্ট ওডেসা বানিয়ে দিয়েছিলো?"

"তাই তো আমাকে বলা হলো," মিলার বললো, "আর শুনলাম সেইসব কাগজ জাল হয় কোঁথায় সে-খবর নাকি ওডেসার ভেতরে না ঢুকলে জানা যাবে না।"

জার্মান যুবকটির দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মোট্টি। অবশেষে বলে, "কোন্ হোটেলে উঠেছেন আপনি?"

কোন হোটেলে ওঠেনি এখনো, বিকেল তো গড়ায়নি। তবে গতবার

এসে একটা হোটেলে উঠেছিলো, সেখানে খোঁজ করবে ভাবছে।…মোট্রির অনুরোধে কফিখানার টেলিফোন থেকে সেই হোটেলে খবর করলো টেবিলে ফিরে এসে দেখে মোট্রি চলে গেছে। কফির কাপের তলায় একটা ছোট্ট চিঠি চাপা দিয়ে রেখে গেছে। পড়ে দেখলো লেখা আছে ঃ 'ঘুর পান কি না পান, ওই হোটেলের লাউঞ্জে আজ রাত আটটার সময় থাকবেন।'

কফির দাম চুকিয়ে মিলার বেরিয়ে এলো।

সেই বিকেলেই ওয়েরউলফ তার ওকালতী সেরেস্তায় বসে বন থেকে পাঠানো তার সতীর্থের বার্তাটা আরেকবার পড়েছিলো। সতীর্থ হলো সেই লোকটি যে এক সপ্তাহ আগে ডাঃ শ্মিড্ট্ নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো মিলারের কাছে।

বার্তাটি এসেছিলো পাঁচদিন আগে কিন্তু ওয়েরউলফ স্বভাবতই খুব সাবধানী, তাই অপেক্ষা করেছিলো এই কয়েকদিন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে আবার বিবেচনা করে দেখতে চেয়েছিলো।

গত নভেম্বরে মাদ্রিদে তার ঊর্ধ্বতন কর্তা জেনারেল গ্ল্যুকস শেষ যে কটি কথা তাকে বলে গিয়েছিলো তাতে আর সিদ্ধান্ত নেবার বিশেষ স্বাধীনতা তার রইলো কই? তবু অধিকাংশ কলমবাজের মতো তারও সেই স্বভাব —অবধারিতকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা যাক…তাড়া কিসের?…শেষ আদেশের ভাষা ছিলো—'স্থায়ী সমাধান'; তার অর্থ অতি পরিষ্কার, সন্দেহের অবকাশ নেই। ডাঃ শ্মিড্টের পাঠানো বিবরণের ভাষাও অত্যন্ত স্পষ্ট, অন্য কোন প্রশ্নই জাগে না। সেই বার্তার ভাষা অনুসারে… '…যুবকটি ভীষণ জেদী, একরোখা, হয়তো তেমনি গোঁয়ার। ওই বিশেষ কামেরাডটির প্রতি, অর্থাৎ এডুয়ার্ড রশম্যানের ওপর তার ভয়ানক আক্রোশ —প্রায় ব্যক্তিগত ক্রোধ; কিন্তু কেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। যুক্তি শুনতে চায় না মোটেই, নিজের ক্ষতি হলেও পরোয়া নেই…'

ডাক্তারের বক্তব্য আরো একবার পড়ে দেখে ওয়েরউলফ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেলিফোন তুলে নেয়। সেক্রেটারি হিলডার কাছ থেকে বাইরের লাইন চেয়ে নিয়ে ডুসেলডর্ফের নম্বর ঘোরায়।

কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে শুধু কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "হ্যাঁ।"

ওয়েরউলফ বলে, "হের ম্যাকেনসেনের জন্যে ফোন।"

প্রশ্ন হলো, "কে চায় তাকে?"

সরাসরি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওয়েরউলফ তার পরিচয়-সঙ্কেতের প্রথমাংশ জানিয়ে দিলো, "মহান ফ্রেডরিকের চেয়ে কে বড়?"

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, "বার্বারোসা।" সামান্য বিরতি দিয়ে কণ্ঠস্বরটা বলে উঠলো, "আমিই ম্যাকেনসেন।"

"ওয়েরউলফ," ওডেসার নেতা জানালো। "ছুটি শেষ হয়ে গেলো বোধহয়। কাজ করবার আছে। কাল সন্ধ্যেবেলায় এখানে এসো।"

"কখন?"

"দশটায় এসো। আমার সেক্রেটারিকে বোলো যে তোমার নাম কেলার। ওই নামে কারো সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার আগেই লেখা থাকবে।" ফোন নামিয়ে রাখলো ওয়েরউলফ।

ডুসেলডর্ফে তার ফ্ল্যাটবাড়িতে ফোন রেখে দিয়ে ম্যাকেনসেন উঠে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলো। বিশাল দৈত্যের মতো চেহারা, আগে এস.এস.এর ডাসরাইখ ডিভিসনের সার্জেন্ট ছিলো। তুলে এবং লিমোগেতে, সেই ১৯৪৪ সালে, ফরাসী বন্দীদের ধরে ধরে ফাঁসিতে লটকিয়ে মানুষ-খুনে হাত পাকিয়েছিলো।

যুদ্ধের পর ওডেসার হয়ে ট্রাক চালিয়ে মানুষ নিয়ে যেতো জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইতালির দক্ষিণ-তাইরলে। ১৯৪৬ সালে একবার এক মার্কিনী রক্ষীগাড়ি সন্দেহবশে তার গাড়ি থামায়। তখন সে একা জীপের চারজন আরোহীকে খতম করে, দুজনকে তো শুধু খালি হাতে। তারপর থেকেই ও ফেরারী। তারপর ওডেসা থেকে তাদের উঁচুমহলের কর্তাব্যক্তিদের জন্যে ওকে শরীররক্ষী নিযুক্ত করা হলো। মুখে মুখে তার ডাকনাম ছড়িয়ে গেলো, 'ম্যাক-চাকু'। অথচ অদ্ভুত, কোনদিন ও চাকু চালায়নি; তার লোহার মতো হাত দুটোই যথেষ্ট শিকারের ঘাড় ভেঙে ফেলতে বা টুঁটি টিপে মারতে।

কর্মকর্তারা ধীরে ধীরে বেজায় খুশী হয়ে উঠলো, ম্যাক থাকতে ভয় কি! মধ্যপঞ্চাশে ওডেসার প্রধান-ঘাতক হয়ে দাঁড়ালো সে। বাইরের লোকই হোক বা ভেতরের কোন অন্তর্ঘাতীই হোক, ম্যাক নিঃশব্দে বিনা বিচারে কাজ সেরে দিতো। ১৯৬৪-র জানুয়ারি পর্যন্ত এই ধরনের অন্তত বারোটা কাজ সে নির্বিঘ্নে সমাধা করেছিলো।

কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় আহ্বান এলো। আপ্যায়নের কেরানীটি ফোন ধরেছিলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আবাসিকদের লাউঞ্জের দিকে, যেখানে মিলার বসে বসে টেলিভিশন দেখছিলো।

ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো মিলার।

"হের মিলার? আমি মোট্টি কথা বলছি। আপনাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে। মানে, আমার কিছু বন্ধু আছে যারা পারবে। দেখা করবেন তাদের সঙ্গে?"

মিলার অপ্রসন্ন হয়, এত ষড়যন্ত্র কৌশল-টৌশল মোটেই ভালো লাগে না তার। তবু বললো, "আমাকে যে সাহায্য করতে পারবে তার সঙ্গেই দেখা করতে রাজী আছি।"

"বেশ। তাহলে হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে শিলার স্ট্রাস ধরে আসুন। দুটো দালান পেরিয়ে ওই ধারেই দেখবেন একটা কফি-কেকের দোকান—নাম লিণ্ডম্যান। ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করুন।"

"কখন, এখুনি?" মিলার শুধালো।

"হ্যাঁ, এক্ষুনি। আপনার হোটেলেই আসতাম আমি কিন্তু সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবেরা রয়েছে। এক্ষুনি চলে আসুন।"

ফোন বন্ধ হয়ে গেলো। মিলার তার কোট তুলে নিয়ে হোটেলের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাঁ দিকের রাস্তায় পড়ে ফুটপাত ধরে চলে। হোটেল থেকে অল্প খানিকটা আসতেই পেছন থেকে হঠাৎ শক্ত-মতন কি একটা এসে তার বুকের খাঁচায় ধাক্কা মারে। একটা গাড়ি এসে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ায়। কানের কাছে ফিসফিসিয়ে কে বলে ওঠে, "পেছনের সীটে গিয়ে বসুন, হের মিলার।"

হুট করে গাড়ির দরজা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের লোকটা আবার খোঁচা মারে মিলারের বুকে। পিছলে সরে গিয়ে মাথা নামিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো মিলার। সামনে শুধু চালক বসে আছে। পেছনের সীটে আরো একজন লোক ছিলো, সে সরে বসে মিলারের জন্যে জায়গা করে দেয়। বুঝতে পারে যে ফুটপাতে যে লোকটা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো, সেও এসে এই গাড়িতে বসলো। সশব্দে দরজা বন্ধ হতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো।

মিলারের বুকে তখন হাপরের টান উঠেছে। গাড়ির লোক তিনটের দিকে তাকিয়ে দেখে কিন্তু কাউকেই চিনতে পারে না। তার ডান পাশের লোকটা বলে ওঠে, "চোখ বেঁধে দিচ্ছি আপনার, কোথায় যাচ্ছেন তা বুঝতে দিতে চাই না।"

হঠাৎ পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেলো মিলারের চোখে। বুঝতে পারলো মাথার ওপর দিয়ে নাক পর্যন্ত একটা কালো মোজা সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ড্রিসেন হোটেলের লোকটার ঠাণ্ডা সরীসৃপ চোখ ছুটো মনে পড়ে যায়। অজান্তেই ভিয়েনার সেই সতর্কবাণীও মনে পড়ে, 'সাবধানে থাকবেন, ওডেসার লোকেরা বিপজ্জনক।' তারপর চকিতে মোট্টির মুখ ভেসে ওঠে। অবাক হয়ে ভাবে, ওদেরই একজন কি করে ইহুদী কম্যুনিটি সেণ্টারে গিয়ে হিব্রু কাগজ পড়ে!

পঁচিশ মিনিট ধরে গাড়ি চললো। তারপর গতি কমিয়ে ক্রমে থেমে গেলো। কতগুলো গেট-টেট খোলার আওয়াজ হয়। আবার গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে একেবারে থামলো। পেছনের সীট থেকে ওকে সাবধানে নামিয়ে দেওয়া হয়। ছুজন লোক ছুধার থেকে ওকে ধরে ধরে আঙিনা পার করিয়ে দেয়। মুহূর্তের জন্যে মুখের ওপর খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগে কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তা মিলিয়ে যায়। পেছনে একটা দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। ধরে ধরে ওকে সিঁড়ি নামিয়ে নিয়ে চললো বোধহয় কোন ভূতলকক্ষে। কিন্তু বাতাস বেশ গরম, ওকে বসিয়ে দেওয়া হলো যে চেয়ারে সেটাতেও নরম গদি।

শুনলো, কে যেন বলছে, 'ব্যাণ্ডেজ খুলে দাও।' মাথা থেকে মোজা-

টাকে টেনে খুলে নেওয়া হলো। দু-চারবার চোখ পিটপিট করে আলোতে দৃষ্টি সইয়ে নিলো মিলার।

ঘরটা মাটির নীচে তা বোঝা যায়, কারণ জানলাটানলা নেই। দেওয়ালে একটা উঁচু জায়গা থেকে এয়ার-এক্সট্র্যাক্টরের একটানা গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ আসছে। বেশ সুসজ্জিত কক্ষ, আরামদায়কও বটে। মনে হয় সভাটভা বসে এখানে, কারণ ওদিককার দেওয়ালের কাছে একটা লম্বা টেবিল আর আটটা চেয়ার সাজানো। বাকি অংশ খোলামেলা, পাঁচটা আরামকুর্শি শুধু এদিক-ওদিক ছড়ানো। মাঝখানটায় একটা গোল কার্পেট আর একটা কফি-টেবিল।

লম্বা টেবিলের পাশে মোট্টি দাঁড়িয়ে ছিলো ; মুখে তার শান্ত মৃদু হাসি, যেন ক্ষমা চাইবার বিনীত ভঙ্গী। যে দুটো লোক ওকে নিয়ে এসেছিলো তারা ওর চেয়ারের দু হাতলের ওপর বসেছে ; দুজনেই বেশ সবল সুপুষ্ট, মধ্যবয়সী। ঠিক ওর সামনে, কফি-টেবিল ছাড়িয়ে, একটা চেয়ারে বসে আছে চতুর্থ ব্যক্তি। মিলার ভাবলো গাড়িচালক বোধহয় ওপরেই রয়ে গেছে, বন্ধছন্ধ করার জন্যে।

বোঝা যাচ্ছে চতুর্থ ব্যক্তিই নেতা। অনায়াস ভঙ্গীতে সে চেয়ারে বসে আছে। বয়স মনে হয় ষাটের কোঠায় ; একহারা শুকনো চেহারা, গরুড়ের মতো নাক, গাল দুটো তোবড়ানো। কিন্তু চোখ দুটো দেখে অস্বস্তি জাগে মিলারের। গভীর গর্তে বসানো দুটো বাদামী চোখ, কিন্তু কি উজ্জ্বল, যেন দুটো তীক্ষ্ণ শাণিত ফলা, একেবারে উন্মত্ত খ্যাপাটে দৃষ্টি। সেই লোকটিই প্রথমে নীরবতা ভাঙলো।

"সুস্বাগতম্, হের মিলার। আমার বাড়িতে আপনাকে এমন অদ্ভুত উপায়ে নিয়ে আসা হলো বলে ক্ষমা চাইছি। অবশ্য এর কারণ হলো আমি যে প্রস্তাব করবো সেটাতে যদি আপনি রাজী না হন, তবে আপনাকে আবার আপনার হোটেলে আমরা ফিরিয়ে দিয়ে আসবো, জীবনে আর কোনদিন আমাদের সাক্ষাৎ পাবেন না।"

মোট্টির দিকে দেখিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, "আমার এই বন্ধুটি আমাকে জানিয়েছে যে কোনো কারণে আপনি জনৈক এডুয়ার্ড রশম্যানের

অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। এবং তার আরো কাছে আসবার জন্যে আপনি ওডেসার অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়তে রাজী আছেন। কিন্তু সেরকম কিছু করতে হলে আপনার পক্ষে অন্যের সাহায্য দরকার। অনেক সাহায্য। তবে আপনাকে ওডেসার ভেতরে ঢোকাতে পারলে আমাদেরও কিছু লাভ আছে। সেইজন্যে আমরা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারি। বুঝলেন কথাটা?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মিলার। "মানে? বলতে চান আপনারা ওডেসার লোক নন?"

আকাশে ভুরু তোলে লোকটা। "সে কি!…হায় ঈশ্বর! আপনি যে দেখছি লাঠির উল্টোদিকটা পাকড়ে বসে আছেন!"

সামনে ঝুঁকে বাঁ হাতের আস্তিন তুলে দেখায়। কনুইয়ের পাশে নীলচে উল্কি দিয়ে দগদগে একটা নম্বর খোদাই করা।

সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, "অউসউইৎস।" মিলারের দু পাশের লোক দুটোকে দেখিয়ে জানালো, "বুখেনওয়াল্ড আর ডাচাউ।" মোট্টিকে দেখিয়ে বলে, "রিগা ও ত্রেব্লিঙ্কা।"

আস্তিন নামিয়ে বললো, "হের মিলার, কেউ কেউ ভাবে যে আমাদের লোকদের যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার হওয়াই উচিত। আমরা কিন্তু তাদের সঙ্গে সহমত নই। যুদ্ধের ঠিক পরে পরে আমি একজন ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তা থেকেই আমার জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমার জাতের ষাট লক্ষ লোককে যদি ওরা হত্যা করতো তো আমিও করোটির স্তম্ভ বানিয়ে তুলতাম। কনসেনট্রেশন শিবিরে যারা মরেছে তাদের করোটি দিয়ে নয়, যারা তাদের সেখানে রেখেছিলো তাদের।' সরল যুক্তি, হের মিলার, কিন্তু অকাট্য। আমি ও আমার দলের লোকেরা তখন, সেই ১৯৪৫ সালে মনস্থির করে ফেললাম যে জার্মানীর ভেতরেই থাকবো—উদ্দেশ্য আমাদের একটিই, প্রতিহিংসা; সরল নির্ভেজাল প্রতিহিংসা। আমরা তাদের গ্রেপ্তার করি না, হের মিলার, আমরা তাদের কীটের মতো টিপে টিপে মারি। আমার নাম লিওঁ।"

চার ঘণ্টা ধরে মিলারকে জেরা করে তবে লিওঁ সন্তুষ্ট হলো যে, নাঃ, রিপোর্টারটির উদ্দেশ্য খাঁটি। অন্যদের মতো তারও মনে প্রথমে খটকা লেগেছিলো। কিন্তু পরে মিলারের বক্তব্য শুনে ভেবে দেখলো যে হতেও পারে, যুদ্ধের সময় এস.এস.এরা যেসব অমানুষিক কাণ্ড করেছে তাতে ঘৃণা জাগা কিছু অস্বাভাবিক নয়।···মিলারের কথা শেষ হয়ে গেলে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে লিওঁ তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে দেখলো। তারপর একসময়ে প্রশ্ন করলো, "ওডেসার ভেতরে ঢুকতে গেলে কতখানি বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে তা আপনি জানেন, হের মিলার ?"

"অনুমান করতে পারি। তবে আমার বয়স যে অনেক কম—"

"আপনার নিজের নামে এস.এস. সাজবার কল্পনাও করবেন না। কারণ প্রত্যেকটা ভূতপূর্ব এস.এস.এর বিবরণ আছে ওদের কাছে এবং তাতে কোন পিটার মিলারের উল্লেখও নেই। তাছাড়া, অন্ততপক্ষে দশ বছর বয়স বাড়িয়ে ফেলতে হবে আপনাকে। করা যায় অবশ্য, তবে নতুন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিচয় আপনাকে নিতে হবে। এবং কাল্পনিক নয়, সত্যিকারের পরিচয়, এমন একজন লোকের পরিচয় যার অস্তিত্ব ছিলো এবং যে এস.এস.এর সদস্যই ছিলো কোনদিন। সেটা করতেই তো রীতিমত গবেষণা করতে হবে আমাদের ; বহু পরিশ্রম এবং সময়ও লাগবে তার পেছনে।"

"কি মনে হয় আপনার ? পাওয়া যাবে তেমন কোন লোকের সন্ধান ?" মিলার শুধায়।

লিওঁ কাঁধ ঝাঁকায়। "কে জানে ! তাকে আবার এমন একজন লোক হতে হবে যার মৃত্যুর সংবাদ যাচাই করেও জানা যাবে না। ওডেসা আপনজন বলে কাউকে স্বীকার করে নেবার আগে তার সম্বন্ধে সমস্ত রকম সম্ভাব্য তথ্য যাচাই করে নেয়। আপনাকে তাদের সব পরীক্ষাগুলোও পাস করতে হবে। তার মানে আপনাকে কোন প্রাক্তন এস.এস.এর সঙ্গে পাঁচ-ছ সপ্তাহ কাটাতে হবে, যে আপনাকে তাদের লোকগাথা, কথা বলার ধরন, বিশেষ বিশেষ সূত্রসংজ্ঞা, রীতিপ্রকৃতি, সবকিছু শিখিয়ে দেবে। ভাগ্য ভালো, এরকম একটা লোক আমাদের জানা আছে।"

মিলার বিস্মিত হয়। "সে কি! সে শেখাতে যাবে কেন?"

"যার কথা ভাবছি সে এক অদ্ভুত লোক। সত্যিকারের এস.এস. ক্যাপ্টেন ছিলো, কিন্তু কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত; অনুশোচনায় তার মন পুড়ে যাচ্ছিলো। পরে ওডেসায় যোগ দিয়েছিলো। অনেক ফেরারী নাৎসী-দের খবর দিয়ে দিয়েছিলো কর্তৃপক্ষকে। হয়তো আরো দিতো কিন্তু ফাঁস হয়ে পড়ায় ডুব মারতে বাধ্য হলো। ভাগ্য ভালো, জানে বেঁচে গেছে। এখন নতুন নাম নিয়ে বেরোথের বাইরে একটা বাড়িতে আছে।"

"আমাকে আর কি কি শিখতে হবে?"

"আপনার নতুন পরিচয় সম্বন্ধে সবকিছু। কোথায় সে জন্মেছিলো, জন্মতারিখ কত, কিভাবে এস.এস.এ এসে ঢুকেছিলো, প্রশিক্ষা পেয়েছিলো কোথায়, কোন্ কোন্ জায়গায় কাজ করেছিলো, তার ইউনিট কি, কম্যাণ্ডিং অফিসার কে কে ছিলো, যুদ্ধের পর থেকে তার গোটা ইতিহাস, সমস্ত জানতে হবে। আপনার সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেবে এমন একজন লোকেরও দরকার হবে। সেটা সহজ হবে না। আপনাকে নিয়ে আমাদের বহু পরিশ্রম এবং সময় ব্যয় করতে হবে, হের মিলার। একবার আপনি যদি ওদের মধ্যে গিয়ে ঢোকেন, তবে আর পিছু হটা নেই।"

"আপনাদের কি লাভ হবে এতে?" সন্দেহের সুর জাগে মিলারের কণ্ঠে।

লিওঁ উঠে দাঁড়ায়। কার্পেটের ওপরে পায়চারি করতে থাকে। বলে, "প্রতিহিংসা। আপনার মতো আমরাও রশম্যানকে চাই। তবে আমরা আরো অনেক কিছু চাই। জঘন্যতম এস.এস. ঘাতকেরা এখনো মিথ্যা পরিচয়ে আরামে দিন কাটাচ্ছে। তাদের সেই নামগুলো চাই আমাদের। সেইটাই আমাদের লাভ। তাছাড়াও আছে আরো কিছু। আমরা জানতে চাই ওডেসার হয়ে জার্মান বৈজ্ঞানিকদের কে মনোনীত করে পাঠাচ্ছে ইজিপ্টে গিয়ে নাসেরের রকেট বানানোর জন্যে। আগেকার লোকটা, ব্র্যাণ্ডনার, চাকরি ছেড়ে তো গতবছর উধাও হয়ে গেছে তার সহকারী হাইনৎস ক্রুগের সঙ্গে আমরা মোকাবিলা করে নেবার পরেই। এখন নতুন একজন রয়েছে।"

"খবরগুলো শোনাচ্ছে যেন ইস্রায়েলি ইনটেলিজেন্সের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় তথ্য," মিলার বলে ওঠে। লিওঁ চতুর দৃষ্টি হানে তার দিকে।

"বটেই তো," কেটে কেটে বলে, "মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা ক'রেও থাকি। অবশ্য তার মানে এ নয় যে তারা আমাদের মালিক।"

মিলার জিজ্ঞেস করলো, "ওডেসার ভেতরে আপনারা নিজেদের লোক ঢোকাতে চেষ্টা করেননি কখনো?"

"হ্যাঁ, করেছি…দুবার করেছিলাম।"

"কি হয়েছিলো?"

"প্রথমজনকে দেখা গিয়েছিলো খালের জলে ভাসতে, কোন আঙুলের একটা নখও অবশিষ্ট ছিলো না। দ্বিতীয়জনের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া গেলো না।…তবু যেতে চান?"

প্রশ্নটা গ্রাহ্যই করলো না মিলার।

"কিন্তু আপনাদের পদ্ধতি যদি এতই সুপটু হবে, তবে ওরা ধরা পড়লো কেন?"

"ওরা দুজনেই ইহুদী ছিলো," সংক্ষেপে সারতে চাইলো লিওঁ, "হাত থেকে ওদের কনসেনট্রেশন-শিবিরের উল্কি তুলে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দাগ থেকেই গিয়েছিলো। তাছাড়া দুজনেরই সুন্নত করা ছিলো। সেইজন্যেই মোট্টি যখন আমাকে জানালো যে একজন খাঁটি জার্মান আর্য এস.এস.এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চায়, আগ্রহ জাগলো আমার।…আচ্ছা আপনার তো সুন্নত করা নেই,…না?"

"কেন? তাতে কিছু এসে যায়," মিলার শুধালো।

"হ্যাঁ, যায় বৈকি। তা যদি করা থাকে তবে যে আপনি ইহুদী হবেনই এমন কোন কথা নেই। বহু জার্মানও তো সুন্নত করিয়ে থাকে। তবে না যদি থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় আপনি ইহুদী নন।"

"না, নেই আমার," মিলার ছোট্ট করে উত্তর দেয়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো লিওঁ। "বাঁচালেন। এবারে হয়তো আমরা সফল হতে পারি।"

মধ্যরাত্রি অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। লিওঁ তার ঘড়িতে চোখ বুলালো।

"খেয়েছেন আপনি ?" মিলারকে জিজ্ঞেস করলো সে।

সাংবাদিকটি শুধু মাথা নাড়লো।

"মোট্টি, অতিথির জন্যে কিছু খাবার।"

হাসতে হাসতে মোট্টি ঘরের দরজা দিয়ে বাড়ির ওপরদিকে চলে গেলো।

"দেখুন, আজ রাত্রে আপনাকে এখানেই থাকতে হবে," লিওঁ মিলারকে বলে, "একটা বিছানা নিয়ে আসবো আমরা। পালাবার চেষ্টা করবেন না যেন। দরজায় তিনটে তালা আছে, বাইরে থেকে সবগুলো বন্ধ থাকবে। আপনার গাড়ির চাবি দিয়ে দিন, এইখানেই আপনার গাড়ি নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করছি। কয়েক সপ্তাহ ওটা যদি লোকচক্ষের অন্তরালে থাকে সেটাই ভালো। আপনার হোটেলের বিল আমরা মিটিয়ে দিয়ে মালপত্রও এখানে নিয়ে আসবো। সকালে উঠে আপনি আপনার মা এবং বান্ধবীকে দুটো চিঠি লিখবেন; তাঁদের জানিয়ে দেবেন যে আপনি কয়েক সপ্তাহ—বা কয়েক মাসও হতে পারে—বাইরে বাইরেই থাকবেন, যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না সে সময়। বুঝলেন ?"

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে গাড়ির চাবি বের করে দিলো মিলার। লিওঁ সেটা একজনকে দিয়ে দিতে সেও বিনাবাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

"সকালে আমরা আপনাকে গাড়িতে করে বেরোতে নিয়ে যাবো, আমাদের এস.এস. অফিসারটির কাছে। তার নাম অ্যালফ্রেড অস্টার। ওর সঙ্গেই আপনি থাকবেন। সে সব বন্দোবস্ত আমিই করবো। ইতিমধ্যে, আপনার জন্যে একটা নতুন নাম এবং পরিচয় আমাকে খুঁজে বার করতে হবে।...আচ্ছা, মাপ করবেন আমাকে।"

উঠে চলে গেলো লিওঁ। মোট্টি একটু পরেই খাবার নিয়ে ফিরে এলো। গোটাছয় কম্বলও নিয়ে এসেছে সে। ঠাণ্ডা মুরগির মাংস আর আলুর স্যালাড চিবোতে চিবোতে মিলার ভাবে এ কোথায় এসে সে এখন ঠেকলো!

বহুদূর উত্তরে, ব্রেমেনের জেনারেল হাসপাতালে, রাতের তৃতীয় প্রহরে,

একজন অর্ডালি তার ওয়ার্ড পাহারা দিচ্ছিলো। ঘরের শেষপ্রান্তে একটা বেডের চারপাশে লম্বা পর্দা ঘেরা, ওয়ার্ডের বাকি অংশ থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন।

অর্ডালিটির নাম ছিলো হার্টস্টাইন, প্রায় মাঝবয়সী লোক। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বেডটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো। রুগী একেবারে নিথর হয়ে পড়ে আছে। মাথার ওপরে স্বল্লাভ আলো টিমটিম করে জ্বলছে রাতভর। পর্দা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো, রুগীর হাত তুলে নিলো নাড়ী দেখবার জন্যে। কিন্তু কিচ্ছু নেই, কখন নাড়ী ছেড়ে গেছে।

ক্যান্সারে মৃত লোকটির ক্লিষ্ট মুখের দিকে অর্ডালি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তিনদিন আগের প্রলাপ বকবার কথা মনে পড়ে যেতেই আস্তে করে কম্বল নামিয়ে দিয়ে মৃতদেহের বাঁ হাতখানা তুলে ধরে। দেখে যে বাঁ বগলের নীচে একটা নম্বর উল্কি করা আছে। নম্বরটা আর কিছুই নয়, মৃত ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ। নিশ্চিত প্রমাণ যে একদা সে এস.এস.এ ছিলো। এমনভাবে উল্কি করে রক্তের গ্রুপ লিখে রাখার উদ্দেশ্য ছিলো যে রাইখে তাদের জীবনই সবচেয়ে মূল্যবান, অতএব এস.এস.এরা আহত হয়ে হাসপাতালে এলে অন্যসব ফৌজিদের চেয়ে আগেভাগেই যতটুকু প্লাজমা আছে তাদেরই দিতে হবে। সেইজন্যে সময় যাতে নষ্ট না হয়, উল্কি করে রক্তের গ্রুপ বাঁ বগলের নীচে খোদাই করে রাখা ছিলো প্রতিটি এস.এস.-এর পক্ষে অতি-আবশ্যক কর্তব্য।

হার্টস্টাইন মরা মানুষটার মুখে কম্বল টেনে দিলো। টেবিলের দেরাজটা হাঁটকে দেখলো যে অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মধ্যে আছে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। অবশ্য আর বিশেষ কিছুই ছিলো না, কারণ রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো লোকটা, সেখান থেকেই তাকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিলো। পকেটে যা ছিলো সেগুলোই আছে এখানে।···ড্রাইভিং লাইসেন্স খুলে হার্টস্টাইন দেখলো লোকটার বয়স এখন প্রায় উনচল্লিশ—জন্মতারিখ হলো ১৮ই জুন ১৯২৫ ; নাম রল্‌ফ্ গুন্থার কল্‌ব।

অর্ডালি চুপিচুপি ড্রাইভিং লাইসেন্সটাকে নিজের সাদা কোটের পকেটে চালান করে দিয়ে চললো রাতের ডিউটিরত ডাক্তারের কাছে, রুগীর মৃত্যু হয়েছে সেই খবর দিতে।

এগারো

পিটার মিলার তার মা এবং সিগিকে চিঠি লিখলো প্রায় মাঝসকাল পর্যন্ত। ঠায় বসে বসে মোট্টি পাহারা দিলো ততক্ষণ। হোটেল থেকে জিনিসপত্র এসে গেছে, হোটেলের বিলও এরা মিটিয়ে দিয়েছে। তুপুরের একটু আগে তুজনে রওনা দিলো বেরোথের দিকে। চালক সেই গতরাত্রের লোকটা। তবে গাড়িটা অন্য; রাতের মার্সিডিজখানা নয়, তার জায়গায় একটা নীল রঙের ওপেল। মিলারের সাংবাদিকসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চকিতে গাড়িটার নম্বর-প্লেটের ওপর দিয়ে ঘুরে গেলো। মোট্টি তা দেখে হাসলো। "ঘাবড়াবেন না। এটা ভাড়াটে গাড়ি, মিথ্যা নামে নেওয়া হয়েছে।"

"বাঃ, পেশাদারদের সঙ্গে আছি জেনে নিশ্চিন্ত বোধ করছি।"

"না হয়ে উপায় কি বলুন?" মোট্টি কাঁধ ঝাঁকায়। "ওডেসার বিরুদ্ধে লাগতে হলে পেশাদার না হলে তো কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম।"

গ্যারাজে তুটো ভাগ করা ছিলো। মিলার দেখলো দ্বিতীয় খোপটায় তার কালো জাগুয়ার দাঁড়িয়ে আছে। আগের রাতের আধা-গলা তুষারগুলো পড়ে পড়ে চাকাগুলোর নীচে জল জমে আছে, চকচকে কালো শরীরটা বিজলী আলোয় ত্যুতি ছোটাচ্ছে।

ওপেলে গিয়ে ঢুকতেই আবার তার মাথার ওপর দিয়ে নিমেষে কালো মোজা গলিয়ে দেওয়া হলো। গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে গাড়িটা যেই প্রাঙ্গণ পেরিয়ে রাস্তায় উঠছে অমনি তাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির মেঝের ওপরে ফেলে দেওয়া হলো। ম্যুনিখ শহর পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়ে তবে মোট্টি তার চোখ থেকে ঠুলি সরিয়ে দিলো। গাড়িটা তখন ই. ৬ নং মহাসড়ক ধরে ন্যুরেমবার্গ হয়ে বেরোথের পথে ছুটেছে।

দৃষ্টির আবরণ খুলে যেতে মিলার দেখলো রাত্রে ভীষণ তুষারপাত হয়েছিলো। তুধারে ঢালু বনময় প্রান্তর, ব্যাভেরিয়া অঞ্চল এখানে ফ্রাঙ্কোনিয়ায় এসে মিশেছে। সাদা ধবধবে মোটা চাদর বেছানো সেখানে। রাস্তার তুপাশের পত্রহীন বীচগাছের অরণ্যগুলোকে এখন ভোঁতা-ভোঁতা থপথপে

দেখাচ্ছে, তীক্ষ্ণতা আর নেই। ড্রাইভার আস্তে আস্তে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে ; উইণ্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার হুটো হরদম কাঁচের ওপর থেকে বরফের আঁশ মুছিয়ে দিচ্ছে।

ইঙ্গোলস্ট্যাডটে পৌঁছে রাস্তার ধারের এক সরাইখানায় ওরা লাঞ্চ সেরে নিলো। সেখান থেকে ন্যুরেমবার্গকে পূবে ফেলে এক ঘণ্টার মধ্যে বেরোথে পৌঁছে গেলো।

ছোট্ট শহর কিন্তু অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। অঞ্চলটাকেই ব্যাভেরিয়ান সুইজারল্যাণ্ড বলা হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই শহরে ওয়াগনারের স্মরণে সঙ্গীত-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অ্যাডলফ হিটলারের সময়ে নাৎসীতন্ত্রের সব রথীমহারথীরাই এখানে এসে ভিড় করতো ; কারণ ওয়াগনার হিটলারের পরমপ্রিয় ছিলেন, নর্ডিক উপকথার নায়কদের যে তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে অমর করে রেখেছেন।

তবে জানুয়ারিতে শহরটা একদম নিরিবিলি ; তুষারের কম্বল গায়ে দিয়ে যেন সুপ্ত। ছবির মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি। শহর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা নির্জন রাস্তার ওপরে অ্যালফ্রেড অস্টারের কটেজ ধরনের বাড়ি। সেখানে যেতে যেতে সারা রাস্তায় ওরা আর একটাও গাড়ি দেখেনি।

এস.এস.এর প্রাক্তন অফিসারটি জানতো যে ওরা আসবে। দীর্ঘ পরুষ চেহারা তার, নীল চোখ, মাথার সামনেই শুধু কিছু আদাবাটা রঙের চুল। এত শীত সত্ত্বেও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাল আভা তার মুখে।

মোট্টি পরিচয়ের পালাটালা চুকিয়ে অস্টারের হাতে লিওঁর চিঠিখানা দিলো। সেটা পড়তে পড়তে ব্যাভেরিয়ানটি বারকয়েক মিলারের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চায়।

পড়া শেষ হলে বলে, "বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারি। তা কতদিন ওকে আমি রাখতে পারবো ?"

"এখনো আমরা তা সঠিক জানি না," মোট্টি জানায়, "তবে যদ্দিন না তৈরি হচ্ছে, থাকবে নিশ্চয়ই। ওর একটা নতুন পরিচয়ও তো খুঁজে বার করার আছে। পরে আপনাকে আমরা জানাবো।"

ক' মিনিট পরেই মোটি চলে গেলো।

অস্টার মিলারকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। ঘর থেকে পড়ন্ত বেলার ম্রিয়মাণ আলো মুছে দিলো পর্দা ফেলে। তারপর আলো জ্বালিয়ে ঘর আলোময় করে তুললো।

"হুঁ···আপনি প্রাক্তন এস.এস. সদস্য সাজতে চান, কেমন?"

ঘাড় নাড়ে মিলার। "হ্যাঁ।"

অস্টার তখন ওর মুখের দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলো, "বেশ, তাহলে আমাদের আরম্ভ করতে হবে কতগুলো মৌলিক তথ্য থেকে। জানি না, আপনি আপনার মিলিটারি সার্ভিস কোথায় করেছেন, তবে আন্দাজ করতে পারি যে ওই বিশৃঙ্খল, গণতান্ত্রিক, প্রসূতি-মায়ের আদর-মাখানো বালখিল্য বাহিনীতে, যার নাম নব জার্মান আর্মি। প্রথম তথ্য শুনুন। গতযুদ্ধে ব্রিটিশ, আমেরিকান বা রাশিয়ান যে কোন দলের যে কোন সুপটু রেজিমেন্টের সামনে নব জার্মান আর্মি টিঁকে থাকতে পারতো স্রেফ দশ সেকেণ্ড। অথচ, ওয়াফেন-এস.এস. ব্যক্তিগত পাল্লায় যুঝলে গতযুদ্ধে তাদের পাঁচগুণ বেশী সংখ্যক মিত্রপক্ষের ফৌজদের পিটিয়ে ছাতু করে দিতে পারতো। দ্বিতীয় তথ্য শুনুন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সবল, সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, সুচতুর এবং সুপটু হচ্ছে ওয়াফেন-এস.এস.। তারা যাই করে থাকুক, এই তথ্য বদলাবার নয়। অতএব মিলার, চৌকস হয়ে উঠতে হবে আপনাকে। এই বাড়িতে যতদিন থাকবেন, ধরে নিন সেটাই রীতি। ঘরে আমি যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াবো, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াবেন। লাফানোটা কথার কথা নয়, সত্যিসত্যিই লাফাবেন। পাশ দিয়ে যেই আমি হেঁটে যাবো, খটাস্ করে দুই গোড়ালি একত্র করে খাড়া অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না আমি আপনার থেকে পাঁচ পা এগিয়ে যাই। আমি যদি এমন কোন কথা বলি যখন আপনাকে উত্তর দিতে হবে, তাহলে বলবেন: 'জাওহ্বল, হের হউপ্টস্টুর্মফ্যুয়েরার।' আর যখন আমি কোন নির্দেশ দেবো, তখন বলবেন: 'জু বেফেহ্ল, হের হউপ্টস্টুর্মফ্যুয়েরার।'··· কি,···পরিষ্কার?"

অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়ে মিলার।

"গোড়ালি মেলান," প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো অস্টার, "খটাস্ শব্দ শুনতে চাই আমি।...বেশ, হাতে যখন আমাদের বেশী সময় নেই তখন আজ রাত থেকেই শিক্ষা শুরু হয়ে যাবে। নৈশভোজনের আগে আমরা র‍্যাঙ্কগুলো শিখে নেবো, সিপাহী থেকে শুরু করে পূর্ণ জেনারেল অব্দি। যতরকম এস.এস. সৈনিকের অস্তিত্ব ছিলো তাদের সকলের পদমর্যাদার খেতাব, সম্বোধন করবার রীতি, কলারে ওদের প্রতীকচিহ্ন—সব শিখবেন আপনি। তারপর আমরা তাদের যাবতীয় ইউনিফর্ম সম্বন্ধে পাঠ নেবো: এস.এস.দের ভিন্নভিন্ন শাখায় ইউনিফর্মের কি কি বিশেষত্ব, প্রতীকচিহ্নে কি কি পার্থক্য, কোন্ সময়ে উৎসবের ইউনিফর্ম পড়তে হতো, কখন পূর্ণ পোশাকের ইউনিফর্ম, কখন বেড়াতে যাবার ইউনিফর্ম, কখন লড়াইয়ের ইউনিফর্ম, কখন ফ্যাটিগ ড্রেস, সবকিছু।...তারপর আপনাকে আমি ওদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পূর্ণ পাঠ দেবো; আপনি এস.এস.এ থাকলে ওদের ডাচাউ প্রশিক্ষা-শিবিরে যে পাঠ পেতেন তার পুরোটা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো। তারপরে শিখবেন ওদের কুচকাওয়াজের গান, মদ্যপানের গান, বিভিন্ন ইউনিটের গান।...ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে আরম্ভ করে, আপনার প্রথম পোস্টিং পর্যন্ত সবকিছু আমি শিখিয়ে দেবো। কিন্তু তারপর লিওঁকে এসে বলতে হবে কোন্ ইউনিটে আপনি যোগ দিয়েছিলেন, কোথায় কোথায় আপনি ছিলেন, আপনার কম্যাণ্ডিং অফিসার কে ছিলো, যুদ্ধের শেষে আপনার ভাগ্যে কি ঘটেছিলো, ১৯৪৫-এর পর থেকে আপনি কি করতেন। যাকগে সে সব।...আপনার শিক্ষার প্রথম অংশ শেষ হতে হতে প্রায় দু-তিন সপ্তাহ লাগবে, আর সেই পাঠ্যসূচীও যথেষ্ট দুরূহ।...হ্যাঁ, আর কক্ষনো ভাববেন না যেন যে এই সমস্তই খেলা-খেলা ব্যাপার। একবার যদি ওডেসার ভেতরে গিয়ে ঢোকেন, সামান্য ভুল করেছেন কি আপনার লাশ ভাসবে খালের জলে। বিশ্বাস করুন আমিও নেহাত দুধের ছেলে নই; তবুও ওডেসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার পর আমি যে আমি, সেই আমাকেও ওদের ভয়ে ভয়ে বাস করতে হচ্ছে। সেইজন্যেই আমি এখানে নাম ভাঁড়িয়ে আছি।"...

এডুয়ার্ড রশম্যানের সম্বন্ধে একক সন্ধান শুরু করবার পর থেকে এই প্রথমবার মিলার আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। বোধহয় বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দশটার সময় ম্যাকেনসেন এসে হাজির ওয়ের-উলফের অফিসে। হিলডা যে ঘরে বসে কাজ করে তার দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে ওয়েরউলফ তার ডেস্কের উল্টোদিকে মক্কেল বসবার চেয়ারে ঘাতকটাকে বসিয়ে চুরুট ধরালো।

"বুঝলে, জনৈক ব্যক্তি,—একজন সাংবাদিক,—আমাদের কোন একজন কামেরাডের নতুন পরিচয় এবং নামঠিকানা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, চারদিকে নানান খোঁজখবর নিয়ে বেড়াচ্ছে—"

জল্লাদটি বুঝে নেয় কি ব্যাপার। এই ধরনের ভনিতা তো সে কতবার শুনেছে।

"সাধারণত এইসব ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না," ওয়েরউলফ বলে, "কেন না রিপোর্টারেরা শেষ পর্যন্ত কোন খোঁজখবর না পেয়ে এই সব কাজ ছেড়েই দেয়, আর ছেড়ে যদি নাও দেয়, তবুও যাদের সম্বন্ধে খোঁজ-টোজ নেয়, তারা এমন কিছু বিরাট লোক হয় না যে তাদের জন্যে আমাদের সময় ও অর্থব্যয় করে তাদের বাঁচাতে হবে।"

"কিন্তু এবারে ব্যাপারটা অন্যরকম, কি বলেন?" নরম গলায় প্রশ্ন করে ম্যাকেনসেন। ওয়েরউলফ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, যেন ভয়ানক দুঃখিত।

"হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশত এবারে এই রিপোর্টারটা না জেনেশুনেই বেশ একটা স্পর্শপ্রবণ জায়গায় হাত দিয়েছে। দুর্ভাগ্য দু পক্ষেরই,—আমাদের দুর্ভাগ্য যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আর রিপোর্টারের দুর্ভাগ্য যে এতে তার প্রাণ যাবে। আমাদের যে সহকর্মীকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তিনি আমাদের সংস্থার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বিশেষত আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনার পক্ষে। রিপোর্টারটিও আবার অদ্ভুত মানুষ—বেশ পরিশ্রমী, মেধাবী এবং যথেষ্ট কুশলী, অথচ কি আশ্চর্য, এই কামেরাডের ওপর তার যেন ব্যক্তিগত আক্রোশ, প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর একেবারে!"

"উদ্দেশ্য কি ?" ম্যাকেনসেন জিজ্ঞাসা করলো। ওয়েরউলফ যে জানে না, সেই অজ্ঞানতার ছাপ বেশ ফুটে উঠলো তার ভ্রূকুটিতে।

চুরুট থেকে টোকা দিয়ে দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে ধীরে ধীরে বললো, "বুঝতে পারছি না আমরা, তবে আছে নিশ্চয়ই কিছু। যে ব্যক্তিটিকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁর অতীতের ইতিহাস শুধু ইহুদী বা তাদের বন্ধুদেরই উত্তেজিত করে তুলতে পারে। অস্টল্যাণ্ডে একটা ঘেটোর তিনি অধিনায়ক ছিলেন। অবশ্য কিছু লোক আছে, বিশেষ করে বিদেশীরা, যারা কিছুতেই বুঝতে চেষ্টা করে না যে আমরা যেসব কর্মসূচী নিয়েছিলাম ওইসব জায়গায়, তার যৌক্তিকতা কতখানি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই রিপোর্টারটি বিদেশী নয়, ইহুদী নয়, এমন কিছু উল্লেখযোগ্য বামপন্থীও নয়, বিবেকের তাড়না খাওয়া ভেড়া-গোছের মানুষও নয়.—তারা তো শুধু প্রচুর হাওয়াটাওয়াই ছাড়ে, অন্য কোন কর্ম তাদের সাধ্যের বাইরে।···অথচ এই লোকটা একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। বয়সে যুবক, জার্মান আর্য, বাপ ফৌজি অফিসার ছিলো, দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে; এমন কোন পটভূমিও নেই যা দিয়ে বোঝা যায় যে আমাদের ওপর তার বিতৃষ্ণা জন্মালেও জন্মাতে পারে, আমাদের কামেরাডেনদের একজনকে খুঁজে বের করবার জন্যে এমন প্রাণপণ প্রচেষ্টাই বা তার কেন যে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সমানে অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে ? সেইজন্যেই তার মৃত্যুর আদেশ দিতেও দুঃখ বোধ হচ্ছে আমার। তবে উপায়ান্তর নেই, করতেই হবে।"

"মেরে ফেলতে হবে ?" জিজ্ঞেস করলো ম্যাক-চাকু।

"হ্যাঁ, মেরে ফেলতে হবে," ওয়েরউলফ সম্মতি দেয়।

"কোথায় আছে ?"

"জানা নেই।" দুটো টাইপ করা পৃষ্ঠা ওর দিকে এগিয়ে দেয় ওয়েরউলফ। "এই হচ্ছে আমাদের লোক। নাম পিটার মিলার, পেশা অন্বেষক রিপোর্টার। ওকে শেষবারের মতো দেখা গেছে বাড গোডেসবার্গের ড্রিসেন হোটেলে। সেখান থেকে এতদিনে নিশ্চয়ই চলে গেছে, তবে সেই সূত্র ধরে এগুতে পারো। আরেকটা জায়গা হলো গিয়ে তার নিজের ফ্ল্যাট, যেখানে বান্ধবীকে নিয়ে সে বাস করে। যে সব পত্রপত্রিকার হয়ে ও কাজ করে

তাদেরই কোন একটার প্রতিনিধি সেজে ওর বাড়ি খোঁজ নিয়ো। তাহলেই মেয়েটি নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবে, অবশ্য যদি সে নিজে তার ঠিকানা জেনে থাকে। লক্ষণীয় একটা গাড়ি চালায় সে, যেটার পুরো বিবরণ এখানে পাবে।"

ম্যাকেনসেন বলে, "টাকার দরকার হবে আমার।"

ওয়েরউলফ কথাটা জানতো। দশ হাজার মার্কের একটা তাড়া টেবিলের ওপর রেখে ওর দিকে ঠেলে দেয়।

"আদেশটা কি তাহলে ?" ঘাতক শুধালো।

"খুঁজে বের করে ওকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে," ওয়েরউলফ জানায়।

জানুয়ারির তেরো তারিখে ম্যুনিখে বসে লিওঁ জানতে পারলো যে পাঁচদিন আগে ব্রেমেনে জনৈক রল্‌ফ গুন্থের কল্‌বের মৃত্যু ঘটেছে। তার উত্তর-জার্মানীস্থিত প্রতিনিধিটির পত্রের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিটির ড্রাইভিং লাইসেন্সও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাক্তন এস.এস.দের যে তালিকা আছে তার কাছে তাতে কল্‌বের নাম, র‍্যাঙ্ক এবং নম্বর খুঁজে দেখলো, পশ্চিম-জার্মানী থেকে প্রকাশিত অনুসন্ধিত এস.এস.দের তালিকাও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কোনটাতেই কল্‌বের নাম নম্বর খুঁজে পেলো না। ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোয় লোকটার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর সিদ্ধান্ত নিলো সে।

মোটিকে খবর পাঠালো তার কর্মস্থল টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। সিফ্‌ট্‌ শেষ হয়ে গেলে সে চলে আসতেই কলবের ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তার সামনে মেলে ধরে লিওঁ বললো, "এই হচ্ছে আমাদের লোক, বুঝলে ? উনিশ বছর বয়েসে স্টাফ-সার্জেন্ট ছিলো, যুদ্ধ শেষ হবার অল্প ক'দিন আগে প্রমোশন পেয়েছিলো। নিশ্চয়ই ওর সম্বন্ধে তথ্যের ভীষণ অভাব রয়েছে। কল্‌বের মুখের সঙ্গে মিলারের মুখের মোটেই মিল নেই। মিলারের মুখে মেক-আপ দিলেও হওয়া মুশকিল। তাছাড়া সাজানো মুখটুখ আমার পছন্দ না, কাছ থেকে ধরা পড়ে যায়। তবে উচ্চতা এবং গড়ন প্রায় মিলারের মতোই।

অতএব নতুন একটা ফটো লাগাতে হবে। তাড়াতাড়ি নেই কিছু। ফটোটার ওপরে ব্রেমেন পুলিস ট্র্যাফিক বিভাগের একটা নকল মোহর মারতে হবে। সেটার বন্দোবস্ত করো।"

মোট্টি চলে যেতে ব্রেমেনের একটা নম্বর ঘুরিয়ে লিওঁ কিছু নির্দেশ দিলো।

"বেশ, ভালো," ছাত্রকে প্রশংসা করে অ্যালফ্রেড অস্টার।…"আচ্ছা, এখন গানগুলো শুরু করা যাক। হস্ট-ওয়েসেল গানের নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, নাৎসীদের কুচকাওয়াজের গান তো," মিলার বলে।

প্রথম কয়েকটা ছত্র গুনগুন করে গেয়ে শোনায় অস্টার।

"ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে, শুনেছি বটে। কিন্তু কথাগুলো মনে নেই।"

"প্রায় গোটা বারো গান শেখাবো আমি," অস্টার বললো, "যদি,—বলা তো যায় না,—জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে এইটাই হচ্ছে সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো কামেরাডেনদের মধ্যে গিয়ে পড়লে দলবদ্ধভাবে গাইতেও হতে পারে। না জানার অর্থ মৃত্যুদণ্ড। অতএব, শুরু করুন…

'ঊর্ধ্বে মোদের পতাকা,
কাতারে মোদের একতা…'"

সেদিন তারিখ ছিলো ১৮ই জানুয়ারি।

ম্যুনিখের স্বোয়েইজার হফ হোটেলের বারে বসে বসে ককটেলে চুমুক দিচ্ছিলো ম্যাকেনসেন। বিভ্রান্তির কারণটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করে দেখতে চায়। মিলারের চেহারা তো এখন তার মনে একেবারে স্পষ্ট গেঁথে আছে; তার গাড়ির চেহারাও, কারণ জাগুয়ার গাড়ির এজেন্টের কাছ থেকে এক্স.কে. ১৫০ মডেলের প্রচারপুস্তিকা এনে গাড়ির ফটোটাও মনে এঁকে রেখেছে। অথচ না গাড়ি, না মানুষ, কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না।

বাড গোডেসবার্গের সূত্র ধরে অচিরেই পৌঁছে গিয়েছিলো কলোন এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে জানা যায় যে মিলার লণ্ডনে উড়ে গিয়েছিলো

এবং ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই নববর্ষের প্রারম্ভে ফিরেও এসেছিলো। তার পর থেকেই তার এবং তার গাড়ির কোন সন্ধান নেই।

মিলারের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলো। হাসিখুশি মেয়েটির সঙ্গে কথাও হয়েছে। কিন্তু ম্যুনিখের ডাকঘরের ছাপওলা একটা চিঠি দেখানো ছাড়া আর কিছুই মেয়েটি বলতে পারেনি। চিঠিটাতে লেখা ছিলো যে মিলার কিছুদিনের জন্যে সেখানেই থাকবে।

অথচ এক সপ্তাহ ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো, ম্যুনিখ শহরে কোন হদিসই নেই। প্রতিটা হোটেল, পার্কিং স্পেস, গ্যারেজ, পেট্রল পাম্প সব খুঁজেছে, কিচ্ছু নেই। যেন লোকটা পৃথিবীর বুক থেকে হাওয়া হয়ে গেছে।

পানপাত্র খালি করে দিয়ে ম্যাকেনসেন চললো টেলিফোনের উদ্দেশ্যে; ওয়েরউলফকে সব জানাতে হবে। অথচ কল্পনাও করতে পারলো না যে দেড় হাজার গজের মধ্যেই তার কাম্যবস্তু দাঁড়িয়ে আছে,—একটামাত্র হলুদ ডোরাওলা কালো জাগুয়ারখানা। দেওয়াল-ঘেরা প্রাচীন সামগ্রীর একটা বিপণির বদ্ধ প্রাঙ্গণে সেটা তখন দাঁড়িয়ে। সেই প্রশস্ত বাড়িটার গভীর অভ্যন্তরে বাস করতো লিওঁ এবং সেখান থেকেই চালাতো তার সেই প্রায়-উন্মাদ গুপ্ত সংঘটিকে।

ব্রেমেন জেনারেল হাসপাতালে সাদা কোট-পরা একজন লোক ধীরে ধীরে রেজিস্ট্রারের অফিসে এসে ঢুকলো। তার গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলছে, যেন নবাগত কোন হাউস-সার্জেন।

অভ্যর্থনায় বসেছিলো একটি রমণী যে একাধারে আপ্যায়িকা এবং অফিস-কেরানী। তাকে এসে লোকটি বললো, "আমাদের একজন রুগী, রল্‌ফ গুন্থের কল্‌বের মেডিক্যাল ফাইলটা দরকার।"

হাউস-সার্জেনটিকে চিনতে পারলো না মহিলা। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না, এমন তো কতই আছে, গণ্ডায় গণ্ডায়। ফাইলিং ক্যাবিনেটের মধ্যে নামগুলোর ওপর দিয়ে তরতর করে চোখ বুলিয়ে গেলো, একটি নথীর প্রান্তে কল্‌ব নামটি চোখে পড়তেই সেটা টেনে বার করে হাউস-সার্জেনের হাতে দিলো। ঠিক তক্ষুনি ফোন বেজে উঠতে সেটা ধরতে চলে গেলো।

চেয়ারে বসে পড়ে নথীটার পাতা উলটে গেলো হাউস-সার্জেন, জানা গেলো রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলো কল্‌ব, সেখান থেকে তাকে অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিলো। পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিলো যে তার পেটে সাংঘাতিক ধরনের ক্যান্সার যেটা প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত। পরে অপারেশন না করবারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। রুগীকে ওষুধের ওপরেই রাখা হয়েছিলো আশা ছেড়ে দিয়ে। শেষের দিকে শুধু বেদনানাশক ওষুধ দেওয়া হতো। ফাইলের শেষ পৃষ্ঠায় লেখা ছিলোঃ

'৮ই এবং ৯ই জানুয়ারির অন্তর্বর্তী রাত্রে রুগীর মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর কারণঃ প্রধান অন্ত্রের স্ফোটন। নিকটতম আত্মীয় কেউ নেই। শবদেহ ১০ই জানুয়ারি তারিখে মিউনিসিপ্যাল লাশঘরে জমা করে দেওয়া হয়েছে।'

যে ডাক্তারের অধীনে কেসটা ছিলো বিবৃতিটা তারই স্বাক্ষর-সম্বলিত।

হাউস-সার্জন ফাইল থেকে পৃষ্ঠাটা খুলে নিয়ে নতুন একটা পৃষ্ঠা আটকে দিলো, যেটায় লেখা ছিলোঃ

'ভর্তির সময়ে রুগীর অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও ওষুধের প্রভাবে স্ফোটক ধীরে ধীরে অবদমিত হয়ে এসেছিলো। ১৬ই জানুয়ারি তারিখে রুগীর অবস্থা স্থানান্তর করবার উপযোগী বলে গণ্য হয়। রুগীর নিজস্ব অনুরোধ অনুসারে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে পূর্ণ বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ডেলমেনহর্স্টের আরকাডিয়া ক্লিনিকে।'

নীচে একটা অবোধ্য স্বাক্ষর।

হাউস-সার্জন মিষ্টি হেসে ফাইলটা রমণীটির হাতে ফেরত দিয়ে চলে গেলো। সেদিন তারিখ ছিলো ২২শে জানুয়ারি।

তিনদিন পরে লিও এমন একটা খবর পেলো যা দিয়ে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। উত্তর-জার্মানীর কোন একটা বুকিং এজেন্সির জনৈক কেরানী তাকে খবর পাঠালো যে ব্রেমারহ্যাভেনের একটি বিশেষ রুটির কারখানার মালিক তার নিজের এবং তার বৌয়ের জন্যে শীতকালে প্রমোদভ্রমণের টিকিট কেটে ফেলেছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি, রবিবারে তারা ব্রেমারহ্যাভেন থেকে রওনা দেবে, ক্যারিবিয়ানে কাটাবে চার সপ্তাহ।

লিও জানতো যে যুদ্ধের সময় লোকটা এস.এস.এর কর্নেল ছিলো এবং পরে ওডেসার সদস্য হয়। মোট্টিকে ডেকে বললো যে রুটি বানানোর তথ্য সম্পর্কে যেন একটা বই কিনে নিয়ে আসে।

ওয়েরউলফ হতবুদ্ধি। তিন সপ্তাহ ধরে তার প্রতিনিধিরা জার্মানীর তাবৎ বড় বড় শহর চষে ফেললো, অথচ মিলার নামে লোকটির বা তার কালো জাগুয়ার গাড়ির কোনই পাত্তা পাওয়া গেলো না। হাম্বুর্গের ফ্ল্যাট এবং গ্যারেজে সর্বক্ষণ পাহারা দেওয়া হচ্ছে। অডর্ফে একটি মাঝবয়সী মহিলার কাছে যাওয়া হয়েছিলো কিন্তু সেখানেও শোনা গেলো ছেলে কোথায় আছে তিনি জানেন না। সিগি নামে একটি মেয়ের কাছে অনেক-বার টেলিফোন করা হয়েছিলো, যেন কোন একটা বড় সচিত্র পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে, মস্তবড় কাজ আছে মিলারের জন্যে, বহু টাকা,—কিন্তু মেয়েটি শুধুই বলে যে তার জানা নেই বন্ধু এখন কোথায়।

হাম্বুর্গে তার ব্যাঙ্কেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নভেম্বরের পরে আর কোন চেক সে ভাঙায়নি। অর্থাৎ, সোজা কথায়, উবে গেছে সে। অথচ, জানুয়ারির ২৮ তারিখ হয়ে গেলো। আর তো দেরি করা যায় না। ওয়েরউলফ একটা টেলিফোন করতে বাধ্য হলো। বড় দুঃখেই যেন সে রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালো।

বহুদূরে উঁচু পাহাড়ের ওপরে একটি লোক আধ ঘণ্টা পরে টেলিফোন রেখে দিয়ে কয়েক মিনিট ধরেই নিজের মনে মনে শাপশাপান্ত করলো। শুক্রবারের সন্ধ্যা ; সবে দুদিনের বিশ্রামের জন্যে তার শৈলাবাসে এসেছে সে, এমন সময়ে এই টেলিফোন।

সুসজ্জিত পড়বার ঘরটার জানলায় এসে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে চেয়ে দেখলো। লনের ওপরে তুষারের পুরু আস্তরণ, জানলা দিয়ে আলোর রশ্মি সেখানে ছড়িয়ে গেছে। এস্টেটের সীমানা জুড়ে উঁচু-উঁচু পাইনগাছ, সেখানেও গিয়ে পড়েছে আলোকের দ্যুতি।

কতকালের তার উচ্চাশা এইভাবে জীবনধারণ করবার। ছেলেবেলায়

বড়দিনের ছুটিতে যখন দেখতো গ্রাৎসের আশেপাশে পাহাড়গুলোর ওপর এমনি কত সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর,—ধনী বড়লোকদের সম্পত্তি,—তখন থেকেই তার এই অভিলাষ। এখন তা পেয়েছেও, ভারি ভালো লাগে।

বীয়ার কারখানার শ্রমিকের বাড়ি থেকে শতগুণে ভালো যেখানে সে বড় হয়েছে। রিগার বাড়িটা থেকেও অনেক ভালো যেখানে সে চার বছর কাটিয়েছে; ব্যুয়েনস আয়ার্সের সজ্জিত আবাস থেকেও ভালো বা কায়রোর হোটেল কামরা থেকেও। এমনি ধরনের আলয় তো তার চিরকালের কাম্য।

টেলিফোনের খবরটা শুনে বেশ বিচলিত হয়ে উঠলো। দূরভাষের অপর প্রান্তের লোকটিকে যদিও জানিয়ে দিলো যে তার বাড়ির আশেপাশে কাউকে দেখা যায়নি, কারখানাতেও না, তার সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করছে এমন কোন কথাও শোনেনি, তবুও চিন্তিত হয়ে উঠলো সে। মিলার? কোন্ শালা বাঞ্চোত এই মিলার? ফোনে অবশ্য তাকে বলা হয়েছে যে সাংবাদিকটাকে ঠিকমতন দাওয়াই দেওয়া হবে, তবুও আতঙ্ক সম্পূর্ণভাবে যায় না। তার অন্যান্য সতীর্থেরা এবং টেলিফোনের আহ্বায়কও যে বেশ আতঙ্কিত তা স্পষ্ট বোঝা গেলো যখন তাকে বলে দেওয়া হলো যে তারা ঠিক করেছে আগামীকালই তার জন্যে একজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী পাঠিয়ে দেওয়া হবে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেই লোকটা তার সঙ্গেই বাস করবে এবং তার মোটর-চালকের কাজও করবে।

পড়ার ঘরের জানলায় পর্দা টেনে দিলো। নিমেষে শীতের প্রকৃতি চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য। ঘরটার দরজায় মোটা পরতের প্যাডিং, কাজেই বাড়ির অন্য অংশ থেকে কোন শব্দ এখানে আসে না। শুধু একটি-মাত্র আওয়াজ ঘরের মধ্যে, অগ্নিকুণ্ডে তাজা পাইনের গুঁড়ি চটচট করে ফাটছে। ঢালাই লোহার তৈরি মস্তবড় অগ্নিকুণ্ড; লেলিহান আগুনের শিখাগুলো নেচে নেচে উঠছে, ঘরটায় ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বাদু উষ্ণতা। তার দুপাশে লোহার ওপরে নানান কারুকার্য, আঙুরলতা আর বাঁকা-বাঁকা নক্‌শা। বাড়িটাকে কিনে আধুনিক ঢঙে ঢেলে সাজানোর সময়েও এই জিনিসটাকে বদলায়নি সে।

দরজা খুলে গেলো। বৌয়ের মাথাটা দেখা গেলো। "ডিনার তৈরি।"

"আসছি গো," এডুয়ার্ড রশম্যান বললো।

পরদিন সকালে শনিবারে অস্টার এবং মিলারের কাছে কয়েকজন লোক এলো ম্যুনিখ থেকে। গাড়ি করে এসেছে চারজন,—লিওঁ, মোট্টি, গাড়ির চালক এবং আরেকজন যার হাতে একটা কালো ব্যাগ।

বসার ঘরে পৌঁছে লিওঁ ব্যাগওলা লোকটিকে বললো, "তুমি বরং বাথ-রুমে গিয়ে তোমার যন্ত্রপাতি সাজাও।"

লোকটা মাথা নেড়ে ওপরে চলে গেলো। চালক ছিলো গাড়িতেই বসে।

লিওঁ নিজে টেবিলের ধারে বসে অস্টার এবং মিলারকে বসতে বললো। মোট্টি রইলো দরজার পাশে, হাতে একটা ফ্ল্যাশ-লাগানো ক্যামেরা।

একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স লিওঁ এগিয়ে দিলো মিলারের হাতে। ফটোর জায়গাটা খালি। বললো, "আপনাকে এই লোকটার ভূমিকা নিতে হবে। রল্‌ফ গুন্থের কল্‌ব, জন্ম ১৮ই জুন ১৯২৫। তার মানে যুদ্ধের শেষে আপনার বয়স উনিশ বছর,—প্রায় কুড়ি। এখন আপনি আটত্রিশ বছরের। আপনার জন্মস্থান ব্রেমেন, সেখানেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। দশ বছর বয়সে, ১৯৩৫ সালে, আপনি হিটলার-তরুণ দলে যোগ দিয়েছিলেন, জানুয়ারি ১৯৪৪-এ, মানে আঠারো বছর বয়সে, এস.এস.এ ভর্তি হয়েছিলেন। আপনার বাপ-মা দুজনেই গত। ১৯৪৪ সালে ব্রেমেন ডকে বোমাবর্ষণের সময় তারা দুজনেই প্রাণ হারায়।"

মিলার ড্রাইভিং লাইসেন্সটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

অস্টার জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু এস.এস.এ ওর জীবনবৃত্তান্তটা কি? আমরা তো এদিকে প্রায় তথ্যের অভাবে বসেই আছি।"

"কেমন দেখছেন?" লিওঁ প্রশ্ন করে। মিলারের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপও নেই।

"বেশ ভালো," অস্টার জানায়, গতকাল আমি দু ঘণ্টা ধরে জেরা করেছি, পাস হয়ে গেছে। অবশ্য ওর এস.এস. জীবনের বিশেষ বিশেষ তথ্যগুলো

কিছুই জানে না···কি করে তা জানবে ?”

লিওঁ মাথাটাথা নেড়ে অ্যাটাচিকেস থেকে কিছু কাগজপত্তর বের করে আনলো।

“কল্‌বের এস.এস. জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না,” সে বললো, “অবশ্য তেমন কিছুই নেই নিশ্চয়ই, নইলে ফেরারী তালিকায় তার নাম থাকতো। কেউ ওর নামও শোনেনি। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ওডেসাও নিশ্চয়ই তার নাম জানে না। অসুবিধা হলো শুধু যে তাহলে ওর পালিয়ে থাকবার বা ওডেসার কাছ থেকে সাহায্য চাইবার প্রয়োজনটা কি। সেইজন্যে আমরাই ওর একটা জীবন বানিয়ে তুলেছি। এই যে, এখানে লেখা রয়েছে।”

কাগজগুলো অস্টারের হাতে দিয়ে দিলো। মন দিয়ে সেগুলো পড়ে অস্টার বললো, “ভালোই। জানা তথ্যগুলোর সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। আর এরকম হলে ওর পক্ষে পালিয়ে থাকবার যথেষ্ট কারণও আছে।”

লিওঁ খুব খুশী, গাঁক করে শুধু শব্দ করলো।

“ওকে এগুলো শেখাবেন, বুঝেছেন ?···হ্যাঁ, ভালো কথা, ওর জন্যে একজন গ্যারাণ্টারও খুঁজে পেয়েছি। ব্রেমারহ্যাভেনের একজন লোক, আগে যে এস·এস·এর কর্নেল ছিলো, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি জাহাজে করে সমুদ্রভ্রমণে বেরুচ্ছে। লোকটা একটা রুটির কারখানার মালিক। মিলার যখন ওদের কাছে গিয়ে পরিচয় দেবে—সেটা অবশ্য ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পরেই হতে হবে—তখন ওর কাছে এই লোকটার একটা চিঠি থাকবে ; তাতে লেখা থাকবে যে তার কর্মচারী কল্‌ব সত্যিসত্যিই এস.-এস·এর লোক এবং সত্যিই বিপদে পড়েছে সে। ততদিনে রুটিওলা গভীর সাগরে, চেষ্টা করলেও ওরা তার সঙ্গে সংযোগ করে চিঠিটা যাচাই করে নিতে পারবে না।···হ্যাঁ, আর আপনি শুনুন—” মিলারকে একটা বই এগিয়ে দিয়ে বললো, “রুটি গড়ার বিদ্যা শিখে নিন। ১৯৪৫-এর পর থেকেই তো আপনি রুটির কারখানার শ্রমিক।”

জানালো না অবশ্য যে রুটি-কারখানার মালিক শুধু চার সপ্তাহ বাইরে, থাকবে,—ফিরে আসার পর তো মিলারের জীবন সুতোয় ঝুলবে।

"এখন আমার নাপিতভায়া আপনার চেহারাটা কিছু বদলে দেবে," মিলারকে লিওঁ জানালো, "তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে আমরা আপনার ফটো তুলবো।"

ওপরতলার বাথরুমে নাপিত মিলারের চুল একদম ছোট্ট করে ছেঁটে দিলো; জীবনে কোনদিন এমন কদমছাঁট ছাঁটেনি মিলার। চুলের সামান্য রেখামাত্র অবশিষ্ট য়ার মধ্যে দিয়ে ন্যাড়ামুণ্ড চমকাচ্ছে। বয়স যেন এক-লাফে বেড়ে গেলো। মাথার বাঁ ধারে ক্ষুর দিয়ে রুলার-সোজা সিঁথি কেটে দিলো। চোখের ভুরু টেনে টেনে প্রায় সেগুলোকে নির্লোম করে তুললো।

"ন্যাড়া ভুরু দিয়ে মানুষ এমন কিছু বুড়োটে হয়ে যায় না," নরসুন্দর গল্প জোড়ে, "তবে তা করলে বয়স বোঝা যাবে না, ছ-সাত বছর এদিক-ওদিক হয়ে যাবেই। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, আপনাকে একটা গোঁফ গজাতে হবে, পাতলা মতন, আপনার মুখের সমান। ওতে বয়স অনেক বেড়ে যাবে। তিন সপ্তাহে গজিয়ে নিতে পারবেন না?"

মিলার তো জানে তার গোঁফ কত তাড়াতাড়ি বাড়ে। বললো, "নিশ্চয়ই।" আয়নায় নিজের মুখ দেখে। প্রায় তিরিশের মাঝকোটা মনে হচ্ছে এখন। গোঁফ উঠলে অন্তত আরো চারটে বছর তো বয়স বাড়বে।

নীচতলায় নেমে আসতেই, মিলারকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো সাদা একটা চাদরের সামনে। অস্টার এবং লিওঁ দুজনে মিলে ধরাধরি করে চাদরটাকে লম্বা করে ঝুলিয়ে রাখলো। মোট্টি ওর পুরো মুখের কয়েকটা ফটো তুলে নিলো।

"বাস্, এতেই হবে," মোট্টি বললো, "তিনদিনের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দেবো।"

দলটা চলে গেলে অস্টার মিলারের দিকে ফিরলো।

"তাহলে, কল্ব," অনেকদিন ধরেই তাকে এই নামে ডাকছে অস্টার, "তোমার ট্রেনিং হয়েছিলো ডাচাউ এস.এস. শিক্ষাশিবিরে। ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে তোমাকে ফ্রসেনবুর্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিলো। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে যে দলটা অ্যাবওয়েবের নেতা অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে বধ করেছিলো সেই দলের কম্যাণ্ড ছিলো তোমার হাতে। হিটলারকে

হত্যা করবার জন্যে যে চক্রান্ত হয়েছিলো ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে, তাতে আরও কিছু আর্মি অফিসারকে সন্দেহ করেছিলো গেস্টাপো, এবং তাদের অনেককেই হত্যা করবার ব্যাপারে তোমার হাত ছিলো। কাজেই এখন-কার কর্তৃপক্ষ তোমাকে তো গ্রেপ্তার করতে চাইবেই, অ্যাডমিরাল ক্যানারিস বা তার লোকেরা তো ইহুদী ছিলো না। সেকথা ভুললে চলবে না।… আচ্ছা, কাজে নামা যাক, স্টাফ সার্জেণ্ট।"

মোসাদের সাপ্তাহিক মিটিঙ প্রায় শেষ হয়ে আসতেই জেনারেল আমিত হাত তুললেন। বললেন, "শুনুন, আর একটা ব্যাপার আছে, অবশ্য সেটাকে আমি ততখানি গুরুত্ব দিই না। ম্যুনিখ থেকে লিওঁ জানিয়েছে যে কিছুদিন ধরে সে একটি জার্মান-আর্যকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করে নিচ্ছে ওডেসার ভেতরে ঢোকাবার জন্যে, লোকটা নাকি নিজের থেকেই কোন কারণে এস.এস.এর ওপর দারুণ খাপ্পা।"

"কেন, কারণটা কি?" সন্দেহভরা প্রশ্ন জাগে কারো কণ্ঠে।

জেনারেল আমিত শূন্যে হাতটাত ছোঁড়েন। "নিজস্ব কোন কারণ আছে তার, যেজন্যে সে রশম্যান নামে এস.এস.এর জনৈক ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বের করতে চায়।"

অত্যাচারিত দেশগুলোর জন্যে যে দপ্তর তার কর্তা, একজন প্রাক্তন পোলিশ ইহুদী, ধাঁ করে মাথা তুলে বললেন, "এডুয়ার্ড রশম্যান…রিগার কশাই?"

"হ্যাঁ, তাকেই।"

"ইস্, তাকে যদি একবার হাতে পেতাম, শোধ নিয়ে নিতাম।"

জেনারেল আমিত মাথা ঝাঁকালেন। "নাঃ, আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি, শোধবোধের পালা আর ইস্রায়েলের নেই। আমার ওপর অলঙ্ঘ্য আদেশ দেওয়া আছে। রশম্যানকে যদি লোকটা খুঁজেও পায় কোন-রকম হত্যাটত্যা ঘটবে না। বেন গালের ব্যাপারটার পর এরকম কিছু ঘটলে অ্যাডেনয়ের ক্ষেপে যাবে। মুশকিল কি জানেন, জার্মানীতে কোন ভূতপূর্ব নাৎসী মারা গেলেই ইস্রায়েলি অনুচরদের দোষ হয়।"

"তাহলে এই তরুণ জার্মানকে দিয়ে আমাদের কি লাভ?" শাবাখের প্রধান জানতে চাইলেন।

"আমি তাকে দিয়ে অন্যান্য নাৎসী বৈজ্ঞানিকদের খবর জানতে চাই, যাদের এই বছরে হয়তো কায়রোয় পাঠানো হবে। আমাদের পক্ষে সেটাই সর্বপ্রধান, পয়লা নম্বরের, কাজ। তাই আমি জার্মানীতে আমাদের একজন চর পাঠাতে চাই যে এই যুবকটিকে চোখে চোখে রাখবে। শুধু পাহারা রাখা, আর কিছু না।"

"এ রকম লোক আছে আপনার নজরে?"

"হ্যাঁ," জেনারেল আমিত বললেন, "আছে। ভালো লোক, বিশ্বস্ত। সে শুধু ওই জার্মানটাকে অনুসরণ করবে, পাহারা রাখবে তার কাজের ওপর, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খবর পাঠাবে। জার্মান বলে অনায়াসে চালিয়ে নেবে সে। লোকটা একজন ইয়েক্কে, কার্লশ্রু থেকে এসেছে।"

"কিন্তু লিওঁ? সে যদি তার নিজের মতো করে কিছু করতে চায়, তার শোধবোধের হিসেব মিলিয়ে নেবার জন্যে?" কে একজন প্রশ্ন করলো।

"নাঃ, লিওঁকে যা বলা হবে তাই সে করবে," রেগে উঠলেন জেনারেল আমিত, "শোধবোধের পালা শেষ, বললামই তো।"

সেই সকালে বেরোথে মিলারকে আরেকবার ঘষছিলো অ্যালফ্রেড অস্টার।

"এস.এস.দের ছোরার বাঁটে কি কি লেখা থাকে?"

"রক্ত এবং সম্মান।"

"ছোরা কখন তাদের উপহার দেওয়া হয়?"

"শিক্ষাশিবিরের শেষে পাসিং-আউট প্যারেডে।"

"বেশ। অ্যাডলফ হিটলারের ওপর বিশ্বস্ততার শপথটা মুখস্থ বলো।"

গড়গড় করে বলে যায় মিলার নির্ভুলভাবে।

"এস.এস.দের রক্ত-শপথ আবৃত্তি করো।"

করলো মিলার।

"মৃত্যু-মস্তক প্রতীকের অর্থ কি?"

চোখ বন্ধ করে মিলার তাকে যা শেখানো হয়েছে বলে গেলো:

"মৃত্যু-মস্তকের চিহ্ন প্রাচীন জার্মানিক উপকথা থেকে গৃহীত। টিউটনিক যোদ্ধাদের মধ্যে কোন কোন দলে নেতা এবং পরস্পরের প্রতি শাশ্বত ঐক্যের প্রতীক হিসাবে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। শুধু যে আমৃত্যুই তারা একে অন্যের রক্ষা করবে তাই নয়, সমাধিভূমিতেও অনুসরণ করবে এবং মৃত্যুর অপর পারে ভালহাল্লাতেও। সেইজন্যেই করোটি এবং ক্রশ-করা অস্থি,...মরণ পেরিয়ে যা ভিন্ন জগতের অর্থবহ।"

"বেশ। এস.এস. হলেই কি তাকে মৃত্যু-মস্তকবাহিনীর সদস্য হতে হতো?"

"না; কিন্তু শপথবাক্য একই।"

অস্টার উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা টান-টান করে নেয়।

"মন্দ নয়। প্রায় সবই শিখে গেছো দেখছি, আর কিছু মনে করতে পারছি না। এখন এসো, তোমার ফৌজ, বাহিনী এবং কর্মস্থলের কিছু কথা তোমাকে শিখিয়ে দেওয়া যাক। শুধুমাত্র একটা জায়গাতেই তোমার পোস্টিং হয়েছিলো, ফ্লসেনবুর্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানে..."

এথেন্স ছেড়ে ম্যুনিখের দিকে চলেছে অলিম্পিক এয়ারওয়েজের বিমান। জানলার ধারে চুপচাপ বসে আছে একটি লোক পারিপার্শ্বিক ভুলে। তার পাশে বসে আছে একজন জার্মান ব্যবসায়ী। কয়েকবার সে চেষ্টা করলো সহযাত্রীটির সঙ্গে আলাপ জমাতে কিন্তু তার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে প্লেবয় পত্রিকায় মন দিলো। সহযাত্রীটি তখন তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে; পায়ের নীচে ঈজিয়ান সাগর পেরিয়ে গেলো, পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের রৌদ্রময় অঞ্চল ছেড়ে বিমান এখন ডোলোমাইট এবং ব্যাভেরিয়ান আল্পসের হিমশীর্ষ পাহাড়ের দিকে চলেছে।

ব্যবসায়ীটি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলো যে তার সহযাত্রী নিঃসন্দেহে জার্মান। তার ভাষা যেমন চমৎকার ত্রুটিহীন, তেমনি দেশটার সম্বন্ধে তার জ্ঞানও নির্ভুল। গ্রীসের রাজধানীতে কিছু বেচাকেনার কাজ সেরে দেশে

ফিরতে ফিরতে ব্যাবসায়ীটি বুঝতে পারে যে তার পাশের আসনে জানলার ধারে যে বসে আছে, সেও তারই স্বদেশের লোক।

কিন্তু ভুল হলো তার। পাশের লোকটা তেত্রিশ বছর আগে জার্মানীতে জন্মেছিলো বটে যখন তার নাম ছিলো, জোসেফ কাপলান, কার্লশ্রুয়ের একজন দরজির ছেলে। হিটলার যখন ক্ষমতায় এলেন তখন সে মোটে তিন বছরের শিশু ; কালো গাড়িতে উঠিয়ে তার বাপ-মাকে যখন নিয়ে গেলো তখন সে সাত বছরের। আরো তিনটে বছর কেটে গেলো ছাতের চোরকুঠরিতে লুকিয়ে থেকে। দশ বছর বয়সে, ১৯৪০ সালে ধরা পড়ে গেলো ; গাড়ি করে তাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। কনসেনট্রেশন শিবিরে শিবিরে কেটে গেলো কৈশোরের প্রথম দিনগুলো ; ও-বয়সের যত ক্ষিপ্রতা, তৎপরতা, অসম সাহস, সব লেগে গেলো শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতেই। ১৯৪৫ পর্যন্ত কোনমতে টিঁকে থাকলো, চোখে তখন শুধু বন্যপশুর মতো প্রবৃত্তিজাত আতঙ্ক আর সন্দেহ। তখন একদিন, মনে পড়ে, একটা বিদেশী লোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো, নাকী-নাকী সুরে কথা বলেছিলো ; তার হাত থেকে হারশে বার নামে একটা জিনিস নিয়ে ছুটে পালিয়েছিলো সে, শিবিরের একটা কোনায় গিয়ে খেতে বসেছিলো, কিন্তু তার আগেই জিনিসটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।

দু বছর পরে, কয়েক পাউণ্ড ওজন বেড়েছে তখন, বয়স হয়েছে সতেরো কিন্তু ক্ষুধা তেমনি অতলান্ত, দুনিয়ার সবকিছুর ওপরে তখন দারুণ সন্দেহ এবং অবিশ্বাস, একটা জাহাজে এসে উঠেছিলো যার নাম 'প্রেসিডেণ্ট ওয়ারফিল্ড' ওরফে 'এক্সোডাস' ; নতুন একটা তটে এসে পৌঁছলো, কার্লশ্রু বা ডাচাউ থেকে যা বহু বহু দূরে।

অনেক বছর কেটে গেলো তারপর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নরম হলো কিছুটা, পরিণত হয়ে উঠলো, অনেক কিছু শিখলো, বিয়ে হলো, দুটো ছেলেমেয়ে হলো, আর্মিতে কমিশন পেলো, তবু ঘৃণা গেলো না সেই দেশের ওপর থেকে যেখানে আজ সে যাচ্ছে। মনের ভাব মনে পুষে রেখে আসতে রাজী হয়েছিলো। গত দশ বছরে এর আগে আরো দুবার এরকম আসতে হয়েছিলো ; আবার জার্মান সাজবার জন্যে শিষ্টতা এবং ভাই-

ভাইএর পালিশ লাগাতে হয়েছিলো আচরণে।

অন্যান্য বন্দোবস্ত সার্ভিস থেকেই করে দেওয়া হয়েছিলো, যথা বুক-পকেটের পাসপোর্টখানা, চিঠিপত্র, কার্ড, দলিল, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের নাগরিকদের উপযুক্ত সমস্ত রকম সাজসজ্জা বা মালপত্র। তাকে সাজানো হয়েছিলো যেন সে বস্ত্রব্যবসাতে ভ্রাম্যমাণ জার্মান বিক্রেতা।

আকাশে মেঘ ক্রমশ ভারী হয়ে উঠলো; জমাট হিম বাতাসে টের পাওয়া গেলো পশ্চিম-ইউরোপ এসে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে শুধু ভাবে তার কাজের কথা; কয়েক দিন কয়েক রাত ধরে কিব্বুৎজে মৃদুভাষী কর্নেলটি যা তাকে পাখিপড়ার মতো শিখিয়েছেন,—কত ইস্রায়েলি চর কর্নেলটি যে সৃষ্টি করেছেন অথচ সফলতা পেয়েছেন কতটুকু!···একটি লোককে অনুসরণ করতে হবে, তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।—একজন জার্মান তার চেয়ে যে চার বছরের ছোট, অথচ সে যা করতে যাচ্ছে অনেকেই তা পারেনি—ওডেসার ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে।—তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তার কৃতকার্যতার পরিমাপ নিতে হবে, দেখতে হবে কাদের সঙ্গে সে সংযোগ করছে বা কারা তার সঙ্গে সংযোগ করছে, যে সমস্ত তথ্যের সে সন্ধান পাবে সেগুলোকে যাচাই করতে হবে, জেনে নিতে হবে রকেটের ওপরে কাজ করবার জন্যে ইজিপ্টে যে নতুন জার্মান বৈজ্ঞানিকদের দল পাঠানো হবে তাদের খবর পেয়েছে কিনা জার্মানটা। অথচ আত্মপরিচয় কখনো দেওয়া চলবে না, নিজে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না। জার্মানটা যা কিছু জানতে পারবে সব খবর তাকে অবিলম্বে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে, কারণ জার্মানটার ছদ্মবেশ খুব বেশীদিন টিকতেই পারে না।···করবেই এ সমস্ত যদিও মোটেই ভালো লাগে না করতে, তবে ভালো লাগতেই হবে এমন তো আর কোন দাবি নেই তার কাছে। ভাগ্য ভালো কেউ বলেনি তাকে যে তাকে আবার জার্মান হতে ভালো লাগতেই হবে। তাকে একথাও কেউ বলেনি যে জার্মানদের সঙ্গে মিশে আনন্দ পাও, তাদের ভাষা বলে আনন্দ পাও বা তাদের সঙ্গে হেসেটেসে কথাটথা বলে বা ঠাট্টা-তামাশা জুড়ে আনন্দ পাও। সেরকম যদি কিছু বলা হতো তাকে, তবে সে তা স্রেফ অস্বীকার করতো। এদের সব্বাইকে সে ঘৃণা করে, যে রিপোর্টারকে

অনুসরণ করতে যাচ্ছে তাকেও। সেই ঘৃণা, কোনদিন, কিছুতেই বদলাবে না, সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।

পরদিন শেষবারের জন্যে অস্টার এবং মিলারের কাছে এলো লিওঁ। লিওঁ এবং মোট্টি ছাড়া এবারে নতুন আরেকজন লোক ছিলো। লোকটা ওদের চেয়ে বয়সে ছোট, বেশ শক্তসমর্থ, রোদে-পোড়া রঙ। মিলারের অনুমান লোকটার বয়স তিরিশের মাঝকোঠায়। তাকে শুধু জোসেফ বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। সারাক্ষণ কিচ্ছু বললো না সে।

"হ্যাঁ, শুনুন," মিলারকে বললো মোট্টি, "আজ আপনার গাড়িটা এখানে নিয়ে এসেছি। শহরের মাঝখানে বাজারের চত্বরে পাবলিক পার্কিং লটে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।" চাবিটা মিলারকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "ওডেসার সঙ্গে যখন দেখা করতে যাবেন গাড়িটা ব্যবহার করবেন না। কারণ সহজেই নজরে পড়বার মতো গাড়ি আপনার, আর তাছাড়া আপনি একজন রুটি-কারখানার শ্রমিক, ক্যাম্পের রক্ষী ছিলেন—সেকথা প্রকাশ হয়ে পড়াতে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অতএব, যখন যাবেন, ট্রেনে করে যাবেন।"

মিলার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো বটে কিন্তু মনে মনে খুব দুঃখিত জাগুয়ার গাড়িটার বিচ্ছেদে।

"আচ্ছা, এই নিন আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, আপনার এখন যা চেহারা সেইরকম ফটো লাগানো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি একটা ফোক্সওয়াগেন চালান, ব্রেমেনে ছেড়ে এসেছেন সেটা কেননা নম্বর দেখলেই পুলিসে আপনাকে ধরবে।"

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখলো মিলার। তার খাটো-চুলওলা ছবি, তবে গোঁফ নেই। বলা যাবে যে সনাক্ত হয়ে যাবার পর গোঁফ গজাচ্ছে চেহারা পাল্টাবার জন্যে।

"যে লোকটা আপনার গ্যারাণ্টার সে নিজেও সে কথা জানে না; আজ সকালে জোয়ারের টানে তার প্রমোদতরণী ব্রেমারহ্যাভেন ছেড়েছে। লোকটি পূর্বতন এস.এস. কর্নেল, এখন রুটির কারখানার মালিক এবং আপনার প্রাক্তন মনিব। তার নাম জোয়াখিম এবারহার্ডট্। এই চিঠিটা

তার কাছ থেকে আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তাকে লেখা। কাগজটা আসল, তার অফিস থেকে নেওয়া। সইটা জাল, একেবারে সুদক্ষ জালিয়াতি। চিঠিটায় বলা হয়েছে যে আপনি আগে এস.এস. ছিলেন, বেশ ভালো লোক, বিশ্বস্ত, সনাক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন বিপদে পড়েছেন, কাজেই চিঠিটার প্রাপককে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনাকে যেন নতুন পরিচয়পত্রটত্র বানিয়ে দেয়।"

লিওঁ চিঠিটা মিলারের হাতে দিলো। পড়ে নিয়ে মিলার আবার সেটা খামে পুরে রাখলো।

"বন্ধ করুন," লিওঁ বললো। মিলার সেটা বন্ধ করলো।

"কার কাছে আমাকে যেতে হবে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

নামঠিকানা-লেখা একটা কাগজ বের করলো লিওঁ। "এই হচ্ছে আপনার লোক, ন্যুরেমবার্গে থাকে। যুদ্ধে সে কি ছিলো আমরা ঠিক জানি না, কারণ নতুন নাম নিয়েছে এখন। তবে আমরা ঠিক জানি যে লোকটা ওডেসার একজন চাঁই। এবারহার্ডটের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার দেখা-টেখা হয়েছে কারণ সেও তো উত্তর-জার্মানীতে ওডেসার একজন বড় রথী। কাজেই, রুটিওলা এবারহার্ডটের এই যে এই ফটোটা, ভালো করে দেখে রাখুন, যদি আপনার লোক আপনাকে তার চেহারার বিবরণ জিজ্ঞেস করে। বুঝেছেন তো?"

এবারহার্ডটের ফটোটা দেখে মিলার মাথা নাড়লো।

"আপনি তৈরি হয়ে নিয়ে কয়েকদিন বরং অপেক্ষা করুন, যদ্দিন এবারহার্ডটের জাহাজ তটভূমির সঙ্গে রেডিও-টেলিফোনের পরিধি পেরিয়ে যায়। আমরা চাই না যে যার সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাচ্ছেন, সে জাহাজটা জার্মানীর জলে থাকতে থাকতেই এবারহার্ডটকে একটা টেলি-ফোন করে। অপেক্ষা করুন যদ্দিন না জাহাজটা মধ্য-আটলান্টিকে গিয়ে পড়ে। আমার মনে হয় পরের বিষ্যুৎবার সকালে গিয়ে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।"

মিলার ঘাড় নাড়লো। "বেশ, বেস্পতিবারেই হবে।"

"দুটো কথা আরো," লিওঁ বলে, "প্রথমত রশম্যানের অনুসন্ধান ছাড়াও,

—যেটা তো আপনি করবেনই—আমরা জানতে চাই যে নাসেরের রকেট বানানোর জন্যে মিশরে বৈজ্ঞানিক পাঠানোর ভার এখন কার হাতে? এই দেশেই, জার্মানীতেই, ওডেসা থেকে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে আমরা জানি। আমরা তাই সঠিকভাবে জানতে চাই, চিফ রিক্রুটিং অফিসারটি কে?··· দ্বিতীয়ত, আমাদের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন। পাবলিক টেলিফোন থেকে এই নম্বরটা ঘোরাবেন।”

মিলারকে একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দিলো।

“এই নম্বরে সব সময় লোক থাকে, আমি না থাকলেও ক্ষতি নেই। যখনই কিছু জানতে পারবেন, এখানে জানিয়ে দেবেন।”

বিশ মিনিট পরে দলটা চলে গেলো।

ম্যুনিখ ফিরে যাবার সময় গাড়ির পেছনদিকে পাশাপাশি বসেছিলো লিও আর জোসেফ। কোনার দিকে চুপচাপ গুটিয়ে বসেছিলো ইস্রায়েলি চরটি। বেরোথের মিটিমিটি আলোগুলো পেছনে চলে যেতেই, লিও কনুই দিয়ে জোসেফকে একটু ধাক্কা দিলো।

“কি ব্যাপার? মুখ এমন আঁধার করে বসে আছেন কেন? সব তো ঠিকমত চলেছে।”

জোসেফ ওর দিকে চাইলো। “মিলারের ওপর কতটা ভরসা করা যায়?”

“ভরসা? আরে মশায়, ওডেসার ভেতরে ঢুকবার এমন সুযোগ আমরা আর কখনো পাইনি। অস্টারের কথা তো শুনলেনই। মাথা যদি ঠিক রাখে তো ছোকরা এস.এস. বলে ঠিক চালিয়ে যাবে।”

জোসেফের মন থেকে কিন্তু সন্দেহ ঘোচে না। “আমাকে বলা হয়েছিলো যে ওকে সব সময়ে নজরে রাখতে। কাজেই ও যখন যাবে, আমার উচিত ছিলো ওর পিছনেপিছনে থাকা; কাদের সঙ্গে ওর দেখাটেখা করিয়ে দেওয়া হয় সেগুলো দেখা, ওডেসাতে তাদের কি পরিচয় তা নিরিখ করা এবং সে সমস্ত খবর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া আমার মোটেই উচিত হয়নি।···যখন ওর মর্জি হবে আমাদের টেলিফোন

করবে।···ধরুন, যদি টেলিফোন না করে ?"

লিওঁর মেজাজ চড়ে যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে ওদের আগেও তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।

"আরেকবার ভালো করে শুনুন আপনি। এই লোকটা আমার আবিষ্কার, ওডেসাতে ওকে দিয়ে অনুপ্রবেশ করানো আমার পরিকল্পনা। ও আমার চর। আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষা করেছি ওর মতো কাউকে পেতে যে ইহুদী নয়। ওর পিছনে কাউকে জুড়ে দিই আর ও ফাঁস হয়ে যাক—সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।"

"কিন্তু ও তো আনাড়ি, আমি একজন পেশাদার—"

"হোক। ও একজন আর্য, সে কথাটা ভুলবেন না," লিওঁ সমান তেজে উত্তর দেয়, "ওর প্রয়োজনীয়তা ফুরোতে ফুরোতেও জার্মানীর ভেতরকার দশজন ওডেসার মহারথীদের নাম অন্তত আমরা জানতে পারবো। তারপর তাদের ওপর আমরা একের পর এক কাজ করে যাবো। তাদেরই মধ্যে থাকবে রকেট বৈজ্ঞানিকদের ভর্তি করবার কর্তা।···ভাববেন না মশায়, তাকে আমরা খুঁজে পাবোই, এবং কায়রোতে যে বৈজ্ঞানিকগুলোকে পাঠানোর মনস্থ করেছে তাদের নামও।"

বেরোথে তখন তুষার পড়ছিলো। জানলা দিয়ে একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে মিলার।···টেলিফোনে খবরটবর দেওয়ার বাসনা তার একদম নেই, কারণ রকেট-বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তার লক্ষ্য শুধু একটিই—এডুয়ার্ড রশ্‌ম্যান।

বারো

ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে বুধবার সন্ধ্যায় পিটার মিলার বিদায় নিলো অ্যালফ্রেড অস্টারের কাছ থেকে। বেরোথে তার কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন এস.এস. অফিসারটি মিলারের হাত ঝাঁকিয়ে বললো, "তোমার

সৌভাগ্য কামনা করছি, কল্‌ব। যা জানি সব আমি তোমাকে শিখিয়েছি। তবু একটা ছোট্ট উপদেশ দিয়ে দিচ্ছি। কতদিন তোমার ছদ্মপরিচয় টি'কবে আমি জানি না, হয়তো বেশীদিন নয়। যদি কখনো বোঝো যে কেউ তোমার ছদ্মপরিচয় দেখে ফেলেছে, কোনরকম তর্ক কোরো না, চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের পরিচয়ে ফিরে যেও।"

রেলস্টেশন পর্যন্ত মাইলখানেক পথ মিলার হেঁটেই চললো। ছোট্ট স্টেশন। ন্যুরেমবার্গের টিকিট কিনে ফটক দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাবে, টিকিট-কালেক্টর ওকে বললো, "আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে স্যার। আজ রাতে ন্যুরেমবার্গের ট্রেন দেরি করে আসবে।"

আশ্চর্য হলো মিলার। সময়মত ট্রেন চালানো জার্মান রেলওয়ের বৈশিষ্ট্য।

"কি হয়েছে?" টিকিট-কালেক্টর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যেখানে রেললাইনটা পাহাড়ের ভেতরে ঢুকে গেছে। দু ধারে উপত্যকায় নতুন-পড়া তুষারের স্তূপ।

"লাইনে ভীষণ তুষারপাত হয়েছে। এইমাত্র আমরা খবর পেলাম যে তুষার পরিষ্কার করবার যন্ত্রটাও বিকল হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ারেরা সেটা এখন মেরামত করতে ব্যস্ত।"

বহু বছর সাংবাদিকতা করে করে মিলারের ভীষণ বিশ্রী লাগে এখন ওয়েটিং রুমে থাকতে। জীবনে ওর বহু সময় কেটে গেছে ওগুলোতে; ক্লান্ত অবসন্ন মুহূর্তে ঠাণ্ডা ঘরগুলো কোনরকম মাধুর্যই কোনদিন এনে দিতে পারেনি। ছোট স্টেশনটির বুফেতে গিয়ে এক কাপ কফি গিলতে থাকে। টিকিটের দিকে তাকিয়ে দেখে সেটা পাঞ্চ করা হয়ে গেছে। মানসপটে ভেসে উঠলো পাহাড়ের চড়াইয়ের ওপরে তার কালো জাগুয়ার।

ন্যুরেমবার্গ শহরের ওধারে যদি গাড়ি রেখে দেয়, যেখানে যাবে সেখান থেকে বহুদূরে, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু হবে না···যদি লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তাকে অন্য কোথাও পাঠানো হয় অন্য কোন উপায়ে, তাহলে ম্যুনিখে গাড়ি রেখে যাবে। গ্যারেজেও পার্ক করে যেতে পারে। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে, কেউ খুঁজেও পাবে না। অন্তত কাজ শেষ হওয়ার

আগে তো না। তাছাড়া গাড়িটা কাছেভিতে থাকলে প্রয়োজনে লাগতে পারে, যদি কখনো পালিয়ে যেতে হয়। ব্যাভেরিয়াতে তার কথা লোকে কি করে জানবে, অথবা তার গাড়ির কথা? মোট্টির সাবধানবাণী অবশ্য মনে পড়লো, ওর গাড়িটা চট করে নজরে পড়ে লোকের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্টারের শেষ উপদেশও মনে পড়লো, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে হতে পারে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। গাড়িটা ব্যবহার করা হয়তো বিপজ্জনক, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও তো বিপজ্জনক।···আরও পাঁচ মিনিট ধরে ভাবলো। তারপর কফি-কাপটা শেষ না করেই স্টেশন থেকে হাঁটতে আরম্ভ করলো পাহাড়ের অপর দিকে। দশ মিনিটের মধ্যে গিয়ে জাগুয়ারের চালকের আসনে বসলো; ছুটে চললো শহর ছাড়িয়ে।

ন্যুরেমবার্গ অল্প দূরের পথ। সেখানে পৌঁছে বড় স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে উঠলো মিলার। দুটো দালান পেরিয়ে গলিতে গিয়ে রাখলো তার গাড়ি। তারপর হেঁটেই চললো কিংগস্ গেটের ভেতর দিয়ে মধ্যযুগীয় শহর অ্যালব্রেখট ড্যুরেরের উদ্দেশ্যে।

এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে রাস্তার আলোয় আর জানলাগুলো থেকে আসা আলোর ছটায় দেখা যাচ্ছে প্রাচীর-ঘেরা শহরটায় বাড়িগুলোর অদ্ভুত ধরনের সুতীক্ষ্ণ সব ছাদ, আর তাদের প্রান্তস্থ দেওয়ালগুলোর ত্রিকোণ অংশে নানারকম কারুকার্য। পারিপার্শ্বিক দেখে মনে হয় যেন আবার সেই মধ্যযুগে ফিরে আসা হয়েছে, ফ্রান্সোনিয়ার রাজারা যখন ন্যুরেমবার্গের শাসক ছিলেন; জার্মানিক রাজ্যগুলোর মধ্যে যখন সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী বণিকনগরী ছিলো এই ন্যুরেমবার্গ। কল্পনাও করতে পারা যায় না যে এই শহর ১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তির বোমার আঘাতে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো; এবং আজ সে যা দেখছে এই প্রাচীন স্থাপত্য এবং পাথরে বাঁধানো রাজপথ আবার দ্বিতীয়বার নতুন করে মূল স্থপতির রেখাচিত্র অনুসরণ করে বানানো হয়েছে এই সেদিনমাত্র—১৯৪৫-এর পরে।

বাজারের চৌরাস্তা ছাড়িয়ে দুটো রাস্তার পরে মিলার তার কাঙ্ক্ষিত বাড়িটার সন্ধান পেয়ে গেলো, একদম প্রায় সেণ্ট সেবাল্ড চার্চের যমজ

গম্বুজের তলাতেই। দরজায় গৃহস্বামীর নাম সাঁটা, ঠিক মিলে গেলো তার পকেটের চিঠিতে যে-নাম আছে তার সঙ্গে। ব্রেমেনের জনৈক জোয়াখিম এবারহার্ডটের লেখা পরিচয়পত্র বলেই চিঠিটাকে চালানো যাবে। ভূতপূর্ব এস.এস. কর্নেলটির স্বাক্ষর চমৎকারভাবে নকল করা হয়েছে। অথচ এবারহার্ডটকে মিলার কোনদিন চোখের দেখাই দেখেনি। তাই মনে মনে ভাবে যে এই বাড়ির কর্তাটিও যদি এবারহার্ডটকে না দেখে থাকে তবেই মঙ্গল।

বাজারের চৌরাস্তায় ফিরে এলো আবার। রাতের খানা সারতে হবে কোথাও। দু-তিনটে সনাতনী ফ্রাঙ্কোনিয় কায়দার ভোজনালয়ের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে যেতে চোখে পড়লো সেণ্ট সেবাল্ডের ফটকের সামনে মোড়ের মাথায় একটা ছোট্ট সসেজের দোকানের লাল টালির ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠে উঠে হিমঠাণ্ডা রাতের আকাশে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সুন্দর ছোট্ট দোকানটা; সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা, সেখানে বাক্স করে সার সার বেগুনী রঙের হেস্তার সাজিয়ে রাখা, অতি সযত্নে সেগুলো থেকে সকালের তুষারকণাগুলোও ঝেড়ে ফেলেছে দোকানের মালিক।

ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই একটা স্বাদু উষ্ণতা এবং আতিথ্যের চমৎকার পরিবেশে মনটা ভরে উঠলো। কাঠের টেবিলগুলো একটাও খালি ছিলো না। কিন্তু তখুনি কোনার টেবিল থেকে একজোড়া দম্পতি উঠে যাচ্ছিলেন, মিলার গিয়ে সেখানে বসতেই তাঁরা একগাল হেসে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন।···মিলার সেই দোকানের বিখ্যাত ন্যুরেমবার্গি মসলাদার সসেজের একটা প্লেট আনিয়ে নিলো। বারোটা থাকে একেক থালায়। সেগুলো শেষ করে স্থানীয় মদের একটা বোতল আনিয়ে রাতের খাওয়া সাঙ্গ করলো।

ভোজনপর্বের পরে কফি নিয়ে বসলো। দুটো অ্যাসবাখ দিয়ে কালো পানীয়ের সৎকার করলো। শুতে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছিলো না। চুপচাপ বসে বসে দেখতে বেশ লাগছে; খোলা আগুনের কুণ্ডে কাঠের গুঁড়িগুলো থেকে ধিকিধিকি শিখা জ্বলছে; ওই কোনায় একদঙ্গল লোক হেঁড়ে গলায় ফ্রাঙ্কোনিয় সুরাগীতি গাইছে; সঙ্গীতের তালে তালে তারা হাত ধরাধরি করে এপাশ থেকে ওপাশে দুলছে, প্রতিটা ছত্রের শেষে

আবার মদের গেলাসগুলো ওপরে তুলে ধরে হৈ হৈ করে গানের রব ছাড়ছে।

অনেকক্ষণ বসে থাকে মিলার। মনে মনে ভাবে জীবন বিপন্ন করবার কি দরকার—কুড়ি বছর আগে একটা লোক অপরাধ করেছিলো, এখন তার খোঁজে এসব করবার কি অর্থ?···প্রায় স্থির করে ফেলেছিলো যে নাঃ, আর এসব পাগলামি না, চুলোয় যাকগে সব, গোঁফ কামিয়ে ফেলবে, আবার চুল গজাবে, হাম্বুর্গে ফিরে যাবে, সিগির দেহতাপে উত্তপ্ত বিছানায় গিয়ে ঢুকবে।···ওয়েটার এসে গেলো। মাথা ঝুঁকিয়ে টেবিলে বিল রাখলো। মুখে স্মিতপ্রসন্ন শুভেচ্ছা, 'বিট্টে শন'।

পকেটে হাত পুরে মনিব্যাগ তুলতে গিয়ে একটা ফটোতে আঙুল ঠেকলো। টেনে তুলে সেটাতে চোখ রাখতেই রাগে পিত্তি জ্বলে গেলো তার। লাল অক্ষিকোটরে দুটো নিষ্প্রভ চোখ—ইঁদুর মারার জাঁতাকলের মতো একটা হাঁ-মুখ—কোটের কলারের ওপর থেকে তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কোটের ওপরে কালো প্রতীক আর রৌপ্যবিদ্যুতের শিখা। কিছুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থেকে হিসহিসিয়ে উঠলো মিলার, "বিষ্ঠা কোথা-কার!" ফটোর একটা প্রান্ত তুলে ধরলো তার টেবিলে রাখা মোমবাতির শিখার মাঝখানে। ধীরে ধীরে ছাই হয়ে গেলো ফটোটা। কোন প্রয়োজন নেই আর ফটোর; মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে প্রতিকৃতি, দেখলেই চিনতে পারবে।

খাওয়ার দাম চুকিয়ে কোটের বোতাম বন্ধ করে, পিটার মিলার তার হোটেলে ফিরে গেলো।

ওয়েরউলফ গজরাচ্ছিলো সেই সময়। সামনে বসে ম্যাকেনসেন।

"পাচ্ছো না মানে? বাতাসে মিলিয়ে গেছে? কি, বলতে চাও কি? ওর গাড়ির মতো গাড়ি জার্মানীতে অল্প ক'খানাই আছে; আধ মাইল দূর থেকেও চিনতে পারা যায়। ছ সপ্তাহ ধরে খোঁজাখুঁজি করে এখন বলছো কিনা তাকে খুঁজে পেলে না···"

ম্যাকেনসেন নির্বাক বসে থাকে। আশাভঙ্গের স্ফুরিত ঝটিকাটা আগে থামুক।

পরে সে বললো, "তবু, ব্যাপারটা সেরকমই বটে। ওর হাম্বুর্গের ফ্ল্যাটে কড়া নজর রেখেছি ; ওর বান্ধবী এবং মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি মিলারের বন্ধু সেজে ; ওর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। কেউ কিচ্ছু জানে না। গাড়িটা নিশ্চয়ই কোন গ্যারেজে বন্ধ করে গোপন আশ্রয়ে চলে গেছে। লণ্ডন থেকে ফিরে আসবার পর কলোন হাওয়াই আড্ডার কারপার্ক থেকে গাড়ি নিয়ে দক্ষিণের দিকে ছুটেছিলো সে পর্যন্ত জানি। তারপর আর সন্ধান নেই।"

"কিন্তু তাকে যে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের," ওয়েরউলফ আবার বলে, "কমরেডটির কাছে যেন সে কোনমতেই না পৌঁছতে পারে, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"ডুব দিয়ে কতদিন থাকবে, ওপরে ভেসে উঠবেই," ম্যাকেনসেন বলে, কণ্ঠস্বরে তার নিশ্চিত প্রত্যয়। "তখন আমরা পেয়ে যাবো।"

পেশাদার শিকারীটির নিরুত্তাপ ধৈর্য আর যুক্তির সামনে ওয়েরউলফের অধীরতা ভেসে গেলো। বিবেচনা করে দেখলো যে ম্যাকেনসেন ঠিকই বলছে। "বেশ, তাহলে আমার কাছাকাছিই থাকো বরং। শহরে একটা হোটেলে গিয়ে ওঠো, সেখান থেকেই অপেক্ষা করা যাবে। তুমি কাছে থাকলে আমি চট করে তোমাকে পেতে পারবো।"

"আচ্ছা স্যার। শহরের মাঝখানে কোন হোটেলে গিয়ে উঠছি, সেখান থেকে ফোন করে আপনাকে জানিয়ে দেবো। যে কোন সময় আপনি ইচ্ছে করলেই, ডেকে পাঠাতে পারেন।"

ওপরওলাকে শুভরাত্রি জানিয়ে ম্যাকেনসেন চলে গেলো।...

পরদিন বেলা নটা নাগাদ মিলার এই বাড়িতে এসে পৌঁছলো। ঝকঝকে পালিশ-করা ঘণ্টাটা ধরে নাড়িয়ে দিলো। সকাল সকাল এসেছে যাতে লোকটাকে বাড়িতে পাওয়া যায়, কাজে বেরিয়ে পড়বার আগেই ধরতে পারে। একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিলো। বসার ঘর দেখিয়ে দিয়ে গৃহকর্তাকে ডাকতে চলে গেলো।

দশ মিনিট পরে বসার ঘরে এসে যে ঢুকলো তার বয়স প্রায় মধ্যপঞ্চাশ, চুলের রঙ কটা, দুধারে রগের কাছে রুপোলি ছিটে ; বেশ আত্মবিশ্বাসী

এবং সম্ভ্রান্ত ধরনের চেহারা। ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জায় সম্পদ এবং সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

অপ্রত্যাশিত অতিথিটির দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোন কৌতূহল নেই। সস্তা দামের প্যাণ্ট আর জ্যাকেট পরা আছে দেখে বুঝতে পারে লোকটা শ্রমিকশ্রেণীর।

"কি করতে পারি আমি?" ধীর ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে।

অতিথির ভাবভঙ্গী দেখে বোঝা যায় যে সে বেশ ঘাবড়ে গেছে, এত ধনবৈভবের মধ্যে যেন আরো বেশী হতচকিত। বলে,…"অ্যাঁ…হের ডকটর, ভাবছিলাম যে আপনিই আমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবেন।"

"ওঃ!" ওডেসার আঞ্চলিক প্রধান বলে ওঠে, "নিশ্চয়ই জানেন যে আমার অফিস এখান থেকে বেশীদূরে নয়। আপনি বরং সেখানে গিয়ে আমার সেক্রেটারিকে বলে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে নিন।"

"না, মানে…ঠিক উকিলের বুদ্ধি নিতে আসিনি, বোঝলেন, মক্কেল নই আমি—" হাম্বুর্গ এবং ব্রেমেন অঞ্চলে কথ্যভাষা শুরু করে দেয় মিলার, খেটে-খাওয়া মানুষের ভাষা। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বেশ ঘাবড়ে গেছে সে। ভাষা খুঁজে না পেয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে হঠাৎ একটা চিঠি বের করে হুট করে এগিয়ে ধরলো।

"একটা চিঠি নি এসেছি স্যার, তিনি বল্লেন আপনার কাছে আসতে।"

বিনাবাক্যব্যয়ে চিঠিটাকে নিয়ে ওডেসার লোকটি খাম খুলে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেলো। পড়তেই ঈষৎ ভাবান্তর দেখা গেলো তার ভাবভঙ্গীতে, যেন একটু ধাতব কঠিন হয়ে উঠলো তার অঙ্গসঞ্চালন। চিঠিটার কাগজের ওপর দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে মিলারকে দেখতে দেখতে বললো, "ওঃ! আচ্ছা, হের কল্‌ব, বোসো তো দেখি।"

সোজা খাড়া একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলো মিলারকে। নিজে কিন্তু বসলো বেশ আয়েসী ধরনের একটা আরামকেদারায়। কয়েক মিনিট ধরে অতিথির দিকে চেয়ে থাকে যেন যাচাই করে নিচ্ছে, ভুরু দুটো কুঁচকেই আছে। হঠাৎ তেড়ে ওঠবার মতো ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করে ওঠে, "কি যেন

নাম বললে তোমার ?"

"কল্ব, স্যার।"

"প্রথম নাম ?"

"রল্ফ গুন্থের, স্যার।"

"কোন সনাক্তপত্র আছে তোমার কাছে ?"

বুঝতে পারলো না যেন মিলার। "শুধু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স-খানা।"

"দেখি।"

উকিলটি,—কারণ সত্যি সত্যিই লোকটির পেশা ওকালতি,—হাত বাড়িয়ে দিলো। মিলার ধাঁ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে প্যাণ্টের পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে এনে ওর হাতে গুঁজে দিলো। লোকটি সেটা খুলে নিয়ে ভেতরের বিবরণগুলো পড়ে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলো মিলারকে। বেশ মিলে যাচ্ছে।

"জন্মতারিখ কত ?" ধমক দিয়ে ওঠে যেন।

"আমার জন্মতারিখ, আজ্ঞে ?···১৮ই জুন, স্যার।"

"সাল বলো কল্ব।"

"উনিশ শো পঁচিশ, স্যার।"

আবার কয়েক মিনিট ধরে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় উকিলটি। "অপেক্ষা করো, আমি আসছি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গোটা বাড়িটা ভেতর থেকে প্রদক্ষিণ করে পেছন-দিকের অংশে চলে এলো। এখানেই ওর ওকালতি সেরেস্তা, অন্য আর একটা রাস্তার ওপর। মক্কেলরা সেই রাস্তা ধরেই আসে। অফিসের ভেতরে ঢুকে সোজা দেওয়াল-সংলগ্ন সিন্দুক খুলে ফেললো। মোটা একটা বই বের করে নিয়ে পাতা উলটে গেলো।

জোয়াখিম এবারহার্ডটের নাম শোনা ছিলো, কিন্তু মানুষটাকে কখনো দেখেনি। এস.এস.এ তার শেষ র‍্যাঙ্কও ঠিক জানা নেই। বইটা থেকে উত্তর পেয়ে গেলো। জোয়াখিম এবারহার্ডট···ওয়াফেন-এস·এস.এ কর্নেল পদে উন্নীত, ১০ই জানুয়ারি ১৯৪৫।···আরো কয়েক পৃষ্ঠা উলটে কল্ব

নামটি খুঁজলো। সাতটা কল্‌ব আছে, কিন্তু একটাই রল্‌ফ গুন্থের। এপ্রিল, ১৯৪৫ থেকে স্টাফ সার্জেন্ট। জন্মের তারিখ ১৮.৬.২৫। বাড়ির মধ্যে দিয়ে আবার বসার ঘরে ফিরে এলো। অতিথিটি তখনো সেই খাড়া চেয়ারে জবুথুবু হয়ে বসে আছে।

আবার আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিলো গৃহস্বামী।

"তোমাকে সাহায্য করা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে, তা তো বোঝো তুমি…না?"

মিলার দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে মাথা নাড়লো।

"কোথাও যাবার উপায় নেই, স্যার। ওরা আমাকে খুঁজছিলো যখন, সোজা চলে এলাম হের এবারহার্ডটের কাছে। তিনিই তো চিঠিটা দিলেন, বললেন আপনার কাছে যেন আসি। বললেন আপনি যদি কিছু না করতে পারেন, কেউ পারবে না।"

উকিলটি ছাতের দিকে দৃষ্টি মেলে গা এলিয়ে বসে রইলো। নিজের সঙ্গেই যেন কথা কয়ে উঠলো।

"আশ্চর্য, তাহলে আমাকে উনি ফোন করলেন না কেন?" চুপ করে গেলো কিন্তু তক্ষুনি।…চুপচাপ…যেন জবাবের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেয়েছে এমন ভঙ্গী করে মিলার বলে উঠলো, "না স্যার, হয়তো ফোন করতে চাননি…এরকম একটা ব্যাপার।"

উকিলটি বিরক্তির দৃষ্টি হানলো তার দিকে। "কি বাজে বকছো, ফোন করা যাবে না কেন?…যাক, এরকম গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি কি করে গিয়ে পড়লে?"

"হ্যাঁ, স্যার…মানে লোকটা তো আমাকে চিনে ফেললো তখন, ওরা বললো যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে। তাই বেরিয়ে পড়লাম; বেরোতে তো হবেই, কি বলেন?"

উকিলটি বড় করে শ্বাস ফেলে বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "গোড়া থেকে আরম্ভ করো তো বাপু। কে তোমাকে চিনলো, কি বলে চিনলো?"

মিলার একবুক হাওয়া টেনে নিলো। "আমি আজ্ঞে ব্রেমেনে ছিলাম। ওখানেই থাকি, কাজ করি…মানে করতাম আর কি এইটা ঘটবার আগে

পর্যন্ত…হের এবারহার্ডটের ওখানে। তাঁর রুটির কারখানায়। একদিন বোঝলেন, প্রায় মাসচারেক আগে, রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, শরীরটা কেমন করে উঠলো। পেটে ভীষণ ব্যথা, চিনচিনিয়ে উঠছে। কিছু আর মনে নেই, মূর্ছা গিয়েছিলাম ফুটপাতের ওপর। ওরা আমাকে তখন হাসপাতালে রেখে গেলো।"

"কোন্ হাসপাতাল ?"

"ব্রেমেন জেনারেল, স্যার। কি সব পরীক্ষা-ফরীক্ষা করেছিলো, বললো আমার ক্যান্সার হয়েছে। পেটের ভেতর। ভাবলাম আমার কপাল !"

"কপালের লিখন আর কে খণ্ডাতে পারে, বলো ?" শুকনো গলায় উকিলটি মন্তব্য করে।

"আমিও তাই বলি, স্যার। যাক গে, রোগটা নাকি গোড়াতেই ধরা পড়েছিলো। সে হিসাবে আমার কপাল ভালোই। ওরা অপারেশন না করে ওষুধপত্তর দিতে থাকলো, কিছুদিন পরে ক্যান্সার কাবুতে এলো।"

"তুমি তো খুব ভাগ্যবান দেখছি।…তা তোমাকে চিনে ফেলার ব্যাপারটা কি ?"

"সে এক বৃত্তান্ত, স্যার। হাসপাতালে একজন অর্ডার্লি ছিলো বোঝ-লেন, ইহুদী, লোকটা সব সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ডিউটিতে যখনই আসতো, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে। খুব অস্বস্তি হতো আমার। ভাবনায় পড়লাম ; কেমন যেন চাউনি, যেন বলতে চায় 'তোমাকে চিনে ফেলেছি।' আমি অবশ্য তাকে চিনতে পারলাম না, তবে বুঝতে পারলাম ও আমাকে চিনেছে।"

"হ্যাঁ, তারপর ?" উকিলটির কৌতূহল যেন জেগে উঠেছে।

"মাসখানেক আগে ওরা বললো যে অনেক ভালো হয়ে গেছি, কোন স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারি। রুটিকারখানার কর্মী-ইনস্যুরেন্স থেকে টাকা দেওয়া হলো। ব্রেমেন জেনারেল ছেড়ে আসছি, অমনি আমি তাকে চিনতে পারলাম। মানে ওই ইহুদীর বাচ্চাকে। কয়েক সপ্তাহ লেগেছিলো, তারপর মনে পড়লো। ফ্লসেনবুর্গের বাসিন্দে ছিলো সে।"

উকিল এবারে সটান খাড়া হয়ে বসলো। "ফ্লসেনবুর্গে ছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ, সেই বৃত্তান্তই তো বলছি, স্যার, শোনেন না আগে। হাসপাতালের অর্ডালিকে ঠিক চিনেফেললাম আমি তখন। ব্রেমেন হাসপাতাল থেকে ওর নামও আমি জেনে নিয়েছিলাম। ফ্লসেনবুর্গে আমরা অ্যাডমিরাল ক্যানারিস আর অন্য অফিসারদের ফ্যুয়েরারকে মারার ষড়যন্ত্র করার জন্যে তো গুলি করেছিলাম; তাদের লাশ পোড়াবার জন্যে যে ইহুদী দলটাকে লাগিয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিলো সে।"

উকিলটি তার দিকে পরিপূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো।

"ক্যানারিস আর অন্যদের যারা গুলি করে মেরেছিলো, তাদের মধ্যে তুমি ছিলে?"

মিলার কাঁধ ঝাঁকালো। "আমিই তো দণ্ড পালন করবার দলটার নায়ক ছিলাম," নিস্তরঙ্গ গলায় শুধু বললো, "মানে, ওরা তো বিশ্বাসঘাতকই ছিলো, বলেন? ফ্যুয়েরারকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো?"

উকিল হাসে। "আরে, তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না হে। ওরা তো বিশ্বাসঘাতক ছিলোই। ক্যানারিস আবার মিত্রশক্তির কাছে গোপন খবরগুলোও পাঠাতো। ওরা সবাই বিশ্বাসঘাতক···আর্মির সব শুয়োরগুলো··· জেনারেল থেকে আরম্ভ করে সেপাই পর্যন্ত।···তা নয়, কথা হচ্ছে যে, ওদের মেরেছে যে সেই লোকের আমি সাক্ষাৎ পাবো, মোটেই ভাবিনি।"

মিলার একটু হাসতে চেষ্টা করে। "কিন্তু সেইজন্যেই তো আমাকে ওরা ধরতে চায়। ইহুদী ঠেঙানো আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ক্যানারিস বা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তো শুনছি এখন একেকজন হিরো।"

"হ্যাঁ, তা বটে। এখনকার জার্মান কর্তৃপক্ষ যদি তোমাকে হাতে পায়, মুশকিলে পড়বে তুমি।···যাক, তারপর কি হলো?"

"স্বাস্থ্যনিবাসে বদলি হয়ে এলাম, ইহুদী অর্ডার্লিটাকেও আর দেখতে পেলাম না। কিন্তু গত শুক্রবার আমার নামে একটা টেলিফোন এলো স্বাস্থ্যনিবাসে। ভেবেছিলাম রুটির কারখানা থেকে হয়তো কেউ খোঁজ নিচ্ছে। লোকটা কিন্তু নাম বললো না; শুধু বললো যে অনেক খবরটবর সে রাখে, এবং জানে যে আমি যে কে সে খবর চলে গেছে কোনো একটি

বিশেষ লোকের কাছে আর তার কাছ থেকে লুডউইগসবুর্গের কুত্তাগুলো জেনে গেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পরোয়ানা নাকি জারি হচ্ছে। লোকটা যে কে বুঝতে পারলাম না, তবে গলা শুনে মনে হলো যা বলছে সঠিক জেনেই তবে বলছে। সরকারী আমলা-ফামলার মতো জোরদার কণ্ঠস্বর···বোঝলেন না কি বলছি?"

বুঝমানের মতোই মাথা নাড়ে উকিল। "হয়তো ব্রেমেন পুলিস ফৌজের কোন দোস্ত হবে। তা তুমি কি করলে?"

অবাক হয়ে তাকালো মিলার। "কি করলাম স্যার? পালালাম। স্রেফ সটকে পড়লাম। তাছাড়া আর কি করার ছিলো বলেন? বাড়িও যাইনি, যদি ওখানে ওরা আমার জন্যে বসে থাকে। আমার ফোক্সওয়াগেনখানাও নিতে যাইনি, ওটা এখনো আমার ঝোপড়ির সামনে দাঁড় করানো আছে। শুক্রবার রাতে রাস্তাতেই কাটালাম। শনিবারে একটা মতলব খেললো মাথায়। গেলাম কর্তার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে—মানে, হের এবারহার্ডটের সঙ্গে। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তো তাঁর ঠিকানা আছে। খুব ভালো ব্যবহার করলেন তিনি। বললেন, পরদিন সকালেই জাহাজে পাড়ি দিচ্ছেন গিন্নীকে নিয়ে—শখের ভ্রমণ আর কি। তবু···আমার একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন। তখনই তো এই চিঠি দিলেন আপনার নামে, বললেন আপনার সঙ্গে যেন আমি দেখা করি।"

"হের এবারহার্ডট যে তোমাকে সাহায্য করবে কি করে জানলে?"

"ও হ্যাঁ—সে এক ঘটনা। দেখেন, উনি যে যুদ্ধে ছিলেন আমি জানতাম না। তবে কারখানায় আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন বটে। বছর দুয়েক আগে আমাদের সব কর্মীদের একটা পার্টি হয়েছিলো একদিন। আমরা সবাই একটু রঙে ছিলাম, বোঝলেন না? আমি একবার পুরুষের ঘরে গেলাম। দেখলাম সেখানে হের এবারহার্ডট হাতটাত ধুচ্ছেন আর গান করছেন। আর কি আশ্চর্য; জানেন কোন্ গান? হর্স্ট ওয়েসেল গীত, আমিও যোগ দিলাম। বাথরুমে আমরা দুজনে সেদিন প্রাণভরে সেই গান গাইলাম; তারপর আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'একটি কথাও না কল্‌ব, বুঝলে।' এই কাহিনী আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু

এখন বিপদে পড়তেই আবার মনে পড়লো। ভাবলাম, উনিও বোধহয় আমার মতো এস.এস.এ ছিলেন। তাই তাঁর কাছেই গেলাম সাহায্যের জন্যে।"

"আর তোমাকে তিনি আমার কাছে পাঠালেন—কেমন ?"

মিলার মাথা নাড়ে।

"ইহুদী অর্ডার্লিটার নাম কি ?"

"হার্টস্টাইন, স্যার।"

"যে স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলে তার নাম ?"

"আর্কাডিয়া ক্লিনিক, ব্রেমেনের বাইরে ডেলমেনহর্স্টে।"

উকিলটি একটা কাগজে কিছু লিখেটিখে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

"বসো একটু," বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অলিন্দ পেরিয়ে পড়ার ঘরে এসে ঢোকে। টেলিফোন এনকোয়ারি থেকে তিনটে নম্বর জেনে নেয়—এবারহার্ডটের রুটি-কারখানার, ব্রেমেন জেনারেল হসপিটালের ও ডেলমেনহর্স্টের আর্কাডিয়া ক্লিনিকের। প্রথমে রুটির কারখানায় টেলিফোন করে।

এবারহার্ডটের সেক্রেটারি বেশ চটপটে। বললো, "হের এবারহার্ডট ছুটিতে গেছেন, স্যার।…নাঃ, তাঁর সঙ্গে সংযোগ করা অসম্ভব। প্রতি শীতেই যেমন যান, এবারেও গেছেন জাহাজে চড়ে, ক্যারিবিয়ানসে, ফ্রাউ এবারহার্ডটকে সঙ্গে নিয়ে।…চার সপ্তাহ পরে ফিরবেন।…আমি কিছু করতে পারি আপনার জন্যে ?"

"না, কিছু না, ধন্যবাদ।"

তারপর ব্রেমেন জেনারেলে ফোন করে কর্মী-শাখার সঙ্গে সংযোগ চায়।

"দেখুন, আমি সমাজকল্যাণ বিভাগের পেনসন শাখা থেকে বলছি," মোলায়েম গলায় উকিলটি বলে, "আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে আপনাদের ওখানে হার্টস্টাইন নামে একজন অর্ডার্লি কাজ করে।"

একটু বিরতি পড়ে কথাবার্তায়। হাসপাতালের মেয়েটি তখন কর্মীদের ফাইল ঘাঁটছে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ," খুঁজে পেয়ে মেয়েটি বলে, "আছে বটে, ডেভিড হার্টস্টাইন।"

"ধন্যবাদ।" ন্যুরেমবার্গে উকিলটি ফোন রেখে দিয়ে আবার ওই নম্বর ঘোরালো। এবারে চাইলো রেজিস্ট্রারের অফিস।

"আমি এবারহার্ডট বেকিং কোম্পানির সেক্রেটারি," ফোনে বলে যায় সে, "আমাদের একজন কর্মী আপনাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো, পেটে টিউমার। রুগীর নাম রল্‌ফ গুন্থের কল্‌ব। তার অবস্থা এখন কেমন জানতে পারি কি?"

"ধরুন একটু।" মেয়ে কেরানীটি রল্‌ফ গুন্থের কল্‌বের ফাইল বের করে শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে টেলিফোনে জানায়, "দেখুন, রুগীকে তো ডিসচার্জ করা হয়ে গেছে।" তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়াতে স্বাস্থ্য-নিবাসে বদলি করা হয়েছে।"

"বাঃ, বেশ সুখবর," উকিলটি স্মিতকণ্ঠে বলে, "আমি আবার বৎসরান্তের ছুটি নিয়ে স্কি করতে গিয়েছিলাম তো, তাই সব খবর এখনো জেনে উঠতে পারিনি। আচ্ছা, বলতে পারেন, কোন্ স্বাস্থ্যনিবাস?"

"ডেলমেনহর্স্টের আর্কাডিয়া।"

ফোন রেখে দিয়ে এবারে আর্কাডিয়া ক্লিনিকের নম্বর ঘোরায়।

নারীকণ্ঠের উত্তর ভেসে আসে। অনুরোধ শুনে নিয়ে মেয়েটি তার পাশে দণ্ডায়মান ডাক্তারের দিকে চায়। হাতের তালু দিয়ে মাউথপীসটাকে ভালো করে বন্ধ করে রাখে।

"আপনি আমাকে যে লোকটির কথা বলেছিলেন, তার সম্বন্ধে খোঁজ করছে।"

ডাক্তার নিজেই টেলিফোন ধরলো। "বলুন, আমি এই ক্লিনিকের চীফ, ডাঃ ব্রউন বলছি। কি করতে পারি আপনার জন্যে?"

ব্রউন নাম শুনে সেক্রেটারিটি তার মনিবের দিকে কেমন বোকার মতো চায়। ডাক্তারের কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ন্যুরেমবার্গ থেকে ভেসে আসা কথাগুলো শুনে নিয়ে সবিনয়ে জানায়, "দেখুন, হের কল্‌ব গত শুক্রবার বিকেলে নিজে থেকেই ক্লিনিক ছেড়ে চলে গেছেন, কাউকে না জানিয়ে। অত্যন্ত গর্হিত কাজ, কিন্তু আমরা আর কি করতে পারি বলুন?…

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, ব্রেমেন জেনারেল থেকেই এসেছিলেন।…পেটে টিউমর হয়েছিলো, প্রায় সেরে এসেছে।"

আরো একমুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে নিয়ে বলে, "না না, তাতে আর কি ? আপনার সাহায্যে যে আসতে পেরেছি তাই যথেষ্ট।"

ডাক্তারের আসল নাম রোজমেয়ার ; টেলিফোন রেখে দিয়ে এবারে ম্যুনিখের একটা নম্বর সে ঘোরায়। কোনোরকম ভনিতা না করে সিধে বললো, "কল্‌বের সম্বন্ধে কেউ ফোনে প্রশ্ন করছিলো। যাচাই করা শুরু হয়ে গেছে।"

ন্যুরেমবার্গে টেলিফোন রেখে দিয়ে উকিল তার বসার ঘরে ফিরে এলো।

"হুঁ কল্‌ব…তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি যে পরিচয় দিয়েছো, সত্যিই তুমি তাই।"

বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে ওঠে মিলারের। "অ্যাঁ !"

"তবু আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। মনে করবে না তো কিছু ?"

বিস্ময় কাটেনি মিলারের। ঘোরের মধ্যেই যেন মাথা নাড়ে। "না, স্যার।"

"বেশ। তোমার সুন্নত করা আছে কি ?"

বোকার মতো চেয়ে থাকে মিলার। কোনমতে বলে, "না।"

"দেখাও আমাকে," শান্তস্বরে উকিলটি বলে ওঠে। মিলার কিন্তু তার চেয়ারে বসে শুধু তাকিয়েই থাকে তার দিকে, কিছুই করে না। দেখানোর কোনই আগ্রহ নেই।

"আমাকে দেখাও, স্টাফ সার্জেন্ট," কড়া হুকুমের ভঙ্গীতে বলে ওঠে উকিলটি।

এক লাফে মিলার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, "জু বেফেল।"

সেই সটান-টান অবস্থায় খাড়া সামনের দিকে চেয়ে, চোখ না নামিয়েই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর সাহায্যে প্যান্টের বোতাম ঘরের জিপ টেনে নামিয়ে

দেয় মিলার। একমুহূর্ত সেদিকে চেয়ে দেখে উকিল আবার তাকে ইশারা করলো ওটা বন্ধ করে রাখতে।

মৃদু উচ্চারণে বলে এবার, "হুঁ···অন্তত ইহুদী যে নও তা বোঝা গেলো।"

চেয়ারে গিয়ে বসেছিলো মিলার, সেখান থেকেই আবার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তার। কোনমতে বলে ওঠে, "ইহুদী তো নই।

উকিলটি হাসে। "তবু আগে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে, ইহুদীরা কামেরাড সেজে চলে এসেছে। বেশীদিন অবশ্য টেকেনি কেউই।···যাক, তোমার কাহিনী আমি আবার শুনতে চাই। প্রশ্ন করবো, উত্তর দেবে; পরখ করে দেখা আর কি, বুঝলে?···কোথায় জন্মেছিলে তুমি?"

"ব্রেমেন, স্যার।"

"ঠিক। তোমার এস.এস. রেকর্ডসেও তাই লেখা আছে, আমি দেখে এসেছি। তরুণ-হিটলারে ছিলে?"

"হ্যাঁ, স্যার। দশ বছর বয়সে ঢুকেছিলাম, ১৯৩৫ সালে, স্যার।"

"তোমার বাপ-মা—তাঁরাও কি সুযোগ্য ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার, দুজনেই।"

"তাঁদের কি হয়েছিলো?"

"ব্রেমেনের বিরাট বোমাবর্ষণে মারা গেছে।"

"এস.এস.এ কবে ঢুকেছিলে?"

"১৯৪৪-এর বসন্তে স্যার। আঠারো বছরে।"

"কোথায় ট্রেনিং হয়েছিলো?"

"ডাচাউ শিক্ষাশিবিরে, স্যার।"

"তোমার ডান বগলে তোমার ব্লাডগ্রুপ উল্কি করা আছে?"

"না স্যার। কিন্তু থাকলে তা বাঁ বগলে থাকতো, ডান বগলে নয়।"

"কেন তোমার উল্কি করা নেই?"

"ব্যাপারটা কি জানেন, স্যার। শিক্ষাশিবির থেকে আমাদের পাস করে বেরুনোর তো কথা ছিলো ১৯৪৪-এর আগস্টে। সেখান থেকে

আমরা চলে যেতাম ওয়াফেন-এস·এস.এর কোন ইউনিটে প্রথম পোস্টিং পেয়ে। কিন্তু ফ্যুয়েরারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্যে তখন বহু আর্মি অফিসারকে ধরে ফ্লসেনবুর্গ ক্যাম্পে চালান করা হয় জুলাই মাসে। ফলে ফ্লসেনবুর্গে বহু লোকের দরকার হয়; ডাচাউ শিক্ষাশিবির থেকে অবিলম্বে লোক পাঠানোর তলব আসে। আমি আর জনদশেক অন্য শিক্ষার্থী সোজা ওখানে পোস্টিংয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট হই; বিশেষ কুশলতার জন্যেই আমাদের নাকি বাছা হয়েছিলো। শিক্ষার শেষে তাই পাসিং-আউট প্যারেডও আমাদের ভাগ্যে জুটলো না, উল্কির ছাপও বাদ গেলো। কম্যাণ্ডাণ্ট অবশ্য বলেছিলেন ব্লাডগ্রুপের দরকার নেই, ফ্রণ্টে আমাদের কখনোই পাঠানো হবে না।"

উকিলটি মাথা নাড়ে। ১৯৪৪-এর জুলাই··· ফ্রান্সের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছে মিত্রশক্তি···কম্যাণ্ডাণ্ট বলবেনই তো···যুদ্ধ শেষ হয়ে আসবার তখন আর দেরি কোথায়।

"ছোরা পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার। কম্যাণ্ডাণ্টের হাত থেকে।"

"কি লেখা আছে তার ওপর?"

"'রক্ত এবং সম্মান', স্যার।"

"ডাচাউয়ে কি ধরনের শিক্ষা পেয়েছিলে?"

"পুরো সামরিক শিক্ষা স্যার আর রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষা, তরুণ-হিটলারে যা শেখানো হয়েছিলো তার পরিপূরণ।"

"গানগুলো শিখেছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"হর্স্ট ওয়েসেল গীত কোন্ কুচকাওয়াজ-সঙ্গীতের বই থেকে নেওয়া হয়েছে?"

"'দেশের তরে সংগ্রামের হয়েছে এখন সময়' সেই গীতিকা থেকে স্যার।"

"ডাচাউ শিক্ষাশিবির কোথায় ছিলো?"

"ম্যুনিখের দশ মাইল উত্তরে, স্যার। ওই নামের কন্সেনট্রেশন ক্যাম্প

থেকে তিন মাইল দূরে।"

"তোমার ইউনিফর্ম কি ছিলো ?"

"ধূসর-সবুজ রঙের টিউনিক আর ব্রিচেস, জ্যাকবুট, কালো রঙের কলার-লেপেল, বাঁ ধারে র‍্যাঙ্ক, কালো চামড়ার বেল্ট আর গান মেটালের বকলশ।"

"বকলশে কি আদর্শ-বাণী লেখা ?"

"মাঝখানে একটা স্বস্তিকা স্যার, তার চারধারে গোল করে লেখা : আমার বিশ্বস্ততাই আমার সম্মান।"

উকিলটি উঠে হাত-পা টান-টান করে নেয়। একটা চুরুট ধরিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়।

"আচ্ছা, এখন ফ্লসেনবুর্গ শিবির সম্বন্ধে কিছু বলো, স্টাফ সার্জেন্ট কল্‌ব। কোথায় সেটা ?"

"ব্যাভেরিয়া এবং থুরিঙ্গিয়ার সীমানায়, স্যার।"

"কবে খোলা হয়েছিলো ?"

"১৯৩৪ সালে স্যার। ফ্যুয়েরারের বিরুদ্ধে যারা কাজ করছিলো সেই শুয়োরের বাচ্চাগুলোর জন্যে প্রথম যেগুলো খোলা হয়েছিলো তাদেরই একটা।"

"কত বড় ছিলো ?"

"আমি যখন ছিলাম, স্যার, লম্বায় ছিলো ৩০০ মিটার, চওড়াতেও ৩০০ মিটার। উনিশটা প্রহরীস্তম্ভ চারধার ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো; তাদের প্রত্যেকটাতে ভারী আর হালকা দুরকম মেশিনগানই চড়ানো ছিলো। নাম ডাকবার চত্বরখানা ছিলো ১২০ মিটার বাই ১৪০ মিটার। হা ভগবান্‌, আমরা যা মজা করেছিলাম ওখানে, ইদস্‌গুলোকে নিয়ে…"

"বাজে কথা ছাড়ো," ধমকে ওঠে উকিল, "থাকবার জায়গা কি ছিলো ?"

"চব্বিশটা ব্যারাক, বাসিন্দেদের জন্যে একটা রান্নাঘর, একটা ধোওয়া-পাখলার ঘর, একটা স্যানাটোরিয়াম আর নানারকম কারখানা।"

"এস.এস. রক্ষীদের জন্যে ?"

"দুটো ব্যারাক, একটা দোকান আর একটা বোর্ডেলো।"

"যারা মরতো তাদের লাশগুলো কি করতে ?"

"তারকাঁটার ওপাশে ছোট্ট একটা দাহঘর ছিলো। শিবিরের ভেতর থেকে মাটির তলায় একটা সুরঙ্গ দিয়ে সেখানে যাওয়া যেতো।"

"কি ধরনের কাজ হতো ওখানে ?"

"খাতে পাথর ভাঙা স্যার। খাতটাও ছিলো তারের বাইরে ; সেখানে ওদের নিজস্ব তারকাঁটার বেড়া আর প্রহরীস্তম্ভও ছিলো।"

"১৯৪৪-এর শেষভাগে কত জনসংখ্যা ছিলো সেখানে ?"

"প্রায় ১৬০০০ বাসিন্দে, স্যার।"

"অধিনায়কের অফিস ছিলো কোথায় ?"

"তারের বাইরে, স্যার। একটা টিলার মাঝখানে, শিবিরের দিকে ঝুঁকে।"

"অধিনায়কদের নাম বলো পর পর ?"

"আমি ওখানে যাবার আগে তুজন ছিলেন। প্রথমজন হলেন এস.এস. মেজর কার্ল কুন্‌স্টলার, তাঁর পরে এস.এস.-ক্যাপ্টেন কার্ল ফ্রিৎশ। শেষের-জন ছিলেন এস.এস.-লেফটন্যাণ্ট কর্নেল ম্যাক্স কোয়েগেল।"

"রাজনৈতিক বিভাগের নম্বর কত ?"

"তু নম্বর বিভাগ, স্যার।"

"কোথায় ছিলো সেটা ?"

"অধিনায়কের ব্লকে।"

"তাদের ডিউটি কি ছিলো ?"

"বার্লিন থেকে যদি কারো জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ আসতো তবে তা পালন করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা।"

"ব্যানারিস এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের ক্ষেত্রে সেরকম নির্দেশ এসে-ছিলো ?"

"হ্যাঁ স্যার। তাদের সবায়ের জন্যেই বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ ছিলো।"

"কবে সেটা পালন করা হয় ?"

"১৯৪৫-এর ২০শে এপ্রিল, স্যার। ব্যাভেরিয়ার ভেতর দিয়ে আমেরি-কানেরা চলে আসছিলো, তাই হুকুম এলো তাদের শেষ করে ফেলতে।

আমাদের কজনকে নিয়ে একটা দল গড়ে কাজটা আমাদের দেওয়া হলো। তখন আমি সবে প্রমোশন পেয়েছি স্টাফ সার্জেণ্টের; ক্যাম্পে যখন এসেছিলাম তখন তো শুধু এস.এস. সিপাই ছিলাম। ক্যানারিস এবং অন্য পাঁচজনের বন্দোবস্ত করার ভার ছিলো আমার ওপর। তারপর আমরা ইহুদীদের মধ্যে থেকে একটা সৎকার-দল গড়ে লাশগুলোর ব্যবস্থা করলাম। হার্টস্টাইন ব্যাটা ওই দলেই ছিলো শালা—কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ক্যাম্পের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেললাম। দুদিন পর হুকুম এলো বন্দীদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যেন আমরা উত্তরদিকে চলে যাই। পথে যেতে যেতে শুনলাম যে ফ্যুয়েরার আত্মহত্যা করেছেন। তারপর স্যার, অফিসারেরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বন্দীরা পালাতে শুরু করলো জঙ্গলের দিকে। আমরা স্টাফ সার্জেণ্টরা যদিও গুলি করে গোটাকয়েককে মারলাম, কিন্তু আর মার্চ করে যাবার কোন মানে ছিলো না। ইয়াঙ্কিরা তখন সব জায়গায় এসে গিয়েছিলো।"

"ক্যাম্প সম্বন্ধে একটা শেষ প্রশ্ন, স্টাফ সার্জেণ্ট। ক্যাম্পের ভেতরে কোন জায়গা থেকে যদি ঊর্ধ্বদিকে তাকাও, কি দেখতে পাও?"

মিলার হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমতা-আমতা করে বলে, "আকাশ।"

"দূর গর্দভ, দিগন্তে কি দেখা যেতো?"

"ওঃ! মানে ওই পাহাড়টা আর তার ওপরে ওই ভাঙা-ভাঙা দুর্গ?"

উকিল মাথা নাড়তে নাড়তে হাসে। "আসলে চতুর্দশ শতাব্দীর হে!··· যাক কল্‌ব, ফ্লসেনবুর্গে তুমি ছিলে। কিন্তু পালালে কি করে তারপর?"

"আপনাকে তো বললাম স্যার, আমাদের মার্চ তো গেলো লণ্ডভণ্ড হয়ে। আমি দেখলাম কি, একটা আর্মির জওয়ান এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মাথায় মারলাম এক বাড়ি, নিয়ে নিলাম তার পোশাক। ইয়াঙ্কিরা তার দুদিন পরে আমাকে পাকড়াও করলো। দু বছর আমি যুদ্ধ-বন্দীর শিবিরে কাটালাম। কিন্তু ওদের বলেছিলাম যে আমি একজন আর্মির জওয়ান। জানেন তো স্যার, চারদিকে তখন গুজব যে ইয়াঙ্কিরা এস.এস.দের দেখলেই গুলি করে মারছে। তাই আমি বলেছিলাম যে আমি আর্মির লোক।"

উকিল একমুখ ধুঁয়ো ছাড়লো। "তুমি একাই ওরকম করোনি। যাক, নাম বদলেছিলে?"

"না স্যার। কাগজগুলো ফেলে দিয়েছিলাম, নইলে চিনতে পারবে এস.এস. বলে। তবে নাম বদলানোর কথা মনে আসেনি। চিন্তাই করিনি যে কোন স্টাফ সার্জেণ্টকে কেউ খুঁজবে। সেই সময় ক্যানারিসকে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাতো না, লোকে ওদের নিয়ে হট্টগোল শুরু করলো তো বহুদিন পরে। বার্লিনে যেখানে ওই চক্রান্তের কিছু পাণ্ডাকে ধরে ফাঁসি দিয়েছিলো, আজ সেখানে বেদী সাজিয়েছে। তবে তদ্দিনে ফেডারাল রিপাবলিকের কাগজ এসে গেছে আমার কাছে, কল্‌ব নামে। কিছুই কিন্তু হতো না যদি ওই অর্ডার্লি আমাকে চিনতে না পারতো। আর যদি চিনতেই পারলো তো নাম বদলিয়ে কি লাভ!"

"তা বটে।...আচ্ছা, যা শিখেছিলে তুমি, তার কিছু কিছু আবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। দেখি, ফ্যুয়েরারের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথটা বলো তো?"

তিন ঘণ্টা ধরে এইরকম চললো। ঘাম ফুটে ওঠে মিলারের গায়ে। কোন-রকমে একসময়ে বলে যে তাড়াতাড়ি হসপিটাল ছেড়ে চলে এসেছে, সারা-দিন খাওয়া হয়নি তার। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাবার পর তখন উকিলের জেরা শেষ হলো। সন্তুষ্ট হয়েছে এতক্ষণে।

"কি চাও তুমি?" মিলারকে জিজ্ঞেস করলো।

"মানে, ওরা তো আমাকে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে স্যার, তাই আমার দরকার এখন নতুন কিছু কাগজপত্তর, যাতে বোঝা যায় যে আমি রল্‌ফ গুন্থের কল্‌ব নই। চেহারা বদলে ফেলতে পারবো, চুল লম্বা করে গজিয়ে নেবো, গোঁফটাকে বাড়াবো, ব্যাভেরিয়া বা অন্য কোথাও একটা চাকরিও জুটিয়ে নিতে পারি। মানে, আমি রুটি গড়তে পারি তো, বেকারির কাজে বেশ সুদক্ষ, আর লোকেরও তো রুটির দরকার, কি বলেন?"

সাক্ষাৎকার শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার উকিলটি দুলে দুলে হাসে, মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে।

"বেশ বলেছো কল্‌ব, লোকের তো রুটির দরকার বটেই!...আচ্ছা

শোনো, সাধারণত তোমার অবস্থার লোকেদের জন্যে কেউ সময় বা অর্থ-ব্যয় করে না। তবে তুমি আজ বিপাকে পড়েছো তোমার কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও এবং দেখছি তুমি বেশ সৎ এবং দেশপ্রেমী জার্মান, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করবো। নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই, তাতে তো তুমি সামাজিক নিরাপত্তার কার্ড পাবে না, জন্মপত্র না দেখালে। অথচ সেটা তো তোমার কাছে নেই। তবে নতুন পাসপোর্ট যদি থাকে কাছে, সব পেতে পারো।···টাকা আছে তোমার সঙ্গে?"

"না স্যার, একেবারে কপর্দকহীন। গত তিনদিন ধরে তো হিচহাইক করে এলাম দক্ষিণে।"

উকিলটি একশো মার্কের নোট বের করে একটা।

"দেখো, এখানে তোমার থাকা চলবে না। আর নতুন পাসপোর্ট আসতেও অন্তত এক সপ্তাহ সময় লাগবে। আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর কাছে পাঠাবো, তিনি তোমাকে পাসপোর্ট পাইয়ে দেবেন। তিনি থাকেন স্টুটগার্টে। কোন একটা সাধারণ হোটেলে গিয়ে ওঠো, সেখান থেকে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেও। আমি তাঁকে তোমার আসার খবর জানিয়ে দেবো, তিনি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবেন।"

কাগজের একটা টুকরো নিয়ে কিসব লেখে উকিল।

"ওঁর নাম ফ্রানৎস বেয়ার, এই হলো গিয়ে তাঁর ঠিকানা। ট্রেনে করে চলে যাও স্টুটগার্ট। হোটেলে উঠে সোজা তাঁর কাছে যাও। যদি আরো কিছু টাকার দরকার হয় তো তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। তবে পাগলের মতো খরচা করো না। গা ঢাকা দিয়ে থেকো যদ্দিন না বেয়ার নতুন পাসপোর্ট জোগাড় করে দেন। তারপর দক্ষিণ-জার্মানীতে আমরা তোমার জন্যে একটা চাকরির বন্দোবস্ত করে দেবো, কেউ কোনদিন তোমার সন্ধান পাবে না।"

মিলার সলজ্জ ধন্যবাদ জানিয়ে একশো মার্কের নোট আর বেয়ারের ঠিকানাটা পকেটে পুরলো। "ধন্যবাদ হের ডকটর, আপনি সত্যিই মহান।"

পরিচারিকা এসে ওকে বাইরের দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। হাঁটতে হাঁটতে মিলার তারপর চলে এলো তার হোটেলে।···এক ঘণ্টা পর যখন

তার জাগুয়ার ছুটে চললো স্টুটগার্টের দিকে, তখন উকিলটি টেলিফোন করে বেয়ারকে জানিয়ে দিলো যে আজ সন্ধ্যা নাগাদ রল্‌ফ গুন্থের কল্‌ব নামে একজন লোক এসে তার সঙ্গে দেখা করবে···কল্‌ব আপাতত পুলিসের নজর এড়িয়ে চলেছে।

ম্যাপ দেখে দেখে মিলার তার গাড়িটাকে নিয়ে ঢুকলো পাহাড়ের উপত্যকায়। চমৎকার একটা বাটির মতো গড়ন তার, স্টুটগার্টের কেন্দ্রস্থল। ···বেয়ারের বাড়ি থেকে প্রায় পোয়ামাইল দূরে গাড়িটাকে রেখে দিলো। দরজায় চাবি দিতে দিতে তাকিয়েও দেখলো না যে একজন মধ্যবয়সী মহিলা কাছাকাছি ভিলা হসপিটাল থেকে হসপিটাল ভিজিটার্স কমিটির সাপ্তাহিক মিটিঙ সেরে, তার গাড়ির পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলো।

সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় ন্যুরেমবার্গের উকিলটি আবার বেয়ারের বাড়িতে টেলিফোন করলো। উদ্দেশ্য হচ্ছে জেনে নেওয়া যে পলাতক কল্‌ব নিরাপদে এসে পৌঁছুলো কিনা। বেয়ার-গিন্নী ফোন ধরলো।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যুবক মানুষটি তো?···হ্যাঁ।···সে আর আমার স্বামী দুজনে বাইরে কোথাও ডিনার খেতে গেছে।"

"ওঃ!···আমি টেলিফোন করলাম শুধু এই কথাই জানতে, নিরাপদে পৌঁছেছে কিনা।"

"কি সুন্দর মানুষটি!" উৎফুল্লকণ্ঠ ফ্রাউ বেয়ারের, "গাড়ি রাখছিলো যখন, তখনই তার পাশ দিয়ে আমি এসেছিলাম। হসপিটাল ভিজিটার্স কমিটি মিটিঙ থেকে ফিরছি তখন দেখলাম। কিন্তু বাড়ি থেকে কতদূরে! রাস্তা হারিয়েছিলো বোধহয় বেচারা। হতে পারে···স্টুটগার্ট জানেন তো··· এই রাস্তা উঠেছে, এই নেমেছে···"

"মাপ করবেন, ফ্রাউ বেয়ার," উকিল ওকে থামিয়ে দিলো, "ওর সঙ্গে তো ওর ফোকসওয়াগেন ছিলো না, ট্রেনে এসেছে।"

"না না, কি যে বলেন! গাড়িতে এসেছে। কি সুন্দর যুবক, আর কি চমৎকার গাড়ি! মেয়েরা তো বোধহয় ওকে পেলে মূর্ছা যায়···"

"ফ্রাউ বেয়ার, শুনুন, এবারে মন দিয়ে শুনুন। ভীষণ প্রয়োজনীয়

ব্যাপার। কি ধরনের গাড়ি ?”

“মেক তো আমি চিনি না। তবে স্পোর্টস গাড়ি। লম্বা কালো, একটা লম্বালম্বি হলুদ টান…”

ঝপ করে উকিল ফোন রেখে দিলো। আবার একটা স্থানীয় নম্বর ঘোরায়। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে গেছে। হোটেলের সংযোগ পেতেই একটা ঘরের নম্বর চাইলো। পরিচিত গলায় সাড়া এলো, “হ্যালো।”

“ম্যাকেনসেন,” ওয়েরউলফ খেঁকিয়ে উঠলো, “চলে এসো ঝটপট, মিলারকে পাওয়া গেছে।”

তের

ফ্রানৎস বেয়ার তার বৌয়ের মতোই মোটাসোটা হাসিখুশী মানুষ। ওয়েরউলফ খবর পাঠিয়েছে, তাই সন্ধ্যা থেকেই আশা করছে লোকটা বুঝি এই এলো। আটটার একটু পরেই মিলার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই হাসিমুখে তার অভ্যর্থনা করলো।

হলঘরে ঢোকবার মুখটায় বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। কিন্তু বেয়ার-গিন্নীর অত সময় কই, তড়িঘড়ি রান্নাঘরে ছোটে।

বেয়ার শুধোয়, “কল্‌ব মশায়, আগে কোনদিন উর্টেনবার্গে এসেছেন ?”

“না, কোনদিন না।”

“আহা রে ! জানেন আমরা ভীষণ অতিথিবৎসল। খাবেন নিশ্চয়ই কিছু এখন, তাই না ? আজ সারাদিন কিছু খাবার জুটেছে তো ?”

“উঁহু…।” মিলার বিশদ করে জানিয়ে দিলো, কিছুই জোটেনি তার, না সকালে না দুপুরে। সারাদিন কেবল ট্রেনে ট্রেনেই কেটেছে।

বেয়ার তাই শুনে প্রায় কপাল চাপড়ায়। “ইস্‌, কি কষ্ট গেছে আপনার মশাই, এক্ষুনি কিছু মুখে দিন। হ্যাঁ, এক কাজ করা যাক; চলুন, শহরে গিয়ে কোথাও পেট পুরে ডিনার খাওয়া যাক।…আরে না না, তাতে কি, এ আর এমন কি ! তোমাকে দুটি খাওয়াবো—এঃ, তুমি বলে ফেললাম, কিছু

মনে কোরো না, বয়সে তুমি ছোকরা—"

থপথপিয়ে চলে গেলো বাড়ির মধ্যে, বৌকে বলে আসতে যে অতিথিকে নিয়ে স্টুটগার্ট শহরের মধ্যে চললো কোন হোটেলে খানাপিনা সারতে। দশ মিনিট পর বেয়ারের গাড়িতে করে ওরা দুজনে চললো শহরের মাঝখানে।

ন্যুরেমবার্গ থেকে স্টুটগার্ট পুরনো ই-১২নং জাতীয় সড়ক ধরে অন্তত দু ঘণ্টার পথ, তা যত জোরেই গাড়ি চালানো যাক। ম্যাকেনসেন সেই রাত্রে গাড়ি চালালোও বটে। ওয়েরউলফের টেলিফোন পাওয়ার আধ-ঘণ্টার মধ্যে, সব খবরাখবর নিয়ে, বেয়ারের ঠিকানা কণ্ঠস্থ করে বেরিয়ে পড়েছিলো। সাড়ে দশটায় সোজা বেয়ারের বাড়িতে এসে পৌঁছলো।

ফ্রাউ বেয়ার ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলো। একে তো ওয়েরউলফ আবার টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলো যে কল্‌ব বলে যে লোকটা নিজের পরিচয় দিচ্ছে সে সত্যিকারের কল্‌ব তো নয়ই, বরং পুলিসের চর বলেই মনে হচ্ছে, তায় আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে হোঁৎকা মতন এক জোয়ান এসে উপস্থিত। আর ম্যাকেনসেনের কথা বলার ধরনধারণও তো কিছু ভরসা জাগানোর মতো নয়।

"কখন গেছে ওরা ?"

"সোয়া আটটা নাগাদ," কাঠ-কাঠ গলায় বেয়ার-গিন্নী জানায়।

"বলেছিলো কোথায় যাচ্ছে ?"

"নাঃ। ফ্রানৎস বললো ছোকরা সারাদিন খায়নি, তাকে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে শহরের কোন রেস্তোরাঁয়। আমি বললাম বাড়িতেই কিছু বানিয়ে দিচ্ছি, তা না, চললেন বাইরে। ফ্রানৎসের তো একটা ছুতো হলেই হলো…"

"এই যে কল্‌ব লোকটা…আপনি বললেন যে তার গাড়ি পার্ক করার সময় আপনি দেখেছিলেন…কোথায় সেটা ?"

ফ্রাউ বেয়ার বিস্তারিত বলে গেলো কোন্ রাস্তায় কোথায় জাগুয়ারটা রেখে দিয়েছে, কি করে সেখানে যেতে হয়। ম্যাকেনসেন মিনিটখানেক গভীরভাবে ভাবলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, কোন্ রেস্তোরাঁয়

আপনার কর্তা যেতে পারেন বলে আপনার মনে হয়?"

একটুক্ষণ ভেবেচিন্তে ফ্রাউ বেয়ার বলে, "ওঁর প্রিয় দোকান হচ্ছে ফ্রেড-রিক স্ট্রাসের ওপর তিন মুর রেস্তোরাঁ। সেখানেই প্রথমে ঢুঁ মারবে।"

ম্যাকেনসেন বেয়ারের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে এলো যেখানে জাগুয়ারটা রাখা আছে। ভালো করে গাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো—যেন মুখস্থ করে রাখছে, দেখলেই যাতে আবার চিনতে পারে। একটু দোনামোনা করলো, মিলারের ফেরা অব্দি অপেক্ষা করবে নাকি। কিন্তু ওয়েরউলফের নির্দেশ হচ্ছে মিলার ও বেয়ারকে খুঁজে বের করা, তারপর ওডেসার লোকটিকে সাবধান করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মিলারের ব্যবস্থা করা। সেই জন্যেই তিন মুরে টেলিফোনও করলো না। বেয়ারকে এখন সাবধান করে দিলেই মিলার জানতে পারবে যে তার ছদ্মবেশ ফেঁসে গেছে, তাহলে অদৃশ্য হয়ে যাবার সুযোগ আবার সে পেয়ে যাবে।

ঘড়ি দেখলো ম্যাকেনসেন। এগারোটা বাজতে দশ। তার মার্সিডিজে চড়ে সে চললো এবার শহরের মাঝখানে।

ম্যুনিখের এঁদোপাড়ায় ছোট্ট একটা অখ্যাত হোটেলে জোসেফ তার খাটে চিৎপাত হয়ে শুয়েছিলো। হোটেলের অফিস থেকে খবর এলো যে তার একটা কেব্‌ল্ এসেছে। নীচে গিয়ে সেটা নিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

নড়বড়ে টেবিলটায় বসে বাদামী রঙের খামটা খুললো। বেশ দীর্ঘ তারবার্তা। লেখা ছিলো:

'খরিদ্দার যে সমস্ত মালের অনুসন্ধান করিয়াছেন সেগুলির নিম্নরূপ দর আমরা দিতে পারি:

সেলেরি:	৪৮১ মার্ক, ৫৩ ফেনিগ
খরমুজ:	৩৬২ মার্ক, ১৭ ফেনিগ
কমলা:	৬২৭ মার্ক, ২৪ ফেনিগ
সরবতি লেবু:	৩১৩ মার্ক, ৮৮ ফেনিগ…'

ফল এবং তরিতরকারীর লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া ছিলো। সাধারণত এই সব মাল ইস্রায়েল থেকে রপ্তানিও করা হয়, তাই কেব্‌ল্‌টা পড়লে মনে

হবে যে-কোন রপ্তানি-ঘর থেকে তাদের জার্মানীস্থিত প্রতিনিধিকে দরের কোটেশন পাঠানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক তারঘর থেকে কেব্‌ল্ পাঠানো হয়তো বিপদসঙ্কুল, কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপে রোজ এত সংখ্যক বাণিজ্যিক তারবার্তার চলাচল হয় যে সবগুলো বাছতে গেলে প্রচুর লোক লাগবে।

কথাগুলোকে বাদ দিয়ে জোসেফ শুধু সংখ্যাগুলো লম্বা লাইনে সাজিয়ে গেলো। মার্ক আর ফেনিগে ভাগ করা অংশগুলো উড়ে গিয়ে পাঁচ-অঙ্কের একেকটা সংখ্যা হলো। লম্বা লাইনে সেগুলো পর পর লিখে গিয়ে ছ-অঙ্কের সংখ্যায় ভাগ-ভাগ করলো। প্রত্যেকটা ছ-অঙ্কের সংখ্যা থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪, এই তারিখটাকে বিয়োগ করলো, তারিখটা সংখ্যায় লেখা হয়েছিলো ২০২৬৪। বিয়োগ করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফল হলো আরেকটা করে ছ-অঙ্কের সংখ্যা।

সঙ্কেত খুবই সরল। কেতাবি কোড, নিউ ইয়র্কের পপুলার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত ওয়েবস্টারের 'নিউ ওয়ার্ড ডিক্সনারি'র পেপারব্যাক সংস্করণের ওপর যার ভিত্তি। ছ-অঙ্কের ওই সংখ্যাগুলোর প্রথম তিনটে সংখ্যার অর্থ ওই অভিধানের পৃষ্ঠাসংখ্যা ; চতুর্থ সংখ্যাটি এক থেকে নয় অব্দি যা কিছু হতে পারে. বিজোড় সংখ্যা হলে প্রথম স্তম্ভ, জোড়সংখ্যা হলে দ্বিতীয়; শেষ দুটি সংখ্যার অর্থ ওই স্তম্ভে ওপর থেকে অত নম্বর শব্দ। আধ ঘণ্টা ধরে সমানে কাজ করে গেলো জোসেফ। তারপর বার্তার সঙ্কেত-বাক্য পড়ে নিয়ে দু হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলো। তিরিশ মিনিট পর লিওঁর বাড়িতে লিওঁর সঙ্গে সে বসে ছিলো। চক্রান্তকারী দলটির নেতাও সঙ্কেতবার্তাটি পড়েই যেন শিউরে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে শুধু বললো, "দুঃখিত। আগে আমি জানতে পারিনি।"

এরা দুজনেই কিন্তু জানতো না যে গত ছ দিনে মোসাদের কাছে তিনটে সংক্ষিপ্ত সমাচারবার্তা এসেছিলো।...প্রথমটা এসেছিলো বুয়েনস আয়ার্স থেকে। সেখানকার স্থানীয় ইস্রায়েলি প্রতিনিধি জানিয়েছিলো যে জনৈক ভালকানকে দশ লক্ষ জার্মান মার্কের সমমূল্য অর্থ দেবার অনুমোদন দিয়েছে কেউ একজন, যাতে সে 'গবেষণা প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে।"

দ্বিতীয়টা এসেছিলো স্যুইস ব্যাঙ্কের কোন একজন ইহুদী কর্মচারীর কাছ থেকে। লোকটা সাধারণত গোপন নাৎসী তহবিল থেকে পশ্চিম-ইউরোপস্থিত ওডেসার কাছে অর্থ হস্তান্তরের কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকতো। সে জানিয়েছিলো যে ব্যাঙ্কে বেইরুট থেকে দশ লক্ষ মার্ক এসে জমা পড়েছিলো কোন এক ফ্রিৎজ ওয়েগনারের অ্যাকাউণ্টে; দশ বছর ধরে যে অ্যাকাউণ্ট চলেছে; নগদ অর্থে সেই টাকাটা সমস্ত তুলে নেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় সমাচার পাওয়া গিয়েছিলো জনৈক মিশরীয় কর্নেলের কাছ থেকে। কর্নেলটি ৩৩৩ নং কারখানার ধারেকাছে সুরক্ষাযন্ত্রে বেশ উঁচু পদে বহাল ছিলো। তাকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে আরামপ্রদ অবসর জীবনের নক্‌শা এঁকে রোমের একটা হোটেলে নিয়ে আসা হয়েছিলো। সেখানে সে মোসাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা বলে। ফলে জানা যায় যে রকেট-প্রকল্পের জন্যে এখন শুধু নির্ভরযোগ্য টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম আবশ্যক, বাকি সব কাজ হয়ে গেছে। সেই সিস্টেমের গবেষণা এবং নির্মাণ হচ্ছে পশ্চিম-জার্মানীর কোন কারখানায় এবং তার জন্যে ওডেসার দশ লক্ষ মার্কের মতো আরো খরচ হবে।

এই তিনটে খবরের টুকরো আরো হাজার হাজার খবরের সঙ্গে গিয়ে জমা পড়লো ইস্রায়েলের কম্প্যুটার ব্যাঙ্কে, অধ্যাপক ইউভেল নীমান যার অধিকর্তা। অপূর্ব প্রতিভা এই ইস্রায়েলি বৈজ্ঞানিকের। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলেন কম্প্যুটারের মাধ্যমে তথ্যবিশ্লেষণে; পরে তিনিই ইস্রায়েলি আণব বোমার জনক হন। মানুষের স্মৃতিশক্তি অকৃতকার্য হলেও, কম্প্যুটার যন্ত্রে হাজার হাজার খবরের মধ্যে এই খবর তিনটে এক-সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং পূর্বগৃহীত খবর থেকে টেনে বের করে আনে যে ১৯৫৫ সালে যখন রশম্যানের বৌ তার স্বামীর পরিচয় ফাঁস করে দেয় তখন রশম্যান নিজের ছদ্মনাম নিয়েছিলো ফ্রিৎজ ওয়েগনার।…

লিওঁর ভূতল হেডকোয়ার্টারে তখন জোসেফ বলছিলো, "আমি এখন থেকে এখানেই থাকছি, ওই টেলিফোনের কাছ ছাড়ছি না। আমাকে একটা শক্তিমান মোটর-সাইকেল আর নিরাপদ পোশাক এনে দিন তো। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই যেন পেয়ে যাই। যে মুহূর্তে আপনার মিলার খবর দেবে,

কালবিলম্ব না করে আমাকে তার কাছে যেতে হবে।"

"ও যদি ফেঁসে যায় তো আপনি যত তাড়াতাড়িই করুন, কোন লাভ নেই," লিওঁ বললো, "সাধে ওরা ওকে সাবধান করে দিয়েছিলো ; ওই মানুষের এক মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুলেও কি আর ওকে আস্ত রাখবে !"

লিওঁ পাতালকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। আরেকবার জোসেফ সেই খোলস-ছাড়ানো কেব্‌ল্‌টাতে চোখ বুলোলো। তেল আভিভ থেকে জানানো হচ্ছে :

অতি সাবধান/নতুন খবরে জানা যাচ্ছে রকেটের কৃতকার্যতার চাবি-কাঠি তোমার প্রদেশেই জার্মান শিল্পপতির হাতে/সঙ্কেতনাম ভালকান/ পরিচয় বোধহয় রশম্যান/মিলারকে অবিলম্বে লাগিয়ে দাও/খুঁজে বের করে নিঃশেষ করে দিও/কর্মর্‌য়্যাণ্ট।

টেবিলে বসে জোসেফ তার ওয়ালথার পি.পি.কে. অটোমেটিকটাকে সাফ করে নিয়ে গুলি ভরতে থাকে। মাঝেমাঝেই নির্বাক টেলিফোন যন্ত্রটা টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে।

ডিনারে বেয়ারের ভীষণ ফুর্তি, ঠাট্টামস্করা হাসি-তামাশা বাণ ডাকিয়ে দিলো একেবারে। মিলার বারেবারেই নতুন পাসপোর্টের কথা তোলে, কিন্তু সেদিকে তাকে ভেড়ায় কার সাধ্য !

প্রত্যেকবারেই ওর পিঠে বেশ ভারী ওজনের চাপড়টাপড় মেরে বলে, "আরে, তার জন্যে চিন্তা করছো কেন সাঙাৎ···ফ্রানৎস বেয়ারের ওপর সব ছেড়ে দাও।"

বলেই নিজের নাকে নিজেই টোকা মেরে চোখ মটকে আবার আমোদের রাজ্যে ফিরে যায়।

আট বছর ধরে রিপোর্টারগিরি করে একটা জিনিস শিখেছে মিলার, কি করে চোখের পাতা না কাঁপিয়ে মদ গিলতে হয় এবং গিলে মাথা সোজা রাখতে হয়। তবে সাদা ওয়াইনে অভ্যস্ত ছিলো না সে ; প্রত্যেকটা পদের শেষে তো সেটা আবার ঘটি ঘটি ঢেলে নেওয়া হলো। তবে সাদা মদের একটা বড় সুবিধা যে অন্য লোককে সহজে মাতাল করে দেওয়া যায়, নিজে

ঠিক থেকে। ফাঁকি ধরা কঠিন। ঠাণ্ডা জল আর বরফ-ভরা বালতি করে এগুলো নিয়ে আসে, যাতে হিমঠাণ্ডা থাকে। তিন তিনবার মিলার তার সঙ্গীর অজান্তে নিজের গেলাসের মাল দিলো সেই বরফের বালতির মধ্যে ঢেলে।

শেষপদ মিঠাই আসতে আসতে তুটো বোতল শেষ। বেয়ার তার বোতাম-বন্ধ আঁটো জ্যাকেটের মধ্যে হাঁসফাঁস লাগিয়েছে, দরদর করে ঘাম ঝরছে তার। ফলে তেষ্টা আরো বেড়ে গেলো, আবার আরেক বোতলের ফরমাশ দিলো।

মিলার এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব চিন্তিত…বোধহয় নতুন পাসপোর্ট আর পাওয়া যাবে না…গ্রেপ্তার হতেই হবে তাকে, ১৯৪৫ সালে ফ্রসেনবুর্গে যা করেছিলো সেই অভিযোগে।

চিন্তান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "আমার তো কয়েকটা ফটো দরকার হবে আপনার,…না ?"

হোঃ হোঃ করে হাসে বেয়ার।

"হ্যাঁ, গোটা তুই ফটো তো লাগবেই। ঘাবড়াচ্ছো কেন, স্টেশনে গিয়ে অটোমেটিক বুথ থেকে নিলেই হবে। অপেক্ষা করো তুদিন, চুলটা একটু বড় হোক তোমার, গোঁফটা আরো খানিক ঘন,…কেউ চিনতে পারবে না তুমি সেই লোক।"

"কেন, কি হবে তখন ?" সরল বিস্ফারিত জিজ্ঞাসা মিলারের।

সামনে ঝুঁকে এসে বেয়ার তার মোটা একখানা হাত ওর কাঁধে রাখে। যেই কথা বলার জন্যে মুখ খোলে, মদের গন্ধ ভক করে এসে মিলারের নাকে ঢোকে।

"আমি ওগুলো আমার এক দোস্তের কাছে পাঠিয়ে দেবো, এক হপ্তার মধ্যে পাসপোর্ট চলে আসবে। সেই পাসপোর্ট দেখিয়ে তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে দেবো—পরীক্ষা অবিশ্যি পাস করতে হবে তোমাকে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্ডও বানিয়ে দেবো। ব্যাস, হয়ে গেলো !…কর্তৃপক্ষের চোখে তুমি পনেরো বছর পরে দেশে ফিরেছো, কোন সমস্যা নেই ইয়ার, চিন্তাফিস্তা বাদ দাও।"

বেয়ার প্রায় মাতাল হয়ে উঠলেও জিভের ওপরে শাসন ছিলো তখনো

পুরোপুরি। আর কিছু বললো না, কোন গোপন তথ্য না। মিলারও আর টেঙলায় না ; বেশী চাপ দিতে গেলে হয়তো সন্দেহ হবে, একেবারেই চুপ করে যাবে।

কফির জন্যে প্রাণ আইঢাই করছে তবু কফি আনতে নিষেধ করলো মিলার। ওর ভয় পাছে কফি খেয়ে ফ্রানৎস বেয়ারের মাতলামি কেটে যায়। মোটা লোকটা বেশ মোটামতন ব্যাগ থেকে খাবারের দাম চুকিয়ে দিলো। তারপর চললো ওরা কোট আনবার কাউণ্টারে। সময় তখন সাড়ে দশটা।

"চমৎকার কাটলো সন্ধ্যেটা, হের বেয়ার। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"ফ্রানৎস বলে ডাকো হে," কোট গলাতে গলাতে হাঁসফাঁস করে মোটা।

মিলার তার কোটটা পরে নিয়ে বলে, "আচ্ছা, স্টুটগার্টে বোধহয় রাতের জীবন বলে কিছু নেই।"

"হ্যাঃ, নেই ! তুমি খুব জানো ! আমাদের শহরের কেরামতি কম ? অন্তত আধডজন ভালো ভালো ক্যাবারে আছে···যাবে নাকি একটাতে ?"

"ক্যাবারে ?···মানে, বলতে চান ওই স্ট্রিপটিজ আর ওই সমস্ত ?" মিলারের চোখদুটো যেন গোল গোল হয়ে ওঠে।

খিকখিক করে হাসে বেয়ার। চোখটোখ টিপে বলে, "যাবে নাকি ?··· চলো, সুন্দরীদের কাপড় খোলা দেখতে আমারও মন্দ লাগবে না।"

কোট রাখার মেয়েটিকে মোটা বকশিশ দিয়ে বেয়ার হেলেদুলে বাইরে বেরুলো।

ন্যাকার মতো প্রশ্ন করে মিলার, "স্টুটগার্টে কটা নাইটক্লাব ?"

"দাঁড়াও দেখছি। মলাঁরুজ, বালজা, ইম্পিরিয়াল আর সায়োনারা। হ্যাঁ, তাছাড়া, এবারহার্ড স্ট্রাসে আছে মাদেলিন।"

"এবারহার্ড ? আরে, কি অদ্ভুত ! ব্রেমেনে আমার মনিবের নামও যে তাই ছিলো। সেই-ই তো আমাকে ওখান থেকে বাঁচিয়ে ন্যুরেমবার্গে উকিলের কাছে পাঠিয়েছিলো !" মিলার একেবারে উচ্ছ্বসিত।

"বটে !···বাঃ, তাহলে ওখানেই যাওয়া যাক।" বেয়ার চললো তার গাড়ির উদ্দেশে :

রাত সোয়া এগারোটায় ম্যাকেনসেন গিয়ে পৌঁছুলো তিন মুরে। সর্দার খানসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো কথাটা।

"কি বললেন ? হের বেয়ার ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছিলেন বৈকি আজ রাতে। চলে গেছেন আধ ঘণ্টা আগে।"

"তার সঙ্গে একজন লোক ছিলো না ? লম্বা মতন, ছোট্ট ছোট্ট বাদামি চুল, গোঁফ আছে।"

"হ্যাঁ, ছিলো। মনে পড়ছে আমার, ওদিকের কোনার টেবিলে বসেছিলেন।"

কুড়ি মার্কের একটা নোট অনায়াসে লোকটার হাতে গুঁজে দিতে পারলো ম্যাকেনসেন, কোন আপত্তি নেই।

"দেখো, ভীষণ জরুরী ব্যাপার। ওকে খুঁজে আমাকে বার করতেই হবে। ওর বৌ হঠাৎ ফিট হয়ে গিয়ে…"

"অ্যাঁ, সে কি !" উৎকণ্ঠায় খানসামা-সর্দারের মুখটা যেন কুঁচকে ওঠে।

"এখান থেকে তারা কোথায় গেছে, জানো ?"

"নাঃ।…আচ্ছা, দাঁড়ান।" অন্য আরেকজন পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যান্স, তুমি তো ওই কোনার টেবিলে হের বেয়ার আর তাঁর বন্ধুকে পরিবেশন করেছিলে। ওঁরা কোথাও যাবার কথা বলেছিলেন নাকি ?"

"না, তেমন কোন কথা বলতে তো আমি শুনিনি।"

সর্দার-খানসামা তখন বলে, "আপনি কোট-টুপি রাখে যে মেয়েটা তাকে বরং জিজ্ঞেস করুন। ও হয়তো কিছু শুনে থাকতে পারে।"

ম্যাকেনসেন মেয়েটিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো। তারপর ট্যুরিস্টদের কাগজ চেয়ে নিয়ে দেখলো স্টুটগার্টে কি চলেছে। ক্যাবারে বিভাগে গোটা ছয়েক নাম চোখে পড়লো। পুস্তিকার মাঝখানে শহরের কেন্দ্রস্থলের একটা মানচিত্র আঁকা ছিলো। গাড়িতে ফিরে গিয়ে ম্যাকেনসেন চললো প্রথম ক্যাবারেটির উদ্দেশ্যে।

মাদেলিন নাইটক্লাবে দুজনের একটা টেবিলে বসেছিলো মিলার আর

বেয়ার। বেয়ারের তখন হুইস্কির দু নম্বর বড়া গেলাস চলছে। বড়বড় চোখ মেলে মেলে দেখছে ঠমকওয়ালি এক যুবতী ফ্লোরের মাঝখানে নিতম্ব দোলাতে দোলাতে হাতের আঙুল দিয়ে কাঁচুলির হুক খুলছে। সেটা খুলে পড়ে যেতেই বেয়ার মিলারের পাঁজরে কনুই দিয়ে মারলো এক ধাক্কা।

"কি মাল, দেখেছো ছোকরা!" দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে হাসে।

মাঝরাতও পেরিয়ে তখন। মদে প্রায় চুর হয়ে গেছে বেয়ার।

ফিসফিস করে বলে মিলার, "দেখুন, হের বেয়ার, বড্ড ভয় লাগছে আমার। কদ্দিন আর পালিয়ে পালিয়ে থাকবো! পাসপোর্ট তাড়াতাড়ি আনাতে পারবেন না?"

বেয়ার মিলারের কাঁধ জড়িয়ে ধরলো, "আরে রল্‌ফ্‌, মেরা ইয়ার, এত ঘাবড়াচ্ছো কেন বাছা? বলেছি না, ফ্রানৎসের ওপর ছেড়ে দাও সব।" মোক্ষম চোখ টিপে দিয়ে বললো, "আমি নিজে তো আর পাসপোর্ট বানাই না। ফটো পাঠিয়ে দিই এক বেটা কারিগর আছে তার কাছে, এক হপ্তা পরে মাল চলে আসে। কোন ভাবনাই নেই।...ছোড়ো চাঁদ, আরেক পাত্তর হয়ে যাক পুরনো দোস্ত ফ্রানৎসের সঙ্গে।"

একটা দোদুলদুল হাত শূন্যে তুলে দোলায়।

"হেই বেয়ারা, আরেক রাউণ্ড।"

মিলার জুত হয়ে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলো। অবস্থাটা মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে। পাসপোর্টের ফটো তুলবার জন্যে যদি চুল গজাবার অপেক্ষা করতে হয় তো কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। অথচ বেয়ারের কাছ থেকে ভুজুংভাজং দিয়ে যে ওডেসাদলের পাসপোর্ট বানানোর কারিগরটার নাম-ঠিকানা নিয়ে নেবে তাও সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। বেয়ার মাতাল হয়েছে বটে কিন্তু এমন কিছু মাতাল নয় যে তার জিভ থেকে সেই জালিয়াতের নামটা খসে পড়বে।

নাইটক্লাব ছেড়ে আসতেই চায় না ওডেসার মোটা লোকটা। অনেক করে যখন তাকে নিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরুলো মিলার, তখন রাত একটা বেজে গেছে। বেয়ারের পা টলমল করছিলো। মিলারের কাঁধে হাতের ভর রেখে বাইরে বেরুতেই হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকে ওর অবস্থা

আরো খারাপ হয়ে পড়লো।

গাড়ি রাখবার জায়গাটায় পৌঁছে মিলার বেয়ারকে বললো, "আমিই না হয় গাড়ি চালিয়ে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।" বেয়ারের কোটের পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে মোটা লোকটাকে গাড়িতে তুলে দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর ওধার ঘুরে চালকের আসনে গিয়ে বসলো মিলার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মোড় ঘুরে একটা ধূসর রঙের মার্সিডিজ গাড়ি পেছন থেকে ওদের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ ব্রেক কষে কুড়ি গজ দূরে থেমে গেলো।

উইণ্ডস্ক্রিনের পেছনে বসে বসে ম্যাকেনসেন ওদের গাড়ির নম্বরটা লক্ষ্য করে। পাঁচটা নাইটক্লাব ঘুরে অবশেষে মাদেলিনে এসে পৌঁছতেই দেখলো যে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত গাড়িটা ধীরে ধীরে রওনা দিচ্ছে। কোন ভুল নেই কোথাও। ফ্রাউ বেয়ার তার স্বামীর গাড়ির নম্বর আগেই বলে দিয়েছিলো, ঠিক মিলে যাচ্ছে।···ক্লাচ চেপে চেপে চললো তার পেছনে পেছনে।

মিলার সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলো। মদের ঘোর কাটিয়ে কাটিয়ে অতি সতর্কভাবে যাতে এই মোক্ষম সময়ে পুলিসের গাড়ি এসে তাকে মত্ত অবস্থায় গাড়ি ড্রাইভিঙের দায়ে চালান না করে। গাড়ি নিয়ে চললো বেয়ারের বাড়ির দিকে নয়, নিজের হোটেলের দিকে। মাথা নীচু করে বেয়ার ঝিমুচ্ছিলো। টাই আর কলারের ওপর কয়েক পরত পুরু চর্বির ভাঁজের ওপর তার মাথাটা ঢুলছে।

হোটেলের বাইরে মিলার তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলো। "ফ্রানৎস ···ওহে দোস্ত···ওঠো, চলো এক চুমুক নাইটক্যাপ হয়ে যাক।"

মোটা মানুষটা তার দিকে চেয়ে থাকে। বিড়বিড় করে উঠলো, "ব্বাড়ি যেত্‌তে হবে···ব্বউ বসে আছে।"

"আরে, এসো না, এট্টুসখানি···সন্ধ্যেটার সদ্গতি। আমার ঘরে বসে জিভে ঢালতে ঢালতে পুরনো দিনের গপ্‌পো করা যাবে।"

খিকখিক করে মাতাল-হাসি হাসে বেয়ার। "পুরনো দিন···আঃ, সে যে কি দিন ছিলো, রল্‌ফ···বিরাট!"

মিলার নেমে এসে বেয়ারকে নামিয়ে নিলো। ফুটপাতের ওপর দিয়ে

হাত ধরে ধরে ওকে নিয়ে এসে ঢোকালো হোটেলের বড় দরজায়। বললো, "বিরাট দিন তো বটেই···চলো, সে সব দিনের গপ্‌পো করা যাক।"

রাস্তায় তখন মার্সিডিজটা আলো নিভিয়ে ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে ছিলো।

মিলার তার ঘরের চাবিটা পকেটেই রেখে দিয়েছিলো। ডেস্কের পেছনে হোটেলের নৈশকর্মী তখন ঝিমুচ্ছে। বেয়ার বিড়বিড় করে কি যেন একটা বলতে গেলো।

"স্‌-স্‌, চুপ!" মিলার বলে।

"চুপ···চ্‌-চুপ্‌!" বেয়ার নিজেও কয়েকবার বলে উঠলো। হাতীর মতো থপথপিয়ে সিঁড়ির দিকে চললো। নিজের অভিনয়ে নিজেই খুকখুক করে হেসে ওঠে। ভাগ্যে মিলারের ঘর ছিলো দোতলায় নইলে আরো ওপরে উঠতে হলে বেয়ারের সাধ্যে কুলোত না। ঘরের দোর খুলে লাইট জ্বালিয়ে দিলো মিলার। কোনমতে ধরে ধরে বেয়ারকে নিয়ে এসে ঘরের একমাত্র হাতলওলা কুর্সিটায় দিলো বসিয়ে।

বিপরীত দিকের রাস্তা থেকে তখন ম্যাকেনসেন চেয়ে আছে অন্ধকার হোটেল-কামরাগুলোর দিকে। রাত তুটো। কোন ঘরে আলো নেই। মিলারের ঘরে আলো জ্বলে উঠতেই ম্যাকেনসেন লক্ষ্য করে দেখলো যে তার ঘরটা দোতলায়, হোটেলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডান ধারে।

মনে মনে হিসাব করে দেখলো যে ওপরে উঠে মিলার তার শোবার ঘরের দরজা খোলামাত্র তাকে মারাটা ঠিক হবে না তুটো কারণে। প্রথমত লবির কাঁচের দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে হোটেলের নৈশকর্মীটি বেয়ারের পায়ের শব্দে ঢুলুনি ভেঙে যাওয়াতে এখন ভেতরে পায়চারি লাগিয়েছে। রাত তুটোয় যদি ও ওপরে উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে তবে স্পষ্ট মনে থাকবে তার সেকথা···হোটেলের আবাসিক নয় সেটাও লক্ষ্য করবে···পরে পুলিসের কাছে বিবরণও দেবে বেশ ভালোমত। আর দ্বিতীয় কথাটা হলো বেয়ারের অবস্থা। কেমন করে তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো মিলার তা দেখেছে···অতএব মিলারকে হত্যা করবার পর তাড়াতাড়ি চম্পট দিতে পারবে না বেয়ার, ধরা পড়ে যাবে। আর বেয়ার ধরা পড়া মানেই ওয়ের-

উলফ খেপে যাবে…ম্যাকেনসেনেরই বিপদ তাতে। তার প্রকৃত নামে বেয়ারের নাম ফেরারী তালিকায় বেশ মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে, তাছাড়া ওডেসাতে তো সে বেশ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

জানলা দিয়ে গুলি করার সপক্ষে আরো একটা যুক্তি খাড়া করলো ম্যাকেনসেন। হোটেলের বিপরীত দিকে একটা দালান তৈরি হচ্ছে; অর্ধেক হয়ে গেছে সেটা, কাঠামো আর মেঝেগুলো তৈরি, দোতলা তিনতলায় যাবার জন্যে কংক্রিটের সিঁড়িও মজুত যদিও এখনো সেটা এবড়োখেবড়ো।…মিলার তো পালিয়ে যাচ্ছে না, অপেক্ষা করবে সে সেখানে। নিজের গাড়ির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে চললো ম্যাকেনসেন। ফন্দী আঁটা হয়ে গেছে। গাড়ির বুটের ভেতরে রয়েছে একটা শিকারের উপযুক্ত দূরপাল্লার রাইফেল।

ঘুষিটা যখন এলো বেয়ার হকচকিয়ে গেলো। মোটেই প্রস্তুত ছিলো না এর জন্যে। মদের ঘোরে প্রতিক্রিয়াশক্তিও শ্লথ। সময়ই পেলো না উল্টে ঝাঁপিয়ে পড়বার। ওয়ার্ডরোব খুলে হুইস্কির বোতল খুঁজছে যেন এইরকম একটা ভান করে মিলার তার একটা টাই বার করে এনেছিলো। দুটোই ওর টাই, আরেকটা গলায় দুলছে। সেটাও খুলে ফেলেছে।

দশ বছরেরও ওপর হয়ে গেলো আর্মির শিক্ষাশিবিরে সে আর তার দোস্ত রঙরুটেরা নানারকম ঘুষির কসরত শিখেছিলো। কতখানি ফলপ্রসূ যে সেগুলো তা কোনদিন পরখ করবার সুযোগ হয়নি।…চেয়ারে বসে বেয়ার বিড়বিড় করছিলো, "আঃ, কি যে সেইসব দিন…কি দিন…।" পেছন থেকে মোটা ঘাড়টাকে দেখাচ্ছিলো যেন একটা গোলাপী পাহাড়। তাই যতটা জোরে পারে মিলার ঘুষি ঝাড়লো।

নক-আউট ঘুষিও নয়। কারণ মিলারের হাতের কিনারা নরম নরম, অপটুতায় কাঁচা, আর বেয়ারের ঘাড়ে চর্বির পুরু স্তর। তবু ওতেই কাজ হলো। চেতনা থেকে সুরার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে উঠতে ওডেসার চাঁইটি দেখলো যে তার দুটো কব্জিই কাঠের চেয়ারের দুটো হাতলের সঙ্গে মুচড়িয়ে কষে বাঁধা।

"ব্যাপারটা তোমার জানা আছে…তাই না?" বেয়ারের কান ঘেঁষে, কথাগুলো বলে মিলার।

চোখ বন্ধ করে সামান্য একটু ধ্বনি করে ওঠে বেয়ার। জানে বৈকি। কুড়ি বছর আগে 'সাদা খরগোশ' উইং কমাণ্ডার ইয়োটমাসকে যারা এই যন্ত্রণা দিয়ে মাংসপিণ্ড বানিয়ে দিয়েছিলো তাদের মধ্যে বেয়ারও যে ছিলো অন্যতম। পারীর ফ্রেসনে জেলের সেই ভূতলকক্ষ…উফ! জানে না মানে, …তবে পাওয়ার দিকটায় থাকেনি।

"বলো," ফুঁসে ওঠে মিলার, "জালিয়াতের নাম কি, তার ঠিকানা কি?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বেয়ার। ফিসফিসিয়ে বলে, "না, পারবো না, বলতে পারবো না, ওরা তাহলে আমাকে মেরে ফেলবে।"

মিলার আবার তার মুখের মধ্যে মোজা ঠুসে দেয়। ওর কড়ে আঙুলটা নিয়ে চোখ বন্ধ করে উল্টোদিকে বিরাট জোরে দেয় এক হ্যাঁচকা টান। সশব্দে হাড় ভেঙে যায়। বেয়ার চেয়ারে বসে আর্তশ্বাস ছাড়ে, মুখের ভেতরে গোঁজা কাপড়ের পুঁটলিটার মধ্যে বমি করে ফেলে।

পলকে মুখের কাপড় টেনে দিয়ে মিলার সরে যায়, নইলে বোধহয় ডুবেই যেতো। মোটা লোকটার মাথা সামনের দিকে ঢুলে পড়ে; রাতের যাবতীয় দামী দামী খাদ্য, মায় দু বোতল ওয়াইন, কয়েক দফা বড়া স্কচ. সব তার বুক ভাসিয়ে কোলের ওপরে এসে জমে।

"বল্," মিলার গর্জায়, "আরো সাতটা আঙুল আছে তোর।"

বেয়ার ঢোঁক গেলে, চোখদুটো তার বন্ধ। কোনমতে বললো. "উইনজার।"

"কি?"

"উইনজার—ক্লউস উইনজার। সেই-ই বানায় পাসপোর্ট।"

"পেশাদার জালিয়াত নাকি?"

"একজন মুদ্রক।"

"কোথায়, কোন্ শহরে?"

"ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

"না বললে আমিই মেরে ফেলবো।…কোন্ শহর?"

"অসনাব্রুখ," অস্ফুটকণ্ঠে বললো বেয়ার।

তার মুখে আবার কাপড়ের ঠুসিটা গুঁজে দিয়ে মিলার চিন্তা করে নেয়।...ক্লউস উইনজার, অসনাব্রুখের জনৈক মুদ্রক।...অ্যাটাচি কেস খুলে হাতড়ায়; সলোমন টউবেরের ডায়রির নীচে অনেকগুলো ম্যাপ রাখা। তার থেকে জার্মানীর রাস্তার ম্যাপ খুলে নিয়ে দেখে।

অসনাব্রুখে যাবার জাতীয় সড়ক অনেক উত্তরে—নর্ড রাইন/ওয়েস্টফালিয়ার ভেতরে; ম্যানহাইম, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, ডর্টমুণ্ড ও মুনস্টারের মধ্যে দিয়ে গেছে। চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ তো বটেই, রাস্তার অবস্থার ওপর নির্ভর করে। রাত প্রায় তিনটে বেজে গেছে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ।

রাস্তার ওধারে অর্ধসমাপ্ত দালানটার তেতলায় একটা ছোট্ট কুলুঙ্গির ভেতরে বসে ম্যাকেনসেন শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছিলো। ওপাশের হোটেলবাড়িতে দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে তখনো। ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত বদ্ধ জানলা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নীচের বড় দরজার দিকে তাকাচ্ছে। বেয়ার যদি বেরিয়ে আসে তাহলে মিলারকে একা অবস্থায় পাকড়ে দেওয়া যাবে। বা, মিলার যদি বেরিয়ে আসে, রাস্তায় খানিকটা আগে গিয়ে শেষ করে দেওয়া যায়। অথবা, কেউ যদি জানলাটা খোলে, তাজা বাতাসের একটু ঝলক পাওয়ার জন্যে। আবার শরীরে ঠকঠক করে কাঁপুনি ধরলো, ভারি রেমিংটন ·৩০০ রাইফেলটাকে দৃঢ়মুঠিতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। তিরিশ গজ দূরের লক্ষ্যবস্তু, এইরকম একটা অস্ত্র, কোন সমস্যাই নেই। ম্যাকেনসেন অপেক্ষা করতে পারবে, ধৈর্য আছে তার।

মিলার তার ঘরে নিঃশব্দে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো। বেয়ারকে অন্তত ৫ ঘণ্টা নীরব রাখতে হবে। লোকটা হয়তো ভয়ের চোটে তার দলের লোকগুলোকে বলবেও না যে সে জালিয়াতের গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে, তবু তার ওপর তো নির্ভর করা যায় না।

শেষ কয়েক মুহূর্ত মিলার বিয়ারের হাত-পায়ের বাঁধাছাঁদা আরো শক্ত করে বাঁধলো, মুখের বাঁধনও এঁটে দিলো, তারপর চেয়ারটাকে কাত করে শুইয়ে দিলো যাতে বেয়ার ইচ্ছে করে চেয়ারসুদ্ধ উলটে শব্দটব্দ করে লোকজন না জমায়। টেলিফোনের তার আগেই ছিঁড়ে দিয়েছে। ঘরটার

চারদিকে শেষ নজর বুলিয়ে মিলার বাইরে এসে দরজায় কুলুপ সেঁটে দিলো।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই হঠাৎ মনে পড়লো যে হোটেলের নৈশকর্মী তো ওদের হুজনকে সিঁড়ি চড়তে দেখেছিলো, এখন হঠাৎ যদি সে নীচে নেমে বিল মিটিয়ে চলে যায় তবে কি ভাববে লোকটা ? মিলার আবার পেছন ফিরে হোটেলের পেছনদিকে চললো। করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা জানলা। তার নীচেই বিপদ-সিঁড়ি। জানলার খিল খুলে মইয়ে পা রাখলো। কয়েক নিমেষেই চলে এলো পেছনের উঠোনে, যেখানে সার সার গ্যারেজ। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো সঙ্কীর্ণ একটা গলিতে।

হু মিনিট পরেই সে হাঁটতে লাগলো জাগুয়ারের উদ্দেশ্যে ; প্রায় মাইল তিনেক পথ, বেয়ারের বাড়ি থেকে আধ মাইল। সুরার প্রভাব আর রাতের কাজকর্মে বড় ক্লান্ত, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমনোর উপায় নেই। উইনজারের কাছে গিয়ে পৌঁছতেই হবে, যে-কোন সময়ে সে বিপদ-সঙ্কেত পেয়ে যেতে পারে।

জাগুয়ারে গিয়ে যখন বসলো তখন প্রায় চারটে। আরো আধ ঘণ্টা পর উত্তরমুখী জাতীয় সড়কে গিয়ে পৌঁছলো, হাইলব্রন আর ম্যানহাইমের পথে।

মিলার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্র বেয়ার মুক্তি পাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা করতে লাগলো। মাতলামি তার কখন কেটে গেছে। মুখটাকে এগিয়ে নিয়ে কব্জির বাঁধন দাঁতে কাটতে চেষ্টা করে। কিন্তু অতবড় মোটা মুখ, নীচুও হয় না। তাছাড়া মুখের ভেতরে মোজার পুঁটলির জন্যে দাঁতের পাটি হুটো আলাদা হয়ে আছে। কয়েক মিনিট পরে পরেই নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস টানতে হচ্ছে।

পায়ের বাঁধন আলগা করতে চেষ্টা করলো বারবার নড়ে চড়ে টেনে হেঁচড়ে। কোন লাভ হলো না। ভাঙা কড়ে আঙুলটায় অসহ্য ব্যথা, ফুলেও উঠেছে বেশ, তবু চেষ্টা করলো কোনমতে মোচড়া-মুচড়ি করে যদি কব্জি গলিয়ে আনতে পারে। পারলো না যখন তখন চোখে পড়লো মেঝের

ওপর টেবিল-ল্যাম্পটা পড়ে আছে। বাল্বটা তখনো লাগানো, কিন্তু ভাঙতে পারলে অনেক কাঁচের টুকরো পাওয়া যাবে, টাই কেটে বাঁধন খোলা হয়তো যাবে।

ওলটানো চেয়ারসুদ্ধ ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের কাছে পৌঁছতে এক ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। তারপর অবশ্য বাল্ব ভাঙতে আর সময় লাগলো না।

শুনতে সহজ কিন্তু এক টুকরো ভাঙা কাঁচ দিয়ে বাঁধা থাকা অবস্থায় কব্জির বাঁধন কাটা সহজ কাজ নয়। কাপড়ের একটা পরত কাটতেই কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। বেয়ারের কব্জি থেকে ঘাম বেরিয়ে টাইয়ের কাপড় ভিজে গেলো, তাতে মোটা মোটা হাতের ওপর আরো এঁটে বসলো বাঁধন। সাতটা যখন বেজে গেলো শহরের বাড়িঘরের ছাদে আলো ফুটলো, সেই সময় ভাঙা কাঁচের ঘষায় বাঁ-কব্জির বাঁধনের প্রথম পরতটা সবে ছিঁড়ে এলো। বাঁ কব্জি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হতে কিন্তু প্রায় আটটা বাজলো।

সেই সময় মিলারের জাগুয়ার গর্জন তুলে কলোনরিং পেরিয়ে চলেছে। অসনাব্রুখ আরো একশো মাইল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বিশ্রী তুষারপাতও তার সঙ্গে। হাওয়ার বেগে সেগুলো পিছল সড়কের ওপর ঘুরে ঘুরে পড়ছে। উইণ্ডস্ক্রীনে ওয়াইপার দুটোর একঘেয়ে ঘূর্ণন। ঘুমে আঁটা হয়ে আসে মিলারের চোখ।

গতি কমিয়ে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে চললো মিলার। আর বাড়ানো-কমানো নয়, একই গতি থাকুক। রাস্তা পিছলে দু পাশের কাদা-প্যাচপেচে মাঠে গিয়ে পড়বার মোটেই ইচ্ছে নেই তার।

বাঁ হাত ছাড়ানোর পর মাত্র কয়েক মিনিটেই মুখের ঠুসুনি খুলে ফেললো বেয়ার। ক'মিনিট ধরে শুধু হাওয়া টানলো। ঘরটায় গা-গুলানো দুর্গন্ধ : ঘাম, ভয়, বমি আর হুইস্কির। ডান কবজির গেরো খুলে ফেললো, ভাঙা আঙুলটা থেকে যন্ত্রণার স্রোত উঠলো শিরশির করে শরীরের মাঝে। পা দুটোকে মুক্ত করলো তখন।

প্রথমেই দরজার কথাটা মনে এলো, কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। টেলিফোনটা

নিয়ে নাড়াচাড়া করলো, কিন্তু সেটাও মৃত। পা ঘষটে ঘষটে ঘরের মধ্যে হাঁটছে ; অতক্ষণ শক্ত বাঁধনে বাঁধা থাকায় রক্ত-সঞ্চালন এখনো বরাবর হয়নি। কোনমতে টলতে টলতে তারপর জানলার কাছে আসে, একটানে পর্দা সরিয়ে জানলার পাল্লা দুটোকে ভেতরের দিকে টেনে খোলে।

রাস্তার বিপরীত দিকে ম্যাকেনসেন অত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও তার কুলুঙ্গিতে বসে বসে ঢুলছিলো। হঠাৎ চোখে পড়লো মিলারের জানলায় পর্দা সরে গেলো। নিমিষে রেমিংটন তাক করে অপেক্ষা করতে থাকলো। যেই দেখলো একটা ছায়া-ছায়া অবয়ব এসে পাল্লা দুটো ভেতরের দিকে টেনে খুলছে, অমনি তার মুখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো।

বুলেট গিয়ে লাগলো বেয়ারের কণ্ঠায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। অতবড় লাশটা ভূপতিত হওয়ার আগেই প্রাণপাখী উধাও। রাইফেলের শব্দ হয়তো গাড়ির ব্যাকফায়ারিঙের শব্দ বলে ভুল করবে লোকে, কিন্তু সে ভুল টিঁকবে মোটে মিনিট খানেক, তার বেশী নয়। ম্যাকেনসেন জানতো এই ভোর সকালেও লোকে আসবে খোঁজ করতে। অতএব ঘরের দিকে আর পলকমাত্র না চেয়ে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি নেমে ম্যাকেনসেন দৌড়লো। পেছন দিক দিয়ে ছুটলো সে, গোটা দুই সিমেণ্ট মিক্সার আর কাঁকরের স্তূপকে পাশ কাটিয়ে। গুলি ছোঁড়ার ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলো, বন্দুকটাকে বুটে ভরে রওনা দিলো।

গাড়িতে বসে চাবি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো যে কোথাও একটা ভুল হয়েছে। যে লোকটাকে মারতে বলেছিলো ওয়েরউলফ, সে বেশ লম্বা একহারা চেহারার। অথচ জানলার ছায়াটা মোটামতন। গতকাল সন্ধ্যায় যা দেখেছে তাতে তো মনে হচ্ছে বেয়ারকেই মেরে বসেছে সে। অবশ্য তাহলেও খুব একটা সমস্যা নেই। বেয়ারকে মৃত অবস্থায় মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মিলার ভাগবে। যত জোরে ছুটতে পারে দৌড়বে। তার মানে তিন মাইল দূরে রাখা ওর জাগুয়ারের কাছে রুদ্ধশ্বাসে চলে আসবে। ম্যাকেনসেন তার মার্সিডিজখানা ছোটালো সেইদিকে। কিন্তু পৌঁছেই দেখলো বেনজ ট্রাক আর ওপেলখানা দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানের জায়গা ফাঁকা, অথচ আগের সন্ধ্যায় ওখানেই তো রাখা

ছিলো জাগুয়ারটা। এইবারে ভাবনায় পড়লো ম্যাকেনসেন।

কিন্তু বিপদের সম্ভাবনায় মূর্ছা যাওয়ার মতো মানুষ নয় ম্যাকেনসেন, হলে কি সে ওডেসাদলের প্রধানঘাতক হতে পারতো? জীবনে বহু সমস্যায় পড়েছে বহুবার। ড্রাইভিং হুইলে কয়েক মিনিট নিথর হয়ে বসে থাকে। অবশেষে বুঝতে পারে মিলার নির্ঘাত ভেগেছে, নিশ্চয়ই কয়েক শো মাইল পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

বেয়ারকে জ্যান্ত অবস্থায় রেখেই মিলার পালিয়েছিলো। অর্থাৎ, ম্যাকেনসেন মনে মনে চিন্তা করে দেখে যে হয় মিলার তার কাছ থেকে কিছুই পায়নি নয়তো কিছু পেয়েছে। যদি কিছু পেয়ে না থাকে তো কোন ক্ষতিই হয়নি। ধীরে-সুস্থে পরে মিলারকে নিকেশ করা যাবে, কোন তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু যদি কিছু পেয়ে থাকে তো তা কোন সংবাদ হবে, কোন গোপন তথ্য। মিলার কিসের অনুসন্ধানে ঘুরছে যা বেয়ার তাকে দিতে পারে, তা জানে একমাত্র ওয়েরউলফ।

অতএব ওয়েরউলফ রাগে ফেটে পড়বে জেনেও ম্যাকেনসেন তাকে টেলিফোন করার সাব্যস্ত করলো।

সাধারণ টেলিফোন খুঁজে বার করতে করতে কুড়ি মিনিট সময় লেগে গেলো। দূরপাল্লার কথোপকথনের জন্যে ম্যাকেনসেন সব সময়েই পকেট-ভর্তি খুচরো মার্ক রেখে দিতো।…ন্যুরেমবার্গে সংবাদ শুনে ওয়েরউলফ থ। রাগে ফেটে পড়লো সে। টেলিফোন লাইনে ভেসে উঠলো একগাদা খিস্তি-খেউর, গালিগালাজ। কয়েক সেকেণ্ড পরে একটু ঠাণ্ডা হয়ে তবে বললো, "ওকে খুঁজে বার করো হনুমান…তাড়াতাড়ি…কোথায় যে গেছে ভগাই জানে!"

ম্যাকেনসেন বলে যে কি ধরনের খবর বেয়ার ওকে দিতে পারে সেটা যদি ও জানতে পারে তাহলে সুবিধা হতো।

লাইনের অপর প্রান্তে ওয়েরউলফ খানিক দম মেরে বসে থাকে।

আঁতকে শ্বাস ছেড়ে তারপর বলে, "হায় ভগবান,…জালিয়াত… জালিয়াতের নাম জেনে গেছে।"

"জালিয়াত কি স্যার?" ম্যাকেনসেন শুধায়।

সম্বিৎ ফিরে পায় ওয়েরউলফ। শুকনো গলায় শুধু বলে, "আচ্ছা. তাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।...হ্যাঁ...মিলার গেছে—"

ম্যাকেনসেনকে একটা ঠিকানা বলে দেয়। তারপর নির্দেশ দিয়ে জানায়, "অসনাব্রুখে যাও; এমন তেজে গাড়ি চালাবে কোনদিন যা করোনি, উড়ে যাবে একেবারে। ওই ঠিকানাতে মিলারকে পাবে, নয়তো শহরের অন্য কোথাও। যদি বাড়িটাতে না পাও, জাগুয়ারের খোঁজে চোখ রাখবে। এবারে জাগুয়ারটা ছেড়ো না, ঘুরে ঘুরে ওখানেই ও ফিরে আসে।"

ঠক করে টেলিফোন রেখে আবার তুলে নিয়ে এনকোয়ারি চায় নম্বরটা পেয়ে অসনাব্রুখে ডায়াল করে।

স্টুটগার্টে ম্যাকেনসেন দেখে যে তার হাতে ধরা যন্ত্রে আর কোন সাড় নেই, শুধুই যান্ত্রিক আওয়াজ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার তার মার্সিডিজে গিয়ে বসলো। মিলারের মতোই তার চোখ ভরে ঘুম আসে। আগের দিনে লাঞ্চের পর থেকে তো আবার পেটেও কিছু পড়েনি।

সারারাত খোলা জায়গায় বসে বসে পাহারা দিয়ে হাড়ে এখন কাঁপুনি ধরেছে। আগুনের মতো গরম কফি আর তার পরে স্টাইনহেগার পেলে বড় ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। মার্সিডিজে স্টার্ট দিয়ে উত্তরমুখে চললো ওয়েস্টফালিয়ার পথে।

চোদ্দ

ক্লউস উইনজারকে দেখে মনেও হবে না যে ও কোনদিন এস.এস.এ ছিলো। কারণ তাদের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য ছ ফিটের নীচে ওর মাথা, তাছাড়া চোখেও কম দেখে। চল্লিশ বছর বয়সে থলথলে ভোঁদা-ভোঁদা চেহারা হয়ে গেছে, এলোমেলো সোনালী চুল, আত্মবিশ্বাসের বেশ অভাব। বস্তুত এস.এস. বাহিনীতে যত লোক ভর্তি হয়েছিলো তার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র কাহিনী হলো এই ব্যক্তিটির।...১৯২৪ সালে ক্লউসের জন্ম হয়েছিলো; বাপ ছিলো উইসব্যাডেনের এক শূকরমাংস-বিক্রেতা। বিশ দশকের

গোড়া থেকেই অ্যাডলফ হিটলার আর নাৎসী পার্টির পরম ভক্ত হয়ে উঠলো তার বাবা। সেইসব দিনে, ক্লউসের স্পষ্ট মনে পড়ে, বাবা বাড়ি ফিরতো রাস্তায় রাস্তায় কম্যুনিস্ট আর সোস্যালিস্টদের মধ্যে মারপিটের শেষে খুব বীরদর্পে পাড়া কাঁপিয়ে।

ক্লউস দেখতে হয়েছিলো তার মায়ের মতো। বাপ তাতে ভীষণ বিরক্ত—এঃ, ছেলে এমন ন্যাকানোকা পাতলাপুতলা কেন হলো, গায়েও জোর নেই, চোখেও কম দেখে। মারপিট ভালো লাগতো না ক্লউসের, খেলাধূলাও না, তরুণ-হিটলার দলের নাম শুনেই বিশ্রী লাগতো। একটিমাত্র কাজে তার ভীষণ আগ্রহ ছিলো : হস্তলিপির শিল্প, নানারকম হাতের লেখা লিখতে পারা, সেগুলোতে আবার চিত্রবিচিত্র নানারকমের কারুকার্য করা। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকে এই কাজ নিয়েই মাতলো, অপূর্ব দক্ষতা জন্মালো তাতে। বাপ তো দেখে দেখে ঘেন্নায় মরে, ছিঃ, ছেলে শেষে এমন একটা মেয়েলি কাজ ধরলো!

নাৎসীদের হাতে ক্ষমতা আসবার পর শুয়োরের মাংসওলাটি তো ফুলেফেঁপে উঠলো। পার্টিতে কত কাজ করে দিয়েছে আগে, তাই স্থানীয় এস.এস. ব্যারাকগুলোতে মাংস সরবরাহ করবার একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে গেলো। এস.এস. তরুণগুলোকে যখন দেখতো, ঘাড় ফুলিয়ে বীরদর্পে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, মনে মনে তখন কামনা করতো, আহা, নিজের ছেলেটি যদি কোনদিন শ্যুৎজ স্ট্যাফেলের কালো-রুপোলী প্রতীক এঁটে ঘুরে বেড়াতো!

ক্লউসের কিন্তু সেদিকে কোনই উৎসাহ নেই। নিজের তৈরি লিপিচিত্রগুলো নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকে, নানাধরনের রঙ আর সুন্দর সুন্দর হস্তাক্ষর নিয়ে অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

তারপর যুদ্ধ বাধলো। ১৯৪২-এর বসন্তে ক্লউস আঠারোয় পা দিলো। ডাক পড়বার বয়স। বাপের মতো দৃঢ়মুষ্টি সবল চেহারা নেই তার, তেমন উগ্র ইহুদী-বিদ্বেষী মনও নয়। বরং ছোটখাটো লাজুক-লাজুক ফ্যাকাশে চেহারার কিশোর। সেনাদলে কেরানীগিরি করবার মতোও স্বাস্থ্য নেই তার, ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল করলো। রিক্রুটিং বোর্ড থেকে বাড়ি ফিরে এলো ক্লউস। বাপের পক্ষে সেটাই শেষ

জোহান উইনজার বার্লিনের ট্রেন ধরলো। রাস্তায় মারপিটের দিনের এক সঙ্গী এখন এস.এস.এ কেউকেটা বিশেষ। তাকে ধরে ছেলের জন্যে যদি কিছু করা যায়, রাইখের সেবায় কোন একটা বিভাগে যদি তাকে ঢোকানো যায়। লোকটা আশ্বাস দিলো কিছু, করতে পারলো তার চেয়েও কম। জিজ্ঞেস করলো তরুণ ক্লউস কি কোন কাজে পারদর্শী, কোন বিশেষ কাজ? আরক্ত মুখে বাপকে স্বীকার করতে হলো যে ছেলে নক্‌শা-কাটা চিত্রলিপি বানাতে পারে।

লোকটি যথাসাধ্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলো। তবে ভূমিকা হিসাবে কিছু নিদর্শন চাইলো—জনৈক এস.এস. মেজর ফ্রিৎজ সুহ্‌রেনের সম্মানে পার্চমেন্টের ওপর একটা চিত্রবিচিত্র মানপত্র লিখে দিতে পারে কি কিশোর ক্লউস?

উইসব্যাডেনে ফিরে ছেলেকে বলতেই সে কাজে লেগে গেলো: এক সপ্তাহ পরে বার্লিনের এক উৎসবে সুহ্‌রেন তার সতীর্থদের কাছ থেকে মানপত্রটি উপহার পেলো। সাখসেনহাউসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কর্তৃত্বপদ থেকে বদলি হয়ে তখন সুহ্‌রেন যাচ্ছে আরো কুখ্যাত ক্যাম্প র‍্যাভেন্সব্রুখের কর্তা হয়ে।

১৯৪৫-এ সুহ্‌রেনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে ফরাসীরা।

বার্লিনে আর.এস.এইচ.এর হেডকোয়ার্টারে কার্যভার হস্তান্তরের উৎসবে সকলেই ওই সুন্দর সুশোভিত মানপত্রটির প্রশংসা করলো। তার মধ্যে ছিলো অ্যালফ্রেড নউজোকস নামে জনৈক এস.এস. লেফটন্যান্ট। এই লোকটিই ১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে জার্মান-পোলিশ সীমান্তে গ্লেইউইৎজ বেতারকেন্দ্রে মিথ্যা আক্রমণ চালিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অধিবাসীদের মৃতদেহগুলোতে জার্মান সৈন্যের পোশাক পরিয়ে 'প্রমাণ' রেখে এসেছিলো যে পোল্যাণ্ডই জার্মানীকে আক্রমণ করেছে, যার ফলে পরবর্তী সপ্তাহে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবার অজুহাত খুঁজে পেয়েছিলেন।

নউজোকস শুধালো মানপত্রটি বানিয়েছে কে? শুনেই কিশোর ক্লউস উইনজারকে বার্লিনে আসবার আমন্ত্রণ জানালো।

তারপর ঝটিতি অনেক কিছুই ঘটে গেলো। ক্লউস উইনজার ভালমতো

কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এস.এস.এ ভর্তি হয়ে গেলো। কোন প্রশিক্ষা নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু বিশ্বস্ততার শপথ আর গোপনীয়তার আরেক দফা শপথ নিয়ে চলে গেলো এক গভীর-গোপন রাইখ প্রকল্পে। উইসব্যাডেনের মাংসওলা তো বিস্ময়ে হতবুদ্ধি; আনন্দের সীমা নেই তার, যেন সপ্তমস্বর্গে চড়ে গেছে।

প্রকল্পটিকে তখন আর.এস.এইচ.এর আওতায় ছ নম্বর অ্যামটের চ-বিভাগ থেকে বার্লিন শহরের ডেলব্রুখ স্ট্রাসের একটা কারখানায় চালানো হচ্ছিলো। মূল বিষয়টি বড়ই সরল। লাখে লাখে ব্রিটিশ পাঁচ পাউণ্ড নোট ও মার্কিনী একশো ডলারের বিল জাল করে বের করবার চেষ্টা করছিলো এস.এস.। বার্লিনের বাইরে স্পেকথউসেনের রাইখ ব্যাঙ্কনোট-কাগজের ফ্যাক্টরিতে কাগজ তৈরি হচ্ছিলো। ডেলব্রুখ স্ট্রাসের কারখানাতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান কারেন্সির ওয়াটারমার্কগুলো বানানোর চেষ্টা চলছিলো।

মতলব ছিলো যে জাল নোটগুলোকে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বাজারে ছড়িয়ে দিয়ে ওই দেশ দুটোর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া। ১৯৪৩-এর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ পাঁচ পাউণ্ড নোটের ওয়াটারমার্ক সঠিকভাবে তৈরি হয়ে গেলে প্রিন্টিংপ্লেটগুলোকে সাখসেনহাউসেন কনসেনট্রেশন শিবিরের ১৯নং ব্লকে স্থানান্তরিত করা হলো। সেখানে ইহুদী এবং অ-ইহুদী গ্র্যাফোলোজিস্ট এবং গ্র্যাফিক শিল্পীরা এস.এস.দের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যেতো। উইনজারের ওপর ভার পড়লো কাজগুলোর মান যাচাই করে দেখা, কারণ এস.এস.এরা তাদের বন্দীদের ওপর কখনোই ভরসা করতে পারতো না, ভয় ছিলো পাছে তারা তাদের কাজের মধ্যে ইচ্ছে করে কোন ত্রুটি রেখে দেয়।

দু বছরের মধ্যে উইনজার তার অধীনস্থ লোকগুলোর কাছ থেকে সবকিছু শিখে নিলো। আগেই তার কাগজ, কালি, রেখাচিত্র, লিপিমালা সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান ছিলো, এখন গ্র্যাফোলোজি শিখে নিয়ে হয়ে উঠলো এক অতি-সুদক্ষ জালিয়াত। ১৯৪৪-এর শেষ দিকে ১৯নং ব্লকে জাল পরিচয়পত্রও তৈরি হতে শুরু হলো যাতে জার্মানীর পরাজয়ের পর এস.-

এস. অফিসারেরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

১৯৪৫-এর প্রথম বসন্তে ফলিত শিল্পের এই ছোট্ট দুনিয়াটি ধসে পড়লো। স্যাখসেনহাউসেন থেকে গোটা কারবারটাকে তুলে অস্ট্রিয়ার পাহাড়ের গোপন কন্দরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলো দলটির অধিনায়ক এস.এস. ক্যাপ্টেন বার্নহার্ড ক্রুয়েগার। মালপত্তর সব নিয়ে দক্ষিণে চললো মোটরে চেপে; আপার-অস্ট্রিয়ার রেডল-জিপফের পরিত্যক্ত বীয়ার কারখানায় আবার জালিয়াতির কারখানা বসলো। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন আগে আশাহত ক্লউস উইনজারের চোখের সামনে তার বড় সাধের অত সুন্দরভাবে জাল করা অযুত-নিযুত মূল্যের পাউণ্ড ও ডলারের নোটগুলো হ্রদে ডুবিয়ে দেওয়া হলো; সেদিন তার চোখ ফেটে জল এসেছিলো।

বাড়ি ফিরে গেলো সে,—উইসব্যাডেনে। অবাক হয়ে দেখে যে ১৯৪৫ সালের সেই গ্রীষ্মে এস.এস.এ যখন ছিলো তখন খাওয়ার কোনই অভাব ছিলো না অথচ দেশে বেসামরিক লোকদের কি অন্নকষ্ট। উইসব্যাডেন এখন মার্কিনীদের কবলে, তাদের কোনই খাদ্যাভাব নেই, কিন্তু জার্মানরা শুধুই পাত কুড়িয়ে খাচ্ছে। বাপ চিরজন্মের মতো নাৎসীবিরোধী হয়ে গেছে; অবস্থাও পড়ে গেছে তার। তাছাড়া জিনিসের বড় অভাব, আগে তার দোকান হ্যামে ঠাসা থাকতো, কিন্তু এখন সার সার চকচকে আঁকশিগুলো থেকে শুধু রশিটাক স্যসেজ ঝুলছে।

ক্লউসের মা তাকে জানায় যে খাবার কিনতে হয় র‍্যাশনকার্ডে, সেগুলো আবার আমেরিকানরা ইস্যু করে। হতবুদ্ধি ক্লউস অবাক হয়ে র‍্যাশন কার্ড-গুলোকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সস্তাগোছের কাগজে স্থানীয় ছাপাখানায় ছাপানো। কয়েকটা কার্ড নিয়ে ঘরে খিল দিলো কদিনের জন্যে। বেরুলো যেদিন মায়ের হাতে গুঁজে দিলো গোটা কয়েক আমেরিকান র‍্যাশন কার্ড, যা দিয়ে ওরা ছ মাসেরও বেশী খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

মা তো আঁতকে ওঠে, "ওগুলো যে জাল!"

ক্লউস তখন ধৈর্য ধরে মাকে বোঝায় তার নিজের যুক্তি "ওগুলো জাল নয় মা, শুধু ভিন্ন মেশিনে ছাপা।"

বাবাও ছেলেকে সমর্থন করে। "মুর্খ স্ত্রীলোক তুমি, বলতে চাও যে আমাদের ছেলের র‍্যাশন কার্ডগুলো ইয়াঙ্কিদের চেয়ে খারাপ?"

তর্কে জেতা দুঃসাধ্য, বিশেষ করে সে-রাতে ওরা যখন চার পদের খাবার নিয়ে খেতে বসলো।

এক মাস পরে অটো ক্লপসের সঙ্গে দেখা হলো ক্লউস উইনজারের। ক্লপস ছিলো উইসব্যাডেন শহরে কালোবাজারের বাদশাহ। দুজনে লেগে গেলো ব্যবসায়ে। উইনজার অসংখ্য র‍্যাশন কার্ড, পেট্রল কুপন, আঞ্চলিক পাস, ড্রাইভিং লাইসেন্স, মার্কিন সামরিক পাস, পি.এক্স. কার্ড বানিয়ে দিতো আর ক্লপস সেগুলো দিয়ে খাদ্য, পেট্রল, ট্রাকের টায়ার, নাইলনের মোজা, সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি কিনতো। কালোবাজারের দরে সেগুলো বেচে বেচে ওরা অল্পদিনের মধ্যেই ভীষণ বড়লোক হয়ে উঠলো। ১৯৪৮-এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত তিরিশ মাসের মধ্যে একা উইনজারের ব্যাঙ্কের খাতাতেই পঞ্চাশ লক্ষ রাইখস্‌মার্ক জমা পড়েছিলো।

ভীতত্রস্তা জননীকে সে তার সহজদর্শন ব্যাখ্যা করে বলেছিলো, "কাগজের কখনো আসল নকল হয় না, মা; তারা হয় সক্ষম নইলে অক্ষম। কোন একটা পাস হাতে থাকলে যদি কোন সীমানাঘাঁটি তুমি পেরিয়ে যেতে পারো, আর কোন কাগজের প্রভাবে যদি সেই সীমানাঘাঁটি তুমি সত্যিই পেরিয়ে গেলে, তাহলে তোমার হাতে আছে সক্ষম কাগজ।"

১৯৪৮-এর অক্টোবরে ক্লউস উইনজার তার জীবনে দ্বিতীয়বার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। দেশে মুদ্রাসংস্কার হলোঃ পুরনো রাইখস্‌মার্কের জায়গায় এলো নতুন ডয়েট্‌সমার্ক। কিন্তু প্রতিটি পুরনো মার্কের বদলে নতুন মার্ক না দিয়ে প্রত্যেককে ঢালাও ১০০০ নতুন মার্ক দেওয়া হলো। উইনজার তলিয়ে গেলো, তার সম্পদ এখন শুধু কয়েক তাড়া বাজে কাগজ।

খোলা বাজারে জিনিসপত্র আসতে শুরু করতেই কালোবাজারিদের দিন ফুরোলো। লোকে তখন ক্লপসের পেছনে লাগলো। সময় থাকতে উইনজার সটকে পড়লো। গাড়ি নিয়ে নিজের তৈরি একটা আঞ্চলিক পাস হাতে করে সোজা হ্যানোভারে চলে এলো, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষদের সদর দপ্তরে। সেখানে ব্রিটিশ সামরিক সরকারের পাসপোর্ট অফিসে একটা

চাকরির দরখাস্ত করলো।

উইসব্যাডেনের মার্কিন কর্তৃপক্ষদের দেওয়া প্রশংসাপত্র ছিলো তার কাছে, জনৈক পূর্ণ কর্নেলের দস্তখতে। তার সম্বন্ধে চমৎকার সব অভিমত লেখা; হতেই হবে—কারণ গোটা জিনিসটা যে তারই রচনা। যে ব্রিটিশ মেজর ইণ্টারভিউ নিচ্ছিলো সে চায়ের কাপ শেষ করে প্রার্থীটিকে জানালো: নিশ্চয়ই বোঝো যে প্রত্যেকের সঙ্গে সব সময় তার সম্যক পরিচয়পত্র থাকা কতখানি আবশ্যক?”

“হ্যাঁ স্যার,···মেজর সাহেব,” একান্ত বশম্বদের মতো ভঙ্গী করে উইনজার।

দু মাস পরে এলো সৌভাগ্যের সূচনা। বীয়ার-হলে বসে একা একা বীয়ার পান করছে, একটা লোক এসে আলাপ জমালো। লোকটার নাম হার্বার্ট মল্ডার্স। উইনজারকে সে চুপিচুপি জানালো যে যুদ্ধাপরাধের জন্যে ব্রিটিশরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই জার্মানী থেকে তাকে পালিয়ে যেতেই হবে; অথচ জার্মানদের পাসপোর্ট দিতে পারে একমাত্র ব্রিটিশরা কিন্তু সে তো আবেদন করতে পারে না, তাহলেই ধরা পড়বে। উইনজার অস্ফুট স্বরে তাকে জানিয়ে দিলো যে উপায় একটা হতে পারে, কিন্তু দাম লাগবে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো উইনজার, মল্ডার্স পকেট থেকে একটা সাচ্চা হীরের নেকলেস বার করেছে। ব্যাখ্যা করে বোঝালো যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যখন ছিলো, তখন সেখানে একদিন একজন ইহুদী বন্দী এসে তার পারিবারিক জড়োয়াখানা দেখিয়ে মুক্তি চাইলো। মল্ডার্স গয়নাটা হাতিয়ে ইহুদীটাকে প্রথম দলেই গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেছিলো। নিষিদ্ধ হলেও মাল কিন্তু নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলো।

এক সপ্তাহ পরে মল্ডার্সের একটা ফটো আনিয়ে উইনজার তার পাসপোর্ট বানিয়ে ফেললো। জাল করেনি, তার দরকারও পড়েনি।

পাসপোর্টের অফিসের নিয়মরীতিগুলো বড় সরল। এক নম্বর বিভাগে প্রার্থীরা আসতো তাদের পরিচয়পত্রটত্র নিয়ে, একটা ফর্ম ভরে দিয়ে চলে যেতো। দু নম্বর বিভাগ জন্মপত্র, সনাক্ত কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি

পরীক্ষা করে দেখতো, দলিলগুলো আসল না নকল, জালিয়াতি কি না তাও দেখতো, যুদ্ধাপরাধীদের ফেরারী তালিকার সঙ্গে নামও মেলাতো, তারপর সব পরীক্ষায় পাস হয়ে গেলে দলিলগুলো অনুমোদন করে বিভাগ-প্রধানের স্বাক্ষরিত অনুমোদন সহ তিন নম্বর বিভাগে পাঠিয়ে দিতো। তিন নম্বর বিভাগ, দু নম্বর বিভাগের অনুমোদনপত্র পেলে, সিন্দুক থেকে একটা খালি পাসপোর্ট বই বের করে সব বিবরণ-টিবরণ লিখে প্রার্থীর ফটো লাগিয়ে এক সপ্তাহ পরে যখন প্রার্থী আবার সশরীরে এসে হাজির হতো তাকে দিয়ে দিতো।

উইনজার চেষ্টাচরিত্র করে তিন নম্বর বিভাগে বদলি হয়ে এসেছিলো। মল্ডার্সের হয়ে অনায়াসে অন্য একটা নামে ফর্ম ভরে দিলো। দু নম্বর বিভাগের 'আবেদন অনুমোদিত' স্লিপ লাগিয়ে ব্রিটিশ অফিসারটির স্বাক্ষর জাল করলো।

যথারীতি দু নম্বর বিভাগে গিয়ে অনুমোদিত আবেদনপত্রগুলো নিয়ে এলো পাসপোর্ট ইস্যু করবার জন্যে। সেদিন ট্রেতে ছিলো উনিশটি আবেদন-পত্র ও উনিশটি 'আবেদন অনুমোদিত' স্লিপ। তার সঙ্গে মল্ডার্সের আবেদন-পত্র ও অনুমোদন স্লিপ লাগিয়ে কুড়িটার তাড়া নিয়ে গেলো তিন নম্বরের অফিসার মেজর জনস্টোনের কাছে। জনস্টোন গুনে দেখলো যে কুড়িটা অনুমোদনপত্র আছে, ঘরের কোনায় গিয়ে সিন্দুক খুলে কুড়িটা খালি পাস-পোর্ট বের করে উইনজারকে দিলো। উইনজার সেগুলোকে ভরে সরকারী মোহর লাগিয়ে অপেক্ষমান উনিশজন উল্লসিত ব্যক্তির হাতে দিয়ে দিলো। বিংশ পাসপোর্টটি গেলো তার নিজের পকেটে। ফাইলিং ক্যাবিনেটে কুড়িটি আবেদনপত্র চলে গেলো। কুড়িখানা পাসপোর্ট ইস্যু মিলে গেলো।

সেদিন সন্ধ্যায় মল্ডার্সকে তার নতুন পাসপোর্ট দিয়ে হীরের নেকলেস পেয়ে গেলো উইনজার। নতুন রাস্তা খুলে গেলো তার সামনে, নব উদ্ভাবন।

১৯৪৯-এর মে মাসে পশ্চিম-জার্মানী স্থাপিত হলো। পাসপোর্ট অফিসটি চলে এলো লোয়ার স্যাক্সনি রাজ্যসরকারের হাতে, যার রাজধানী হ্যানোভার। উইনজার তার চাকরিতে থেকে গেলো। আর কোন মক্কেল পায়নি সে, দরকারও হয়নি। প্রতি সপ্তাহে কোন ফটোর দোকান থেকে

সাদামাটা চেহারার কোন লোকের মুখের ছবি নিয়ে এসে অতি সযত্নে পাসপোর্টের একটি আবেদন ফর্ম ভরতো উইনজার; সেই ফটোটাকে ফর্মের সঙ্গে গেঁথে দু নম্বর বিভাগের প্রধানের (যিনি একজন জার্মান) স্বাক্ষর জাল করে অনুমোদন স্লিপ বানিয়ে তিন নম্বর বিভাগের কর্তার কাছে চলে যেতো আবেদনপত্র এবং অনুমোদনপত্রগুলো নিয়ে। সংখ্যাগুলো মিলে যেতেই অতগুলো খালি পাসপোর্ট পেয়ে যেতো। আবেদনপত্রগুলো সবই হতো আসল, একটি ছাড়া। সেই একটি খালি পাসপোর্ট তার পকেটে চলে যেতো। দরকার এখন শুধু সরকারী মোহরের। চুরি করলে সন্দেহ জাগবে, তাই এক রাত্রে সেটা বাড়ি নিয়ে এলো। সকাল নাগাদ লোয়ার স্যাক্সনি রাজ্যসরকারের পাসপোর্ট অফিসের মোহরের কাস্টিং তৈরি।

ষাট সপ্তাহে ষাটটি ফাঁকা পাসপোর্ট হস্তগত করে চাকরি ছেড়ে দিলো। সবাই প্রশংসা করলো, আহা, কি ভীষণ পরিশ্রমী, যত্নবান কেরানী। আরক্তমুখে ওপরওলাদের শেষ প্রশংসা কুড়িয়ে চলে এলো উইনজার। হ্যানোভারও ছাড়লো। অ্যান্টোয়ার্পে গিয়ে হীরের নেকলেস বেচে অসনাব্রুখে এসে ছোটখাটো ছাপাখানা খুলে বসলো। সেই সময় সোনা বা ডলার দিলে ন্যায্য মূল্যের অনেক কমেও জিনিস পাওয়া যেতো।

মল্ডার্স নীরব থাকলে ওডেসার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে পড়তে হতো না। কিন্তু মাদ্রিদে পৌঁছে যেই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এসে পড়লো, অমনি তার বারফট্টাই শুরু হলো।…হুঁহুঁ বাবা।…আছে বটে একজন তার জানা-শোনা…যে-কোন ঝুটা নামে পশ্চিম-জার্মানীর পাসপোর্ট বের করে দেবে… শুধু চাইবার ওয়াস্তা!

১৯৫০-এর শেষদিকে উইনজারের সঙ্গে দেখা করতে এলো একজন 'বন্ধু'। উইনজার তখন সবে অসনাব্রুখে ছাপাখানার ব্যবসায় নেমেছে। রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। তার পর থেকে যখনই ওডেসার কেউ বিপদে পড়েছে, উইনজারকে তার জন্যে নতুন পাসপোর্ট বানিয়ে দিতে হয়েছে।

কৌশলটাও অত্যন্ত নিরাপদ। উইনজারের দরকার শুধু লোকটার একটা ফটো আর তার বয়স। প্রতিটি আবেদনপত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিগত

বিবরণ লিখে দিয়েছিলো তার প্রত্যেকটার নকল আছে তার কাছে; মূল আবেদনপত্রগুলো তো এখন হ্যানোভারের অভিলেখে শোভাবর্ধন করছে। ফাঁকা একটা পাসপোর্ট নিয়ে ১৯৪৯-এ লেখা কোন একটি আবেদনপত্রে লিপিবদ্ধ বিবরণগুলো ভরে দেয়। নামটা হয় সাধারণত কোন একটা চলতি গোছের নাম; জন্মস্থান সাধারণত এমন একটা জায়গায় যেটা এখন লৌহযবনিকার গভীর অভ্যন্তরে অতএব যাচাই অসম্ভব, জন্মতারিখটা প্রায়ই এস.এস. প্রার্থীটির আসল বয়সের কাছাকাছি হয়। তারপর পাসপোর্টটাতে লোয়ার স্যাক্সনির মোহর মেরে দেয়। লোকটা তার নতুন পাসপোর্ট নিয়ে তার নতুন নামের স্বাক্ষর দিয়ে দেয় প্রাপকের জায়গায়।

পুনর্নবীকরণও সহজ। পাঁচ বছর পরে ফেরারী এস.এস. লোকটি লোয়ার স্যাক্সনি বাদে অন্য যে কোন রাজ্যের রাজধানী শহরে গিয়ে নবীকরণের আবেদন দেবে, ধরা যাক ব্যাভেরিয়াতে। ব্যাভেরিয়ার কেরানীটি তখন হ্যানোভারকে জিজ্ঞেস করে পাঠাবে: 'আপনারা কি ১৯৫০ সালে অমুক নম্বর পাসপোর্ট ইস্যু করেছিলেন, ওয়াল্টার শুমানের নামে, যার জন্মস্থান অমুক, জন্মতারিখ অত?' হ্যানোভারে তখন আরেকটি কেরানী ফাইলের নথী ঘেঁটে জবাব পাঠাবে, 'হ্যাঁ।' ব্যাভেরিয়ার কেরানী হ্যানোভারের কেরানীর জবাব পেয়ে আশ্বস্ত হবে যে মূল পাসপোর্টটা খাঁটি। অতএব নতুন একটা পাসপোর্ট বিনা দ্বিধায় ইস্যু করে দেবে, ব্যাভেরিয়ার মোহর মেরে।

যতক্ষণ না হ্যানোভারের আবেদনপত্রে লাগানো ফটোটার সঙ্গে ম্যুনিখে জমা দেওয়া পাসপোর্টটার ফটো মিলিয়ে না দেখা যাচ্ছে, ততক্ষণ কোনই সমস্যা নেই। কিন্তু ফটো কখনোই মিলিয়ে দেখা হয় না। কেরানীরা আবেদনপত্র, অনুমোদন এবং পাসপোর্টের নম্বরের ওপর নির্ভর করে, ফটোর চেহারার ওপর নয়।

উইনজারের পাসপোর্টগুলোর জরুরী নবীকরণের দরকার হয়েছিলো ১৯৫৫ সালের পর থেকে, অর্থাৎ হ্যানোভার থেকে ইস্যু করার পাঁচ বছর পরে। কিন্তু পাসপোর্ট হাতে এলেই অন্য অন্য কাজগুলো নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে যেতো; যথা, এস.এস.-এর লোকটা পেয়ে যেতো নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স, সামাজিক নিরাপত্তার কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড

অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন এক পরিচয়।

১৯৬৪ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত হাতের ষাটটি মূল পাসপোর্টের মধ্যে বিয়াল্লিশটি ইস্যু করেছিলো উইনজার।

কিন্তু উইনজার ছিলো পরম ধূর্ত, একটা সাবধানতা সে অবলম্বন করেছিলো। জানতো যে ওডেসার পক্ষ থেকে হয়তো কোন না কোনদিন তার কাজ যাবে ফুরিয়ে, তখন তাকে ওরা ধ্বংস করতেও পেছপা হবে না। তাই, সব তথ্য সে লিখে রেখেছিলো। মক্কেলদের আসল নাম সে জানতো না, নতুন নামে পাসপোর্ট বানানোর জন্যে তো আর আসল নামের প্রয়োজন নেই, কথাটাই অবান্তর। তাই প্রতিটি ফটো যা তার কাছে আসতো তার কপি বানিয়ে নিতো। মূল ফটোটা পাসপোর্টে সেঁটে পাঠিয়ে দিতো, কপিটাকে কার্ট্রিজ পেপারে লাগিয়ে তার পাশে লোকটার নতুন নাম, ঠিকানা (জার্মান পাসপোর্টে ঠিকানার প্রয়োজনীয়তা হয়) এবং নতুন পাসপোর্ট নম্বর টাইপ করে রাখতো।

কার্ট্রিজ পেপারের শিটগুলো একটা ফাইলে লাগিয়ে রাখতো। ফাইলটাই তার জীবনবীমা। বাড়িতে তো রেখে দিয়েইছিলো আর নথীটার সম্পূর্ণ একটা প্রতিলিপি বানিয়ে জুরিখে তার উকিলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলো। যদি কোনদিন ওডেসা তাকে প্রাণের ভয় দেখায় তো তাদের সে ফাইলের কথাটা জানিয়ে দেবে। সাবধানও করে দেবে যে তার যদি কিছু ঘটে তো জুরিখের উকিল নথীর কপিটা জার্মান কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেবে।

পশ্চিম-জর্মান কর্তৃপক্ষ ফটো হাতে পেয়ে ফেরারী নাৎসীদের যে 'দুর্বৃত্ত প্রদর্শনী' আছে তাদের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবে। শুধু পাসপোর্টের নম্বরটাই যদি ষোলটি প্রাদেশিক রাজধানীর সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া যায় তো লোকটির ঠিকানা জেনে যাবে। তারপর এক সপ্তাহেরও বেশী লাগবে না তার পাত্তা পেতে। কাজেই ক্লউস উইনজারের পক্ষে বেঁচেবর্তে থাকবার উপায়টি বেশ জোরালোই বলতে হবে।...

এই হলো গিয়ে উইনজারের ইতিবৃত্ত। লোকটি আজ এখন এই শুক্রবারের সকাল সাড়ে আটটায় প্রাতরাশের শেষে কফি খেতে খেতে 'অসনাব্রুখ-জাইটুং'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বোলাচ্ছে। ফোন বেজে উঠলো।

ওধার থেকে ভেসে-আসা কণ্ঠস্বর প্রথমে সশঙ্ক, পরে আশ্বস্ত।

"তুমি কোন মুশকিলে পড়বে না আমাদের সঙ্গে, সে প্রশ্নই নেই," ওয়েরউলফ তাকে ভরসা দেয়, "শুধু মুশকিল হয়েছে এই ব্যাটা রিপোর্টারকে নিয়ে। আমরা খবর পেয়েছি যে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ওর পেছনে পেছনে আমাদের একজন লোক আসছে, আজকে দিন ফুরনোর আগেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে দশ মিনিটের মধ্যে তুমি ওখান থেকে সরে পড়ো। আমি চাই যে তুমি…"

আধ ঘণ্টা পরে ত্রস্তব্যস্ত ক্লউস উইনজার ছোট্ট একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সিন্দুকের দিকে একবার সংশয়াকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। স্থির করে ফেলে যে ফাইলটার দরকার নেই। বাড়ির পরিচারিকা বারবারাকে জানিয়ে দেয় যে সেদিন আর সকালে ছাপাখানায় যাবে না, বরং স্বল্প কদিনের ছুটি নিয়ে চললো অস্ট্রিয়ান আল্পসে। তাজা টাটকা হাওয়ার জুড়ি নেই শরীর মন প্রফুল্ল করতে। বারবারা তো স্তম্ভিত, অবাক।

দোরগোড়ায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বারবারা। উইনজারের ক্যাডেট গাড়িটার পিছু হঠে চত্বর পেরিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে বোঁ করে এগিয়ে চলে গেলো। নটা দশে শহরের চার মাইল পশ্চিমে রাস্তার বাঁকে এসে পৌঁছলো যেখান থেকে রাস্তাটা উঁচুতে উঠে জাতীয় সড়কে পড়েছে। ক্যাডেট গাড়িটা যখন চড়াই চড়ছিলো তখন বিপরীত দিক থেকে উৎরাইয়ের পথে একটা কালো জাগুয়ার সবেগে অসনাব্রুখের দিকে ছুটে আসছিলো।

পশ্চিম দিক থেকে শহরে ঢোকবার মুখটায় সার প্লাৎজে একটা তেলের ঘাঁটি পেয়ে গেলো মিলার। পাম্পের পাশে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ক্লান্ত চরণে বেরিয়ে এলো। পেশীগুলো টনটন করছে, ঘাড় বাঁকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আগের সন্ধ্যায় মদের স্বাদটা এখন টিয়াপাখির বিষ্ঠার মতো বিস্বাদ হয়ে উঠছে মুখে।

পাম্পের ছোকরাকে বললো, "গাড়িটা ভরে দাও হে ওস্তাদ।…ফোন আছে, পয়সা ফেলে করা যায়?"

"ওই কোনাটায় আছে," ছোকরা জানায়।

সেদিকে যেতে যেতে মিলার দেখলো একটা কফি অটোম্যাট। পয়সা ফেলে কাগজের কাপে ধূমায়িত এক পেয়ালা কফি নিয়ে ফোনবুথে ঢুকলো। অসনাব্রুখ শহরের ফোনের তালিকা উলটেপালটে দেখে। অনেকগুলো উইনজার আছে, কিন্তু একটিই ক্লউস। নামটা দুবার করে ছাপা। প্রথমটার পাশে লেখা আছে মুদ্রক এবং একটা টেলিফোন নম্বর; দ্বিতীয়টার বিপরীতে 'আবাস'। নটা কুড়ি বেজে গেছে, অতএব কাজের সময় এখন। ছাপাখানায় ফোন করলো।

যে লোকটা উত্তর দিলো সে সম্ভবত ফোরম্যান। বললো, "দুঃখিত, উনি এখনো আসেননি। সাধারণত কাঁটায় কাঁটায় নটায় আসেন। আসবেন নিশ্চয়ই এক্ষুনি। আধ ঘণ্টা পর আবার ফোন করুন।"

মিলার ধন্যবাদ জানিয়ে রেখে দিলো। বাড়িতে ফোন করবার কথা ভাবলো একবার, কিন্তু মনে হলো, থাক, দরকার নেই, বাড়িতে যদি থাকে গিয়েই দেখা করবে। ঠিকানা টুকে নিয়ে বুথ ছাড়লো।

পেট্রলের পয়সা দিতে দিতে পাম্পের ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলো, "ওয়েস্টারবার্গ কোথায় রে?"

ছেলেটি রাস্তার উত্তরদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "ওই যে হোথায়। বড়লোকী পাড়া, কেঁৎকারা সব থাকেন।"

শহরের একটা নক্শা কিনে মিলার তার কাঙ্ক্ষিত রাস্তাটার সন্ধান পেয়ে গেলো। দশ মিনিটেরও পথ নয়।

বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় বেশ ধনীগৃহ। গোটা অঞ্চলটাতেই উচ্চবিত্ত স্বনিয়োজিত লোকেরা বাস করে, সুন্দর আয়েসী পরিবেশ। জাগুয়ারটাকে গাড়িপথের প্রান্তে রেখে দিয়ে সামনের দরজায় এলো।

দরজা খুলে দাঁড়ালো একজন পরিচারিকা। আঠারো-উনিশ বছর বয়স, অপূর্ব সুন্দর। এক ঝলক উজ্জ্বল হাসি ছুঁড়লো তার দিকে।

মিলার বললো, "সুপ্রভাত, হের উইনজারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"উঃ, তিনি তো চলে গেছেন স্যার, মিনিট কুড়ি হলো।"

আবার আশা ফিরে পেলো মিলার। নিশ্চয়ই ছাপাখানার উদ্দেশ্যে

গেছে, পথে হয়তো কোথাও আটকা পড়েছে।

"আঃ, কি দুর্ভাগ্য ! ভেবেছিলাম তিনি কাজে যাবার আগে বাড়িতেই ধরবো তাঁকে।"

"আজ কাজে যাননি তিনি, স্যার। ছুটিতে চলে গেছেন," মেয়েটি জানায়।

মিলারের বুকে আতঙ্কের ঢেউ। "ছুটিতে? বছরের এই সময়ে?··· তাছাড়া—" তাড়াতাড়ি বানিয়ে বানিয়ে বলে, "আমার সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিলো যে আজ সকালে। এখানে আমাকে আসতে বলে-ছিলেন।"

"ইস্, কি লজ্জার কথা!" মেয়েটিরও যেন কষ্ট হচ্ছে, "আর কি তাড়া-তাড়িই না চলে গেলেন! লাইব্রেরিতে ফোন পেলেন, তারপর ওপরে উঠে এলেন। আমাকে বললেন, 'বারবারা—' ওটাই হলো আমার নাম, বুঝলেন?···'বারবারা, আমি অস্ট্রিয়ায় ছুটিতে যাচ্ছি; মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে।' দেখুন তো, আগে কক্ষনো শুনিনি যে তিনি ছুটিতে যাবার মতলব করছেন। আমাকে বললেন যে কারখানায় ফোন করে যেন জানিয়ে দিই তিনি এক সপ্তাহ আসবেন না। বাস্, তারপর তিনি রওনা দিলেন। মোটেই হের উইনজারের মতো ধরনধারণ নয়, এমন শান্ত ভদ্রলোক তিনি!"

মিলারের অন্তরের মধ্যে আশার আলো নিভে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যাচ্ছেন বলে গেছেন?"

"উঁহুঁ, কিচ্ছু না। শুধু বললেন যে অস্ট্রিয়ান আল্পসে যাচ্ছেন।"

"কোন ঠিকানা রেখে যাননি? সংযোগ করবার কোন উপায় নেই?"

"নাঃ, সেটাই বড় অদ্ভুত। কারখানার কথাটা ভাবুন দেখি? আপনি আসবার একটু আগে আমি তাদের টেলিফোন করেছিলাম। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ওঁরা···কত অর্ডার আছে সেগুলো শেষ করতে হবে।"

মিলার চটপট মনে মনে হিসাব করে নেয়। আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছে উইনজার। ৮০ মাইল বেগে চললে ইতিমধ্যে চল্লিশ মাইল পেরিয়ে গেছে। মিলার যদি একশো মাইল বেগে গাড়ি চালায় তো ঘণ্টায় কুড়ি মাইল করে এগিয়ে যাবে, অর্থাৎ দু ঘণ্টা সময় লাগবে উইনজারের গাড়ির

লেজ ধরতে। উঁহু, বহু সময় তা। দু ঘন্টায় যে-কোন জায়গায় চলে যেতে পারে সে। তাছাড়া দক্ষিণমুখে যে অস্ট্রিয়ার দিকেই চলেছে তার কি নিশ্চয়তা।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, "ফ্রাউ উইনজারের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?"

খিলখিলিয়ে উঠলো বারবারা। কটাক্ষ করে বলে, "কোন ফ্রাউ উইনজারই নেই।...কেন, আপনি কি হের উইনজারকে চেনেন না ?"

"না, কখনো দেখিনি।"

"বিয়ে করার মতো লোকই নন তিনি। এমনিতে খুব ভালো লোক কিন্তু মেয়েছেলে-টেলের ব্যাপারে একদম কোন আগ্রহই নেই। বুঝলেন তো ?"

"তাহলে উনি এখানে একাই থাকেন ?"

"প্রায় তাই, অবশ্য আমিও এখানে থাকি। একেবারে নিরাপদ, সেদিক থেকে।" খিলখিল করে হেসে যেন লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি।

"ওঃ !...আচ্ছা, ধন্যবাদ," মিলার যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

"স্বাগত আপনি।"

মেয়েটি দেখলো মিলার গাড়িপথের প্রান্তে গিয়ে তার জাগুয়ারে চেপে বসলো। গাড়িটা তার আগেই বড় মনে ধরেছিলো। এদিকে হের উইনজার তো নেই, কোন সুপুরুষ যুবককে কি রাতে বাড়িতে আনা যায় না ? সশব্দে স্টার্ট তুলে জাগুয়ার গাড়িপথ পেরিয়ে গেলো। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারবারা দরজা দিলো।

মিলার বুঝতে পারলো যে ক্রমে ক্রমে অবসাদ এসে তার দেহে বাসা বাঁধছে। হতাশাও জন্মেছে তেমনি। মনে মনে আঁচ করলো যে বেয়ার তার বাঁধন কোনমতে খুলে ফেলে স্টুটগার্টের হোটেল থেকে উইনজারকে টেলিফোন করে সাবধান করে দিয়েছে। লক্ষ্যবস্তুর এত কাছে এসে এত দূরে চলে গেলো ! আর ভাবতে পারে না ; ঘুমনোর দরকার ভীষণ।

পুরনো শহরে মধ্যযুগের প্রাচীর পেরিয়ে নকশা দেখে দেখে থিওডোর হেউস প্লাৎজে এসে পৌঁছলো। জাগুয়ারটাকে স্টেশনের সামনে রেখে

স্কোয়্যারের অপরদিকে হোহেনজোলার্ন হোটেলে এসে উঠলো।

খুব ভাগ্য ভালো, একটা ঘর খালি ছিলো। ওপরতলায় গিয়ে জামা-কাপড় খুলে চিৎপাত হয়ে পড়লো বিছানায়। মনের কোণে কি যেন একটা খচখচ করে বিঁধছিলো···সামান্য একটু সংশয়···কি যেন একটা অনুসন্ধান করবার ছিলো অথচ করেনি। কিছুতেই মনে করে উঠতে পারলো না; চোখ জুড়ে শুধু ঘুম নেমে এলো। সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমে অচেতন।

অসনাব্রুখ শহরের কেন্দ্রে এসে ম্যাকেনসেন পৌঁছলো ঠিক দেড়টার সময়। শহরে ঢোকবার মুখে ওয়েস্টারবার্গের বাড়িটা দেখে এসেছিলো; জাগুয়ারের কোন চিহ্ন নেই সেখানে। ওয়েরউলফকে ফোন করে জেনে নিতে চায় আর কোন খবর আছে কিনা।

সৌভাগ্যবশত অসনাব্রুখের ডাকঘর থিওডোর হেউস প্লাৎজের একটা দিক ঘেঁষে। বড় রেলস্টেশনটা আরেকটা কোনা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে; তৃতীয় দিকটায় হোহেনজোলার্ন হোটেল। ডাকঘরের পাশ ঘেঁষে তার গাড়ি রাখতে রাখতে ম্যাকেনসেনের মুখ ভরে হাসি ফুটে উঠলো। ওই তো জাগুয়ারটা রাখা আছে শহরের বড় হোটেলের সামনে।

ওয়েরউলফের মেজাজও একটু ভালো। "সব ঠিক আছে; আতঙ্কিত হবার কোন প্রয়োজন নেই আপাতত। সময় থাকতে আমি জালিয়াতকে খবর দিয়ে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। এইমাত্র তার বাড়িতে ফোন করলাম। পরিচারিকাই বোধহয় ধরেছিলো। বললো যে তার মনিব চলে যাওয়ার প্রায় মিনিট কুড়ি পরে একজন যুবক কালো স্পোর্টস গাড়ি হাঁকিয়ে তাঁর খোঁজে এসেছিলো।"

"আমারও কিছু খবর আছে," ম্যাকেনসেন জানায়, "জাগুয়ারটা ঠিক আমার চোখের সামনে স্কোয়্যারের ওইদিকে দাঁড় করানো আছে। খুব সম্ভব হোটেলে ঘুম মারছে সে। আমি ওকে হোটেল-কামরাতেই নিয়ে নিতে পারি, সাইলেন্সার লাগিয়ে নেবো।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও, অত তাড়াহুড়ো কোরো না," ওয়েরউলফ সাবধান করে দেয়, "আমি ভেবে দেখলাম যে অসনাব্রুখ শহরের মধ্যে ওর পটল তোলা

চলবে না। পরিচারিকা ওকে দেখেছে, ওর গাড়িটাকেও। ঝট করে পুলিসে গিয়ে এজাহার দিয়ে দেবে। তাহলেই সবাইয়ের নজর গিয়ে পড়বে জালিয়াতের ওপর আর ও লোকটা তো এমনিতে অল্পেতেই ঘাবড়ে যায়। উঁহুঁ. ওকে জড়ানো চলবে না। পরিচারিকার সাক্ষ্যে ওর ওপর ভীষণ সন্দেহ জাগবে। প্রথমত একটা টেলিফোন পেয়ে হুট করে অদৃশ্য হয়ে গেলো লোকটা, তারপর একজন যুবক এলো ওর সঙ্গে দেখা করতে আর সেই যুবকটাই হোটেল-কামরায় বন্দুকের গুলিতে খুন হলো! নাঃ, এ চলবে না ···মহা ঝামেলা।"

ম্যাকেনসেনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। "হুঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি। তাহলে হোটেল ছাড়লে পর নিয়ে নেবো।"

"হয়তো কয়েক ঘণ্টা ধরে ওখানেই থাকবে, জালিয়াতের খবরটবর নেবার চেষ্টা করবে। পাবে না কিছুই। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, মিলারের কাছে কি কোন ব্রিফকেস আছে?"

"হ্যাঁ," ম্যাকেনসেন জানালো, "কাল রাতে ক্যাবারে ছাড়ার সময় ওর হাতে ছিলো দেখেছি; সঙ্গে করে হোটেলে নিয়ে গেলো।"

"তবেই বোঝো···গাড়ির বুটে রাখলো না কেন, হোটেলের কামরায় ছেড়ে এলো না কেন? কারণ ওটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ওর কাছে—বুঝলে?"

"হুঁ।"

"ব্যাপারটা হলো কি জানো," ওয়েরউল্‌ফ বলে, "আমাকে তো ও দেখেছে, নাম-ঠিকানাও জানে। বেয়ার আর জালিয়াতের মধ্যে সংযোগের সূত্রটাও যে কি তা জানে। সাংবাদিকেরা আবার এইসব তথ্য লিখে রাখে। অতএব, ব্রিফকেসটা ভীষণ প্রয়োজনীয়। মিলার মরলেও ওটা যেন পুলিসের হাতে না পড়ে।"

"বুঝেছি, বাক্সটাও চান আপনি?"

"হয় সেটা হাতাও নয়তো উড়িয়ে দাও।"

ম্যাকেনসেন একমুহূর্ত ভাবে। "ছুটো কাজ একসঙ্গে সারতে হলে গাড়িতে বোমা বসানোই উচিত আমার। সাসপেনশনের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবো, তাহলেই জাতীয় সড়ক ধরে যখন প্রচণ্ডবেগে ছুটে যাবে, রাস্তায়

সামান্য গোত্তা খেলেই বোমাটা ফাটবে।"

"বাঃ," ওয়েরউলফ জিজ্ঞেস করে, "বাক্সটা গুঁড়িয়ে যাবে তো?"

"যে ধরনের বোমার কথা আমি ভাবছি তাতে বাক্স তো কোন্ ছার, মিলার, তার গাড়ি, তার বাক্স সব আগুন লেগে কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাই হয়ে যাবে। অথচ অত স্পীডে চলেছিলো, মনে হবে যেন দুর্ঘটনা। সাক্ষীরা বলবে, পেট্রল ট্যাঙ্ক ফেটে গিয়েছিলো—চচ্‌!···কি অদৃষ্ট!"

"করতে পারবে তুমি?" ওয়েরউলফ শুধায়।

ম্যাকেনসেন হাসে। ওর গাড়ির বুটে যা আছে তা হলো গিয়ে হত্যাকারীর স্বপ্ন। অপূর্ব যন্ত্র বানিয়ে নিতে পারে সে। এক পাউণ্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরক আর দুটো বৈদ্যুতিক স্ফোটক রয়েছে তার কাছে।

"নিশ্চয়ই," হা-হা শব্দে সরবে বলে ওঠে সে, "কোন সমস্যা নেই। তবে গাড়িতে লাগানোর জন্যে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

হঠাৎ কথা বলা থামিয়ে ডাকঘরের জানলায় গলা বার করে দেখে নিয়ে ফোনের মধ্যে গর্জে ওঠে, "পরে আবার ডাকছি।"

পাঁচ মিনিট পরে আবার সংযোগ করলো। "দুঃখিত, তখন মিলার যাচ্ছিলো কিনা, হাতে অ্যাটাচিকেস নিয়ে। গাড়িতে উঠে সোজা চলে গেলো। হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম বুক করা আছে তার। মালপত্র রেখে গেছে, কাজেই ফিরে আসবে। ঘাবড়ানোর নেই কিছু। আজ রাত্রে বোমা বসিয়ে দেবো।"

বেলা একটার একটু আগে মিলারের ঘুম ভাঙলো। বেশ ঝরঝরে লাগছে। ঘুমের মধ্যেই কথাটা মনে পড়েছিলো। গাড়ি নিয়ে সোজা উইনজারের বাড়ি চললো। পরিচারিকার মুখে হাসি ধরে না ওকে দেখে। গদগদস্বরে বলে, "হ্যালো, আবার এসেছেন?"

"এই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিলাম," মিলার বলে, "তা ভাবলাম··· আচ্ছা, কতদিন তুমি এখানে কাজ করছো?"

"উঃ···প্রায় মাস দশেক···কেন?"

"মানে, হের উইনজার তো বিয়ে করবার পাত্র নন, তুমিও এত অল্প-

বয়সী, আগে এ বাড়ির কে দেখাশোনা করতো ?"

"ওঃ, বুঝেছি কি জানতে চান। ওঁর আগের পরিচারিকা, ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল।"

"সে কোথায় আছে এখন ?"

"হাসপাতালে স্যার। মরতে বসেছে, বাঁচবে না বোধহয়। বুকের ক্যান্সার, ভয়ঙ্কর রোগ জানেন! সেইজন্যেই তো আরো অদ্ভুত লাগলো··· হের উইনজার অমন করে ছুটে চলে গেলেন। প্রত্যেকদিন ওকে তিনি দেখতে যান। ভীষণ টান তার ওপর, হের উইনজারের। কিছু ওরা করে-টরেনি জানলেন, তবে এতদিন থেকে একসঙ্গে ছিলেন, সেই ১৯৫০ থেকে, ওর সম্বন্ধে দারুণ ভালো ধারণা তাঁর। সব সময় আমাকে খালি বলেন, ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল এই কাজটা এইভাবে করতো, ওইভাবে করতো, ইত্যাদি ইত্যাদি···"

"কোন্ হাসপাতালে আছে ?" মিলার শুধালো।

"আরেঃ, নামটা ভুলে যাচ্ছি যে। দাঁড়ান, এক মিনিট, টেলিফোনের খাতায় লেখা আছে, দেখে আসছি।"

দু মিনিটের মধ্যে চলে এলো। শহরতলীর একটা বেশ উঁচুদরের প্রাইভেট স্বাস্থ্যনিবাসের নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিলো।

ম্যাপ দেখে দেখে মিলার তিনটের একটু পরে ক্লিনিকে গিয়ে হাজির হলো।

গোটা বিকেল ম্যাকেনসেন তার বোমার মালমসলা কিনলো। তার শিক্ষক একদা তাকে শিখিয়েছিলো যে অন্তর্ঘাতী কাজকর্মে সফলতালাভ করতে হলে মালমসলাগুলোকে খুব সহজ ধরনের রাখতে হয়, এমন ধরনের সব জিনিস যা সাধারণ দোকানে পাওয়া যায়।

হার্ডওয়ারের দোকান থেকে কিনলো একটা সল্ডারিং আয়রন আর ছোট এককাঠি সল্ডার ; কালো ইনস্যুলেটিং টেপের একটা রোল ; এক গজ পাতলা তার ও একটা কাটার ; একটা এক ফুট হ্যাক্‌শ ব্লেড ও ইনস্ট্যান্ট গ্লুর একটা টিউব। ইলেকট্রিকের দোকান থেকে নিলো ন ভোল্টের

একটা ট্রান্সিস্টর ব্যাটারি ; এক ইঞ্চি ব্যাসের একটা ছোট বাল্ব ; তিন গজ লম্বা দুটো সূক্ষ্ম এক-পরতের পাঁচ অ্যাম্পের তার প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া, যেটার একটার রঙ নীল আরেকটার লাল, যাতে পজিটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনাল দুটো আলাদা করে বোঝা যায়। মনিহারী দোকান থেকে পাঁচটা বড় সাইজের স্কুলের ছেলেদের রবার কিনলো, প্রায় দু ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া, সিকি ইঞ্চি মোটা। কেমিস্টের দোকান থেকে দু প্যাকেট কনডম কিনলো, প্রতি প্যাকেটে তিনটে করে রবারের আচ্ছাদন। বড় দোকান থেকে এক টিন সুন্দর চা কিনলো। ২৫০ গ্রামের টিনে মুখ-আঁটা শক্ত ঢাকনি। বারুদগুলো ভিজে স্যাতনেতে হয়ে যাক সেই সম্ভাবনা রোধ করার জন্যেই মুখ-আঁটা চায়ের টিনটা কিনলো, চা শুধু উপলক্ষ্য।

কেনাকাটা হয়ে গেলে হোহেনজোলার্ন হোটেলে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলো। তার ঘর থেকে স্কোয়্যারটা স্পষ্ট দেখা যায়। কাজ করতে করতেও চোখ রাখতে পারবে মিলার ফিরলো কিনা গাড়ি নিয়ে।

হোটেলে ঢোকবার আগে ম্যাকেনসেন তার গাড়ির বুট খুলে আধ পাউণ্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরক আর একটা বৈদ্যুতিক ডিটোনেটর নিয়ে এলো।

জানলার সামনে বসে স্কোয়্যারের দিকে চোখ রেখে ম্যাকেনসেন কাজে লেগে গেলো। অবসাদ দূর করবার জন্যে এক পট কড়া কালো কফি রেখে দিলো।

অতি সহজ একটা বোমা তৈরি করলো। পায়খানার ফুটো দিয়ে সমস্ত চা ঢেলে ফেলে টিনটাকে রাখলো। তার কাটবার কাঁচির হাতল দিয়ে ঠুকে ঢাকনিতে একটা ফুটো করলো। ন ফুট লম্বা লাল তারটার দশ ইঞ্চি পরিমাণ ছেঁটে ফেলে ছোট তারটার একটা প্রান্ত ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালের সঙ্গে সল্ডার করে দিলো। নীল রঙের লম্বা তারটার প্রান্ত নেগেটিভ টার্মিনালের সঙ্গে জুড়ে দিলো। দুটো যাতে স্পর্শ না করে সেজন্যে ব্যাটারির দুটো দিক দিয়ে তার দুটোকে নিয়ে এসে ব্যাটারি এবং তার দুটোর মাঝে ইনস্যুলেটিং টেপ লাগিয়ে দিলো।

খাটো লাল তারটার অপর প্রান্ত ডিটোনেটরের কনট্যাক্ট-পয়েন্টে জড়িয়ে দিলো। সেই একই কনট্যাক্ট-পয়েন্টে আট ফুট লম্বা লাল তারের

একটা প্রান্ত লাগিয়ে দিলো।

তারসুদ্ধু ব্যাটারিটা রাখলো চৌকো টিনের তলার দিকে। ডিটোনেটর-টাকে প্লাস্টিক বিস্ফোরকে ভাল করে গুঁজে নরম বিস্ফোরক পদার্থটাকে ব্যাটারির ওপর চেপে চেপে রাখলো। টিনটা এখন প্রায় ভরেই গেলো।

সার্কিট প্রায় তৈরি। ব্যাটারি থেকে একটা তার গেছে ডিটোনেটরে। অন্য তারটা ডিটোনেটর থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি, খোলা প্রান্ত শূন্যে ঝুলে আছে। ব্যাটারি থেকে আরেকটা তারও কোথাও যায়নি, সেটারও খোলা প্রান্ত শূন্যে ঝুলছে। কিন্তু যখন এই খোলা প্রান্ত দুটো স্পর্শ করবে —আট ফুট লম্বা লাল তারের এবং নীল তারটার—তখন সার্কিট পূর্ণ হয়ে যাবে। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎশক্তি এসে ডিটোনেটরে চার্জ করবে, ফট্ করে সেটা ফাটবে। কিন্তু সেই শব্দ ডুবে যাবে প্লাস্টিক বিস্ফোরকের ভীমগর্জনে, হোটেলের দু-তিনটে ঘর চূর্ণ করে দিতে পারে এমন তার ক্ষমতা।

বাকি রইলো ট্রিগারের কৌশল। সেটা বানানোর জন্যে রুমালে হাত জড়িয়ে নিয়ে হ্যাক্শয়ের ব্লেড বাঁকিয়ে চাপ দিলো। মাঝখান থেকে ভেঙে গেলো সেটা, প্রত্যেকটি টুকরো প্রায় ছ ইঞ্চি হয়ে কেটে গেলো, এবং দুটোরই প্রান্তে ছোট্ট ছিদ্র যেগুলো ব্লেডটাকে ফ্রেমের সঙ্গে সেঁটে রাখতো।

রবার পাঁচটাকে একের ওপর এক রেখে মোটা রবারের ব্লক বানালো একটা। ব্লেডের অংশ দুটোকে আলাদা করে রাখবার জন্যে সে দুটোকে সমান্তরাল করে পেতে কোনার দিকে রবারের ব্লকটাকে বেঁধে দিলো। ব্লেডের প্রায় ইঞ্চি চারেকের ভেতরে শুধু এখন হাওয়ার ব্যবধান। হাওয়ার চেয়েও গুরুভার কিছু প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্যে দুটোর মাঝখানে বাল্বটাকে লাগিয়ে দিলো যথেষ্ট পরিমাণ ইনস্ট্যাণ্ট-গ্লুয়ের সাহায্যে। কাঁচ তো বিদ্যুৎ পরিবহন করে না।

প্রায় তৈরি এখন সে। তার দুটোর খোলা প্রান্ত—একটা লাল আরেকটা নীল—টিনের ঢাকনির ভেতর দিয়ে গলিয়ে বের করে শক্ত করে ঢাকনি সেঁটে দিলো। একটা তার ওপরের হ্যাক্শ ব্লেডের প্রান্তে সল্ডার করে দিলো, আরেকটা নীচের ব্লেডটার সঙ্গে। বোমা এখন জীবন্ত।

ট্রিগারটার ওপরে হঠাৎ যদি চাপ লাগে কাঁচের বাল্ব ফেটে যাবে আর

ইস্পাতের ফলা দুটো পরস্পরকে স্পর্শ করবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারি থেকে উদ্‌জাত বিদ্যুৎপথ সম্পূর্ণ হয়ে পড়বে। আরো একটু সাবধানতা নিলো সে। অন্য কোন ধাতুস্পর্শেও বিদ্যুৎপথ জীবন্ত হয়ে পড়তে পারে। তাই ট্রিগারটার ওপরে ছটা কনডম একের ওপর এক সেঁটে দিলো। বাইরের ধাতুস্পর্শ থেকে প্রতিবন্ধক রইলো ছ পরতের পাতলা কিন্তু অপরিবাহী রবারের। দুর্ঘটনা অন্তত রুখবে এতে।

বোমা বানানো হয়ে গেলো। গোটা জিনিসটাকে ওয়ার্ডরোবের নীচে রেখে দিলো; বাঁধবার জন্যে কিছু তার, ক্লিপার, চটচটে কিছু টেপও রাখলো, এগুলো লাগবে মিলারের গাড়িতে যন্ত্রটাকে লাগাতে। আরো কালো কফির অর্ডার দিলো যাতে জেগে থাকতে পারে। তারপর জানলার সামনে চেয়ার টেনে সটান বসে রইলো মিলারের আগমন প্রতীক্ষায়।

মিলার কোথায় গেছে তার জানা নেই, দরকারও নেই জানার। ওয়েরউলফ তো বলেইছে জালিয়াতের কোন খোঁজই পাবে না মিলার, অতএব সে নিশ্চিন্ত। ম্যাকেনসেন শুধু কর্মী, ভালো করে নিজের কাজটুকু করাই তার কর্তব্য, তারপর দায় যাদের তাদের ওপর ছেড়ে দাও।···ধৈর্য ধরতে জানে সে। জানে মিলার শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবেই।

পনেরো

ডাক্তার বিরক্তমুখে তাকালেন ওর দিকে। মিলারের পরনে শার্ট, টাই কিছুই নেই। সাদা গোল-গলা নাইলনের সোয়েটারের ওপর কালো পুল-ওভার পরে তার ওপর একটা কালো ব্লেজার চাপিয়ে চলে এসেছে। ডাক্তারের দৃষ্টি দেখে মনে হলো তিনি ভাবছেন যে রুগীকে দেখতে এসেছে হাসপাতালে তা এমন মস্তানি পোশাক কেন, ভদ্দরলোকের মতো শার্ট-টাই পরতে কি হয়েছিলো!

অবাক বিস্ময়ে শুধোলেন, "তাঁর বোনপো আপনি?···অদ্ভুত তো! কোনদিনও শুনিনি যে ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেলের বোনপো রয়েছে।"

"যদ্দূর জানি আমিই তাঁর একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছি," মিলার বলে, "মাসীর যে এরকম অবস্থা আগে জানলে নিশ্চয়ই আরো তাড়াতাড়ি আসতাম। কিন্তু হের উইনজার মোটে আজ সকালেই আমাকে টেলিফোন করে জানালেন, মাসীকে দেখে যেতে বললেন।"

"হের উইনজার সাধারণত এইরকম সময়ে নিজেই আসেন এখানে," ডাক্তার জানিয়ে দেন।

"শুনলাম বাইরে কোথাও নাকি তাঁর ডাক পড়েছে," নির্ভেজাল মিথ্যে-গুলো বলে যায় মিলার, "অন্তত সকালে তো তাই বললেন। কদিন এখানে থাকবেন না তিনি, তাই আমাকে তাঁর বদলে রুগীর সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছেন।"

"চলে গেছেন? অ্যাঁ! কি আশ্চর্য!" এক মিনিট ইতস্তত করেন ডাক্তার, তারপর যেন মনস্থির করে ফেলেছেন সেইরকম স্বরে বলেন, "দাঁড়ান একটু।"

হাসপাতালে ঢুকেই বড় হলঘরটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা হচ্ছিলো এতক্ষণ। মিলার দেখলো যে ডাক্তার একপাশে একটা ছোট্ট অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। খোলা দরজা দিয়ে ফোনের বার্তালাপের টুকরো টুকরো ভেসে এলো ওর কানে।

"সত্যি চলে গেছেন?···আজ সকালে?···কয়েক দিনের জন্যে···না না—ধন্যবাদ ফ্রাউলিন···শুধু জানতে চাইছিলাম আজ বিকেলে তিনি আসছেন কিনা।"

ফোন রেখে দিয়ে তিনি হলঘরে ফিরে এলেন।

"আশ্চর্য!" অস্ফুটস্বরে বললেন, "সেই যবে থেকে ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল এখানে এসেছেন, নিত্যদিন ঘড়ির কাঁটা ধরে হের উইনজার এখানে আসেন, কোন ব্যতিক্রম হয়নি কোনদিন। রোগিণীর ওপর ভীষণ মমতা তাঁর। অথচ এখন, যাকগে, আশা করি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, নইলে আর হয়তো দেখতেও পাবেন না। অবস্থা এখন খারাপের দিকে বুঝলেন।"

মিলারের মুখটা বিষাদঘন হয়ে উঠলো। "হ্যাঁ, ফোনে তো তাই বললেন তিনি।···আহা! বেচারী মাসী!"

"ওঁর আত্মীয় হিসাবে অবশ্য আপনি কিছু সময় কাটাতে পারেন ওঁর সঙ্গে, কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়। আপনাকে আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত যে ওঁর কথাবার্তা প্রায় প্রলাপের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, কাজেই যতটা কম সময় পারেন থাকবেন।…আসুন এদিকে।"

কয়েকটা অলিন্দ পেরিয়ে ডাক্তার ওকে নিয়ে গিয়ে একটা শয়নকক্ষের দ্বারের সামনে দাঁড়ালেন। "ওই ভেতরে আছে, যান আপনি।"

মিলার ভেতরে ঢুকতেই ডাক্তার বাইরে থেকে আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো, কানে এলো ডাক্তারের পদশব্দ আবার অলিন্দপথে প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেলো।

ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার। পর্দার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে শীতের অপরাহ্নের যা একটু পাণ্ডুর আলো এসে পড়েছে। নিষ্প্রভতায় চোখ সয়ে গেলে পর মিলার দেখতে পেলো যে খাটের ওপর একটি কঙ্কালসার নারীমূর্তি। কয়েকটা বালিশ দিয়ে তার মাথাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে। কিন্তু নিশাবাস এবং মুখ দুটোই এমন ফ্যাকাশে রঙের যে একটার থেকে আরেকটাকে পৃথক করে চিনে নেওয়া মুশকিল। বিছানায় যেন মিশে গেছে একেবারে। চোখ দুটোও বন্ধ। মিলারের মন থেকে সব আশাভরসা মুহূর্তে অন্তর্হিত হলো। এর কাছ থেকে পলাতক জালিয়াতের কোন খবর পাওয়ার চেষ্টা করাও বাতুলতা। ফিসফিস করে ডাকলো, "ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল!"

রোগিণীর চোখের পাতা দুটো কেঁপে কেঁপে খুলে গেলো। তাকিয়ে রইলো মিলারের দিকে কিন্তু দৃষ্টিতে কোনরকম ভাবব্যঞ্জনা নেই। সন্দেহ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে কিনা তাকে। চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। বিড়বিড় করে অস্ফুটস্বরে কি সব বলতে থাকে, প্রায় অর্থহীন প্রলাপ। রক্তহীন ঠোঁটদুটোর কাছে নিয়ে কান পাতলো মিলার, যাতে অসংলগ্ন শব্দগুচ্ছকে চেতনা দিয়ে ধরতে পারে।

কিন্তু কিছু কিছু বোঝা গেলেও মিলারের কাছে তার কোনই মূল্য নেই। রোজেনহাইম সম্বন্ধে কিছু কথা…জানে যে সেটা ব্যাভেরিয়ার একটা ছোট্ট গ্রাম, হয়তো সেখানেই জন্মেছে। আবার কয়েকটি কথা… "পরনে শুভ্র পোশাক, কি সুন্দর, কি অপূর্ব সুন্দর!"…তারপর আবার কিছু

অসংলগ্ন কথাবার্তা।

মিলার আরো সামনে ঝুঁকে আসে। "ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

মৃতপ্রায় নারী বিড়বিড় করে কথা বলেই চলেছে। মিলার শুনতে পেলো···"সবায়ের হাতে প্রার্থনার পুঁথি, সব ধবধবে সাদা, কি সরল নিষ্পাপ তখন!"

চিন্তায় ভুরু কুঁচকে উঠলো মিলারের। ভাবতে ভাবতে যেন দিশা ফিরে পেলো। প্রলাপের মধ্যে রমণীটি তার প্রথম কম্যুনিয়নের কথা বলে যাচ্ছে· মিলারও যে তার মতো রোমান ক্যাথলিক।

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল?" আবার শুধালো মিলার। ভরসা নেই কিন্তু কিচ্ছু। রোগিণীর চোখ ছুটো আবার খুলে গেলো। দৃষ্টি এসে থমকে দাঁড়ালো তার গলার সাদা গোল ব্যাণ্ডের ওপর, বুকের কালো পোশাকে এবং কালো জ্যাকেটে। অবাক হয়ে দেখলো যে চোখ ছুটো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। সমতল বক্ষদেশ হঠাৎ দমকে দমকে ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকে। ভয়ানক চিন্তা হলো মিলারের। ডাক্তারকে ডেকে আনাই বোধহয় উচিত। তারপর দেখলো বন্ধ ছুটো চোখের কোণ থেকে ছু বিন্দু অশ্রু তার শুকনো গালে গড়িয়ে পড়লো। কাঁদছে মুমূর্ষু নারী।

চাদরের ওপর দিয়ে আস্তে এগিয়ে এসে ওর একটা হাত মিলারের কব্জি মুঠি করে জড়িয়ে ধরলো। অদ্ভুত শক্তি সেই মুষ্টিতে। মিলার ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিতে চাইলো কিন্তু তার আগেই কানে এলো অস্ফুট কাতরোক্তি, "আশীর্বাদ করুন, ফাদার, আমি পাপ করেছি।"

কয়েকটা সেকেণ্ড মিলার ঠিক বুঝতে পারে না, ইতিউতি তাকায়। কিন্তু নিজের পরিচ্ছদের দিকে নজর পড়তেই বুঝতে পারে এই সামান্য আলোয় স্ত্রীলোকটি তাকে যাজক বলে ভুল করেছে। মিনিট ছুয়েক মিলার তার বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, সব ফেলে দিয়ে আবার হাম্বুর্গেই ফিরে যাবে না কি পাপের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে জালিয়াতের মাধ্যমে এডুয়ার্ড রশম্যানের খবর পাওয়া যায় কিনা।··

আরেকবার ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে: "বাছা, স্বীকারোক্তি করো, শোনবার জন্যে আমি প্রস্তুত।"

কথা বলতে শুরু করলো রমণী। একঘেয়ে ক্লান্তসুরে জীবনের কাহিনী বলে গেলো। জন্মেছিলো ১৯১০ সালে ; ব্যাভেরিয়ার বনেপ্রান্তরে বেড়ে উঠেছিলো। মনে পড়ে প্রথম যুদ্ধে বাবা চলে গিয়েছিলেন। তিন বছর পরে ১৯১৮তে আর্মিস্টিস হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু মনে তখন তাঁর চরম ক্ষোভ আর দুঃখ বার্লিনের নেতাদের বিরুদ্ধে, যারা দেশটার উন্নতমস্তক ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

বিশ দশকের গোড়ার দিকে দেশে যে রাজনৈতিক আলোড়ন হয়েছিলো সে কথাও মনে আছে এই নারীর। কাছাকাছি ম্যানিখ শহরে 'পুটশ' করবার চেষ্টা হয়েছিলো, সরকার উলটে দেবার চেষ্টা করেছিলো এমন একজন লোক যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষোভ করে বেড়াতো, নাম অ্যাডলফ হিটলার। বাবাও সেই লোকটার পার্টিতে যোগ দেন। তেইশ বছর যখন বয়স হলো, দেখলো বিক্ষোভকারীটি দেশে গভর্নমেণ্ট বানিয়ে বসেছে। জার্মান কুমারী সঙ্ঘের সদস্যা হয়ে গ্রীষ্মকালে কত জায়গায় আনন্দভ্রমণ করে কাটিয়েছে,...ব্যাভেরিয়ার গউলেইটারের কাছে সেক্রেটারির কাজ করেছে,...কত সুন্দর সুন্দর স্বর্ণকেশ যুবকের সঙ্গে নেচেছে, তাদের কালো কালো ইউনিফর্মগুলো উচ্ছল হিল্লোল তুলেছে প্রাণে।

তবে রূপ ছিলো না একদম ; লম্বা ঢ্যাঙা হাড্ডিসার চেহারা, মুখটা ঘোড়ার মতো। ওপর ঠোঁটে লোম। টিকটিকে চুলগুলোকে পেছনের দিকে টেনে থুপনি দিয়ে বাঁধা। নিজের যে কি ছিরি তা ভালোমতই জানতো, তাই বিশ বছরে পা দিয়েই বুঝে ফেলেছিলো যে তার আর কোনদিন বিয়ে হবে না। চোখের সামনে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলো, সে শুধু নেমন্তন্নই খেলো। ধীরে ধীরে বিক্ষোভ আর ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠলো, জগতের ওপর তার রাগ। ১৯৩৯ সালে র‍্যাভেন্সব্রুখ নামে একটা শিবিরে ওয়াড্রেস হয়ে এলো।

সেখানে কত লোককে যে ও মুগুর মেরেছে, পিটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ব্র্যাণ্ডেনবুর্গের ক্যাম্পে অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলতে বলতে

দু গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যায়। জোর করে চেপে ধরে থাকে মিলারের কব্জি যাতে বিরক্তিতে পালিয়ে না যায় সে।

আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো মিলার, "তারপর···যুদ্ধের পর?"

কয়েক বছর ধরে অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হলো, এদিকে-ওদিকে পালিয়ে পালিয়ে। এস-এস.রা ত্যাগ করে চলে গেছে, মিত্রশক্তিরাও খুঁজে খুঁজে ফিরছে। রান্নাঘরে ঝিয়ের কাজ করলো, বাসন ধুলো, রাতে গিয়ে স্যালভেশন আর্মির হস্টেলে শুলো। তারপর একদিন ১৯৫০ সালে উইনজারের সঙ্গে দেখা হলো। অসনাব্রুখের হোটেলে উঠেছিলো সে তখন, কেনবার মতো বাড়ি খুঁজছিলো। সেই হোটেলে তখন ও ছিলো পরিচারিকা। উইনজার বাড়ি কিনলো, হ্রস্বকায় ক্লীব মানুষটা। ওকে আহ্বান জানালো বাড়ির কাজকর্ম দেখতে।

কাহিনী থামতেই মিলার জিজ্ঞেস করলো, "বাস্?"

"হ্যাঁ, ফাদার।"

"তুমি তো জানো বাছা, সম্পূর্ণ পাপস্বীকার না করলে আমি তোমাকে মুক্তিদান করতে পারবো না।"

"সবই বলেছি, ফাদার।"

গভীর করে শ্বাস টানলো মিলার। "কিন্তু জাল পাসপোর্টগুলো? যেগুলো পলায়মান এস-এস.দের জন্যে সে বানিয়ে দিতো?"

ক্ষণিকের জন্যে বৃদ্ধা নির্বাক নিশ্চুপ। মিলারের ভয় হলো হয়তো আবার অচেতন হয়ে গেছে।

"আপনি তা জানেন, ফাদার?"

"হ্যাঁ জানি।"

"আমি তো সেগুলো বানাইনি।"

"কিন্তু তুমি তো জানতে, ক্লউস উইনজার কি কর্ম করতো?"

"হ্যাঁ।" অর্ধোচ্চারিত শব্দ বেরলো শুধু।

"সে চলে গেছে এখন, চলে গেছে," মিলার বললো।

"না, যায়নি, ক্লউস যেতে পারে না, আমাকে ছেড়ে নয়, আবার ফিরে আসবে।"

"জানো কোথায় গেছে ?"

"না, ফাদার।"

"তুমি কি নিশ্চিত ? ভেবে দেখো বাছা। পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কোথায় যেতে পারে ?"

শীর্ণ মাথাটা বালিশের ওপরেই ত্বলে ত্বলে উঠলো। "জানি না ফাদার। ওরা ভয় দেখালে ফাইলটার ব্যবহার করবে। আমাকে বলেছিলো তাই করবে।"

মিলার চমকে উঠলো। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে থাকে সে, চোখ ত্বটো এখন মুদে গেছে।

"কোন্ ফাইল বাছা ?"

আরো পাঁচ মিনিট ধরে কথাবার্তা চললো। তারপর দরজায় আস্তে করে টোকা পড়লো। মিলার তার কব্জি থেকে ধীরে ধীরে মেয়েছেলেটির হাত সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো যাবার জন্যে।

"ফাদার…"

স্বরটা খুবই করুণ। ফিরে তাকালো মিলার। ত্বটি আর্ত্ত চোখের পূর্ণ দৃষ্টি তার দিকে।

"আমাকে আশীর্বাদ করুন, ফাদার।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো মিলার। ভয়ানক অপরাধ করতে যাচ্ছে, তবু মনে মনে আশা যে কোথাও কেউ কোনদিন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝবে। ডান হাত তুলে ক্রসের চিহ্ন আঁকলো।…'ইন নমিনে পাত্রিস, অৎ ফিলি, অৎ স্পিরিতাস স্যাঙ্কতি, এগো তে অ্যাবসল্ভো আ পেক্কাতিস ত্বইস।'

গভীর নিঃশ্বাস ফেললো বৃদ্ধা। তারপর চোখ বুজে চেতনার ওপারে চলে গেলো।

বাইরে অলিন্দে ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন। মিলারকে দেখেই বললেন, "যথেষ্ট সময় নিলেন আপনি।"

মিলার শুধু মাথা নাড়লো।

দরজা দিয়ে রোগিণীকে এক পলক দেখে নিয়ে ডাক্তার অযথা মন্তব্য করলেন, "ঘুমুচ্ছে।" মিলারকে সঙ্গে করে আবার হলঘরে ফিরে এলেন।

মিলার শুধালো, “কদ্দিন বাঁচবে বলে আপনি মনে করেন ডাক্তার ?”

“বলা খুব মুশকিল। ছদিন নয় তো তিনদিন, তার বেশী নয়।…মনে করবেন না কিছু,…দুঃখিত।”

“হুঁ,” গভীর শ্বাস ফেলে মিলার, “যাক…আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, আপনার জন্যেই দেখা হলো।”

ডাক্তার সামনের দরজাটা খুলে ধরলে মিলার যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। “শুনুন, একটা কথা আছে। আমাদের পরিবারে আমরা সবাই ক্যাথলিক। মাসী যাজকের কথা বলছিলেন। মানে, শেষকৃত্য, বুঝলেন তো ?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি।”

“দেখবেন একটু ব্যাপারটা ?”

“নিশ্চয়ই,” ডাক্তার বললেন, “আপনাকে অত করে কিছু বলতে হবে না। ব্যাপারটা আমি জানতাম না। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবো।…আচ্ছা, নমস্কার।”

দিনের আলো তখনো যাই-যাই করে দাঁড়িয়েই ছিলো। মিলার যখন থিওডোর হেউস প্লাৎজে পৌঁছে হোটেল থেকে কুড়ি গজ দূরে তার জাগুয়ার-খানাকে দাঁড় করালো তখন কিন্তু গোধুলির শেষ আলো আঁধারে মিশে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে তার ঘরে গেলো মিলার। আরো দু-তলা উঁচু থেকে ম্যাকেনসেন তার আগমন লক্ষ্য করলো। হাতব্যাগে বোমাটাকে ভরে নিয়ে হোটেলের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে নেমে এলো। খুব ভোরে রওনা দেবে এই অজুহাতে রাতের ভাড়া মিটিয়ে নিজের গাড়িতে এসে উঠলো। গাড়ি-টাকে অনেক ধস্তাধস্তি করে এমন একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করালো যেখান থেকে হোটেলের প্রবেশপথ এবং জাগুয়ার দুটোর ওপরেই দৃষ্টি রাখা যাবে।

গাড়িতে বসে বসে তারপর অপেক্ষা করতে থাকলো। এখনো বহু লোকের যাতায়াত, মিলারও যে কোন মুহূর্তে হোটেলের বাইরে আসতে পারে, অতএব জাগুয়ারে গিয়ে কাজ করার সময় এখনো আসেনি। যদি গাড়িতে বোমা বসানোর আগেই মিলার গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ে তাহলে

ম্যাকেনসেন তাকে অসনাব্রুখ থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে খোলা সড়কের ওপরেই শেষ করে দেবে ; ব্রিফকেসও তখন হাতিয়ে নেবে। কিন্তু মিলার যদি রাতে হোটেলে ঘুমোয় তাহলে ম্যাকেনসেন গভীর নিশীথে তার গাড়িতে বোমাটা পুঁতে দেবে, যখন ায় কেউ থাকবে না।

মিলার তার ঘরে বসে একটা নাম মনে করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো তখন। লোকটার মুখ স্পষ্ট মনে ভাসছে অথচ নামটা কিছুতেই মনে আসছে না।

…১৯৬১-র ক্রিস্টমাসের সময়। হাম্বুর্গের জেলা-আদালতের প্রেস-বক্সে বসে আছে ; একটু পরে যে মামলাটা উঠবে তাতেই ওর আগ্রহ, অপেক্ষা করছে সেটার জন্যে। এখন কিন্তু যে মামলাটা চলছে তার শেষের দিকে সে এসে আদালতে ঢুকেছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শুকনো চামচিকের মতন একটা লোক। আসামীপক্ষের উকিল আদালতের দয়া ভিক্ষা করে বক্তৃতা দিচ্ছে ; বলছে যে ক্রিস্টমাসের পরব চলছে এখন, মক্কেলের ওপর ছটি প্রাণীর জীবন নির্ভর করে—তার গিন্নী এবং পাঁচ ছেলেমেয়ের।

মিলারের মনে পড়লো তার দৃষ্টি চকিতে গিয়ে পড়েছিলো একটি শীর্ণা কষ্টক্লিষ্টা নারীমূর্তির ওপর। স্ত্রীলোকটি চরম হতাশায় দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছিলো। জজসাহেব তাঁর রায়ে জানালেন যে শাস্তি আরো কঠোর হতে পারতো কিন্তু আসামীপক্ষের কৌঁসুলির আবেদন মেনে নিয়ে তিনি আসামীকে শুধু আঠারো মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। অভি-যোগকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো যে লোকটি হাম্বুর্গের অন্যতম দক্ষ সিঁদেল চোর, সিন্দুক ভাঙতে তার জুড়ি মেলা ভার।

দিন পনেরো পরে রীপারবান থেকে সামান্য দূরে একটা বারে বসে-ছিলো মিলার। পাতালরাজ্যের সংবাদদাতাদের সঙ্গে বসে ক্রিস্টমাস ড্রিঙ্কস্ হচ্ছিলো। পকেট তখন তার বেশ গরম, মস্ত একটা সচিত্র কাহিনীর জন্যে সদ্য পেয়েছে অনেক টাকা। বারের ওদিকটাতে একটা মেয়েছেলে ঘষে ঘষে মেঝে সাফ করছিলো। তাকে দেখেই চিনতে পারলো মিলার যে এই সেই মেয়েছেলে, সেই সিঁদেল চোরের বৌ যার জেল হয়ে গেলো

ছ হপ্তা আগে। দয়া উথলে উঠলো তার, পকেট থেকে একটা একশো মার্কের নোট বের করে মেয়েছেলেটাকে দিয়ে রওনা দিলো বার থেকে।

জানুয়ারিতে তার কাছে একটা চিঠি এলো হাম্বুর্গ জেল থেকে। কোন-মতে ধরে ধরে লেখা। মেয়েছেলেটি নিশ্চয়ই বারম্যানের কাছ থেকে তার নাম জেনে নিয়ে স্বামীকে জানিয়েছিলো। চিঠিটা একটা পত্রিকার অফিসে এসেছিলো যেখানে কখনো কখনো মিলার লেখা দেয়। তারা ওকে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

চিঠিতে লেখা ছিলো ঃ

'হের মিলার মহাশয়, আমার স্ত্রী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে আপনি ক্রিস্টমাসের আগে কতখানি করেছিলেন আমার পরিবারের জন্যে। আপনার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি, জানি না কেন করেছেন, তবে আপনাকে আমি প্রচুর ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনি সত্যিকারের ভদ্রলোক। টাকাটা খুব কাজে এসেছে; ডোরিস এবং ছেলেমেয়েরা ক্রিস্টমাস ও নববর্ষ কাটাতে পেরেছে বেশ ভালোমত। যদি কোনদিন আমি আপনার কোন সাহায্যে লাগতে পারি, শুধু মুখের কথাটি খসাবেন। আমার শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি···'

কিন্তু ইতির নীচে নামটা কি লেখা ছিলো? কোপেল কি? হ্যাঁ, তাই, ঠিক, কোপেলই বটে। ভিক্টর কোপেল। মনে মনে ঈশ্বরের নাম নিলো মিলার, কোপেল যেন এখন আবার জেলখানায় না বসে থাকে। পকেট থেকে ছোট্ট খাতাটা বের করলো যেটাতে ওর নানা ধরনের চর-অনুচর-সংবাদদাতাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর টোকা থাকে। হোটেলের টেলি-ফোনটা টেনে নামিয়ে হাঁটুর ওপর রেখে হাম্বুর্গের ভূতলরাজ্যের দোস্তদের টেলিফোন করতে থাকলো।

সাড়ে সাতটায় কোপেলের সন্ধান পেলো। শুক্রবার সন্ধ্যা, তাই এক-দঙ্গল বন্ধু নিয়ে বারে বসেছে সে। টেলিফোনের ভেতর দিয়েও জ্যুক-বক্সের গান ভেসে আসছিলো, সেই হাজারবার শোনা গান—'আমি তোমার হাত ধরতে চাইগো।'

অনেক খুঁচিয়ে পুরনো কথা বলে-টলে তবে কোপেল ওকে চিনতে পারলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কয়েক পাত্তর হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

"খুব ভালো কাজ করেছিলেন, মহান কাজ, হের মিলার।"

"ছাখো, জেলখানা থেকে তুমি লিখেছিলে যে কোনদিন যদি কোন কাজ করতে বলি তোমাকে, তুমি করবে। মনে আছে সেকথা?"

কোপেলের কণ্ঠে ভয়ের সুর। "হ্যাঁ, মনে আছে—"

"আমার কিছু সাহায্যের দরকার। সামান্যই। করতে পারবে কিছু?"

হাম্বুর্গের লোকটার ভয় কাটেনি তখনো। "আমার কাছে তো বিশেষ কিছু নেই, হের মিলার।"

"আরে নাঃ, ধার চাইছি না," মিলার বলে। "শোনো, একটা কাজ আছে তোমার জন্যে, টাকা পাবে অবশ্য। সামান্যই কাজ।"

এতক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো কোপেলের। "ওঃ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তা কোত্থেকে বলছেন আপনি?"

মিলার তাকে স্থানের নির্দেশ জানিয়ে দিলো। "হাম্বুর্গ স্টেশনে চলে যাও সোজা, অসনাব্রুখের যে ট্রেনটা প্রথমে পাবে সেটাতেই চড়ে বোসো। স্টেশনে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। হ্যাঁ, শোনো, তোমার যন্তরগুলো সঙ্গে এনো।"

"কিন্তু, হের মিলার, এলাকার বাইরে তো আমি কাজ করি না। অসনাব্রুখের কিছুই আমি জানি না।"

হাম্বুর্গের ভাষা ধরলো মিলার। "একেবারে মাখন, কোপেল; ফাঁকা মাঠ। মালিক হাওয়া, এদিকে ভেতরে লুজবুজে মাল। আমি নিজে শুঁকে দেখেছি, কোন ড্যামাঙ্কি নেই, কোন মুশকিল না। হাম্বুর্গে ফিরে গিয়ে সকালের খাবার খেয়ো, থলেভরা ঝুম্‌নি নিয়ে। কেউ জিজ্ঞেসও করবে না কোত্থেকে হাটকালে। লোকটা এক হপ্তা বাইরে থাকবে, ফিরে আসবার আগেই মাল সরিয়ে নিচ্ছো, মামারা ভাববে শহরের মস্তানরা করেছে।"

"আমার রেলভাড়া কে দেবে?" কোপেল শুধায়।

"এখানে এসো, আমিই দেবো। হাম্বুর্গ থেকে নটায় একটা গাড়ি ছাড়ে। হাতে মোটে এক ঘণ্টা সময় আছে তোমার, জলদি করো।"

কোপেল বড় করে শ্বাস টানলো। "আচ্ছা, আসছি।"

ফোন রেখে দিলো মিলার। হোটেলের সুইচবোর্ড অপারেটরকে

বললো রাত এগারোটায় ডেকে দিতে। তারপর একঘুম দিয়ে নেওয়ার জন্যে শুয়ে পড়লো।

বাইরে ম্যাকেনসেন তখনো নির্জন পাহারা দিয়েই চলেছে। মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছে যে মিলার যদি না বেরোয় তো মাঝরাতে জাগুয়ারের ওপর কাজ শুরু করে দেবে।

কিন্তু রাত সোয়া এগারোটায় মিলার হোটেল থেকে বেরিয়ে চত্বর পেরিয়ে স্টেশনে গিয়ে ঢুকলো। ম্যাকেনসেন অবাক। মার্সিডিজ থেকে নেমে সেও গেলো স্টেশনে। প্রবেশমুখ থেকে দেখলো যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে মিলার ট্রেনের অপেক্ষায়।

একটা কুলিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "এই প্ল্যাটফর্মে এখন কোন্ ট্রেন আসছে?"

"এগারোটা তেত্রিশের মুনস্টার," সে বললো।

ম্যাকেনসেন কিছু বুঝতে পারে না, নিজের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিলার ট্রেন ধরছে কেন! মহা ফাঁপরে পড়লো সে। মার্সিডিজে ফিরে এসে চুপ-চাপ বসে রইলো।

এগারোটা পঁয়ত্রিশে তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। মিলার স্টেশন থেকে একজন রোগা-পাতলা নোংরা মতো লোককে সঙ্গে করে ফিরে এলো, লোকটার হাতে আবার একটা কালো চামড়ার ঝোলা। দুজনে এক-মনে কথা বলতে বলতে রাস্তা হাঁটছে। ম্যাকেনসেন মনে মনে খিস্তি করে উঠলো। সঙ্গে লোক নিয়ে যদি জাগুয়ারে চেপে মিলার ভাগে তবেই হয়েছে। দুজনে মরলে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে। কিন্তু দেখলো যে ওরা দুজনে মিলে একটা ট্যাক্সি নিলো, তখন আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লো ম্যাকেনসেন। কুড়ি মিনিট সময় দেবে ওদের, তারপর কুড়ি গজ দূরে দাঁড় করানো জাগুয়ারটার ওপর কাজ শুরু করে দেবে।

রাত দুপুরে স্কোয়্যার প্রায় খালি। গাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ম্যাকেনসেন, হাতে পেনসিল-টর্চ আর তিনটে ছোট ছোট হাতিয়ার। জাগুয়ারের কাছে এসে চারদিক দেখে নিয়ে গাড়িটার তালায় ঢুকে পড়লো। জানতো যে কাদা আর প্যাচপেচে তুষারে পরনের স্যুটটার দফা ঠাণ্ডা হয়ে

যাবে তবে তাতে পরোয়া নেই। পেনসিল-টর্চের আলোয় জাগুয়ারের সামনের দিকটার নীচে বনেটের লকিং স্যুইচ খুঁজে পেলো। কুড়ি মিনিটে খুলে ফেললো সেটা। এক ইঞ্চি লাফিয়ে উঠলো বনেটের ঢাকনি। পরে বন্ধ করার সময় ওপর দিক থেকে চাপ দিলেই হবে। বনেট খোলবার জন্যে তো আর গাড়ির দরজা ভাঙতে চায় না।

মার্সিডিজে ফিরে গিয়ে বোমাটা নিয়ে আবার এলো স্পোর্টস-গাড়িটার কাছে। গাড়ির বনেট খুলে কেউ ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে এ দেখে তো আর লোক জমে যায় না! অতি স্বাভাবিক দৃশ্য, নিজের গাড়ির টুকটাক মেরামত করছে হয়তো কেউ।

বাঁধবার তার আর প্লায়ার দিয়ে বিস্ফোরকের চার্জ চালকের আসন থেকে ফিটতিনেক দূরে বসিয়ে দিলো ইঞ্জিনের ভেতরদিকে। ট্রিগার মেক্যানিজম থেকে শক্তির আধারে পৌঁছে দুটো যে আট ফিট লম্বা তার ঝুলে রয়েছে সেগুলো ইঞ্জিনের কলকব্জাগুলোর ফাঁক দিয়ে মাটিতে গলিয়ে দিলো। আবার গাড়ির তলায় ঢুকে টর্চের আলোয় সামনের সাসপেনশনটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্থান খুঁজে পেলো। ট্রিগারের পেছন অংশটাকে ব্রেসিং-বারের সঙ্গে শক্ত করে তার দিয়ে বেঁধে পাতলা রবার-ঢাকা চোয়াল দুটোকে সামনের মোটা সাসপেনশন স্প্রিঙের পাতের মধ্যে বসিয়ে দিলো। শক্ত করে লাগিয়ে দু-চার বার ভালো করে ঝাঁকিয়ে যখন দেখলো নড়ে না, তখন গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এলো। মনে মনে হিসাব করে দেখলো যে বেগে যখন গাড়ি চলবে, রাস্তার সাধারণ কোন উঁচু অংশ বা পটহোলে লাগলেই সামনের চাকা দুটোর সাসপেনশনের পাত কাছিয়ে আসবে, ট্রিগারের খোলা চোয়াল দুটোর ওপর তখন চাপ পড়বে, আর তাহলেই পাতলা কাঁচের বাল্বটা ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবাহিত হ্যাক্‌শ ব্লেডটার দুটো অংশে ছোঁওয়া লেগে যাবে। আর তা লাগামাত্র মিলার ও তার হাতব্যাগ টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে।

তারপরে খোলা তারের ঝুল অংশগুলোকে গোল করে পাকিয়ে ইঞ্জিনের নীচে টেপ দিয়ে আটকিয়ে দিলো, যাতে সেগুলো রাস্তার ওপর লটর-

পটর করে না খোলে। কাজটা হয়ে গেলে চাপ দিয়ে বনেট বন্ধ করে ম্যাকেনসেন নিজের মার্সিডিজে গিয়ে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসলো। এখন আর চলতে কোন আপত্তি নেই, রাতে বেশ ভালোই কাজ হয়েছে।

মিলার ট্যাক্সিওলাকে বলেছিলো সার প্লাৎসে যেতে। সেখানে পৌঁছে ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় দিলো। সারাক্ষণ কোপেল মুখ বুজে বসে-ছিলো। ট্যাক্সি এখন শহরের দিকে ফিরে চলে গেলে মিলারকে জিজ্ঞেস করলো, "জানেন নিশ্চয়ই, হের মিলার, কি আপনি করতে যাচ্ছেন? মানে, এমন ধান্দায় তো আপনার থাকার কথা নয়। আপনি কাগজে-টাগজে লেখেন—"

"ঘাবড়াও মৎ কোপেল। আমি খুঁজছি শুধু কিছু কাগজপত্তর ওই বাড়ির সিন্দুকে যা রাখা আছে। সেগুলো আমি নেবো, তাছাড়া যদি আর কিছু থাকে তো সব তোমার। বুঝেছো?"

"ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন।…চলুন, কোথায় যেতে হবে।"

"হ্যাঁ, আরেকটা কথা, বাড়িতে একজন পরিচারিকা থাকে কিন্তু।"

"সে কি?" কোপেল প্রতিবাদ করে ওঠে, "আপনি যে বলেছিলেন বাড়ি খালি! ও যদি আসে আমি কিন্তু ভাগবো। মারদাঙ্গার মধ্যে আমি নেই।"

"না না, দুটো পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো, তারপর যাবো। ততক্ষণে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়বে।"

উইনজারের বাড়ি পর্যন্ত মাইলটাক পথ ওরা হেঁটেই মেরে দিলো। বাড়ির সম্মুখে পৌঁছে রাস্তার এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়ে চট করে গেটের ভেতরে ঢুকে পড়লো। কাঁকরে যাতে জুতোর শব্দ না ওঠে সেজন্যে ওরা গাড়িপথের কিনারা ঘেঁষে ঘাসের ওপর দিয়ে চললো। লন পেরিয়ে রডোডেনড্রন ঝোপে গিয়ে লুকলো। সামনের জানলা দিয়ে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে সেটা বোধহয় পড়ার ঘর।

নিশাচর জন্তুর মতো ঝোপের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলে গেলো কোপেল বাড়িটার চারধার ঘুরে দেখে আসতে। মিলারকে বললো যন্ত্র-

পাতির থলেটা যেন পাহারা দেয়। ফিরে এসে জানালো, "ঝিয়ের ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। ওইদিকটায় আলসের নীচে দেখে এলাম।"

চিরহরিৎ গাছের ঘন পাতার আড়ালে ওরা বসে রইলো এক ঘণ্টা। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। সিগারেট ধরানোরও কোন উপায় নেই। রাত একটার সময় কোপেল আবার গেলো সরেজমিনে তদন্ত করতে। এসে বললো আলো নিভে গেছে। আরো ঘণ্টা দেড়েক ওরা বসে রইলো। তারপর মিলারের কব্জিতে একটা নিঃশব্দ টিপুনি দিয়ে থলে হাতে করে কোপেল এগিয়ে গেলো। জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে লন পেরিয়ে চলে গেলো পড়ার ঘরের জানলার দিকে। বড় রাস্তায় দূরে কোথাও একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠলো, আরো দূরে একটা পথচলতি গাড়ির চাকার শব্দ ভেসে এলো।

ওদের কপাল ভালো। পড়ার ঘরের জানলার নীচটা অন্ধকার। বাড়ির এদিকটায় চাঁদ এখনো আসেনি। কোপেল তার পেনসিল-টর্চের রশ্মি দিয়ে জানলার গোটা ফ্রেমটা দেখে নিয়ে বুঝতে পারলো যে জানলাটা শক্ত কিন্তু কোন অ্যালার্ম লাগানো নেই। থলে থেকে কিছু আঠালো ফিতে, লাঠির ডগার ওপরে একটা বায়ুশোষক প্যাড, হীরে-বসানো কাঁচ কাটবার একটা কলম আর একটা রবারের হাতুড়ি বের করলো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রহাতে জানলার ছিটকিনিটার ঠিক নীচে কাঁচের ওপর দিয়ে একটা সুগোল বৃত্ত কেটে দেয়। বায়ুশোষকটাকে চেপে ধরে রবারের হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিতেই গোল অংশটা খুলে এসে শোষকের সঙ্গে সেঁটে রইলো। জানলা দিয়ে নজর বুলিয়ে দেখে যে ফিট পাঁচেক দূরে ঘরের মেঝেতে মোটা কার্পেট বিছানো। কাঁচের গোল অংশটা সেখানে তাক করে ছুঁড়ে ফেলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে জানলা খুলে নিলো। তারপর ঝটিতি জানলা দিয়ে গলে ঘরে চলে এলো, এমন অনায়াসে যেন ও একটা মাছি। মিলারও অতি সন্তর্পণে ওর পিছু পিছু এলো। বাইরের জোছনা-প্লাবনের তুলনায় ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবু কোপেল ঠিক দেখতে পাচ্ছে, যেন ভূতুড়ে চোখ আছে ওর। কামরার ভেতর দিয়ে সহজেই ও চলে এলো প্যাসেজের দরজাটার দিকে। সেটা বন্ধ করে তবে পেনসিল-টর্চ জ্বাললো।

আলোর রেখাটা ঘরময় ঘুরে বেড়ালো, যেন সন্ধানী চোখের দৃষ্টি।

ডেস্ক, টেলিফোন, বইয়ের আলমারি, হাতলওলা একটা গভীর চেয়ার—সব একে একে পর্যবেক্ষণ করে আলোর বিন্দু এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো একটা সুদৃশ্য ফায়ারপ্লেসের ওপর যার চারদিকে লাল ইঁটের মস্ত ঘেরাটোপ।

মিলারের পাশে হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে কোপেল এসে হাজির।

"এইটাই পড়ার ঘর হবে কর্তা। এক বাড়িতে তো আর দুটো ঘরে ইঁটের আগ্‌কুণ্ডি থাকবে না। তা ইঁটের সাজ খোলে কোন্ যন্ত্রে?"

"জানি না," বিড়বিড় করে বলে মিলার। কোপেলের দেখাদেখি ও-ও এখন বিড়বিড় করে কথা বলছে। তস্কর ধুরন্ধরটি তো বহু দুঃখে শিখেছে যে ফিসফিস করে কথা বলার চাইতে বিড়বিড় করা অনেক নিরাপদ।··· "তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"হায় বাপ্, সে তো বহু সময়ের ব্যাপার," কোপেল বললো।

মিলারকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো। সাবধান করে দিলো যে হাতের দস্তানা যেন কখনো না খোলে। থলেটা হাতে নিয়ে কোপেল চলে গেলো অগ্নিকুণ্ডের পাশে। মাথায় একটা ব্যাণ্ড পরে নিয়ে তার খাঁজে পেনসিল-টর্চটা আটকে দিলো। আলোর রশ্মি এখন ক্ষুদ্র বিন্দুতে শুধু সামনের দিকে পড়ছে। ইঁটের সাজের ওপর দিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করে দেখলো, কোথাও কোন উঁচুনীচু জায়গা বা খাঁজটাঁজ আছে কিনা। না পেয়ে তখন একটা তীক্ষ্ণ ফলাওলা ছুরি দিয়ে দিয়ে সরু ফাটল খোঁজে। অবশেষে পেলোও, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে তখন।

দুটো ইঁটের মধ্যে চুলের মতো সরু একটা ফাটলে গিয়ে চাকুর ফলাটা পিছলে গেলো। অস্ফুট ক্লিক শব্দ উঠলো। চার বর্গফুট পরিমাণ ইঁটের একটা ক্ষেত্র এক ইঞ্চি বেরিয়ে এলো। এমন সুন্দর কাজ যে খোলা চোখে ধরারই উপায় নেই ওখানে কোন গোপন আলমারি লুকিয়ে আছে। কোপেল দরজাটাকে আস্তে করে খুললো। দেখা গেলো তার পেছনে আছে একটা ইস্পাতের ছোট দেওয়াল-সিন্দুক।

টর্চের আলো জ্বালিয়েই রাখলো। ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলো স্টেথেস্কোপ; ইয়ারপীস দুটোকে কানে লাগালো। চার চাকতির কম্বিনেশন তালার দিকে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থেকে কাজ শুরু করলো, কান রইলো একাগ্র হয়ে

আকাঙ্ক্ষিত শব্দটার জন্যে।

দশ ফিট দূরে বসে বসে মিলার কাজটা দেখতে দেখতে ক্রমশ ঘাবড়ে যাচ্ছিলো। কোপেল কিন্তু অবিচলিত, কাজে মগ্ন হয়ে পড়েছিলো, অন্য কোনদিকে মনই নেই। চল্লিশ মিনিট লাগলো কম্বিনেশন ঘোরাতে। সিন্দুকের পাল্লা খুলে মিলারের দিকে পিছন ফিরলো। কপাল থেকে টর্চের আলো গিয়ে ঝলসে উঠলো একজোড়া রূপোর বাতিদানি ও বেশ ভারি ওজনের একটা প্রাচীন নস্যাধারের ওপর।

কোন কথা না বলে মিলার উঠে কোপেলের কাছে গেলো। তার কপালের আলো দিয়ে সিন্দুকের ভেতরটা পরীক্ষা করে দেখলো। কয়েক-তাড়া নোট ছিলো, সেগুলো বিনাবাক্যব্যয়ে কোপেলের হাতে দিয়ে দিলো। তস্কররাজ সেগুলোর দিকে একঝলক দেখে আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো।

ওপর-তাকে ছিলো শুধুমাত্র একটা জিনিস—বেশ মোটা-মতন খাকী রঙের খাম একটা। মিলার সেটা খুলে ভেতরের কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে গেলো। গোটা চল্লিশেক পৃষ্ঠা, প্রতিটায় একটা করে ফটো আট-কানো আর টাইপ করে কয়েকটা লাইন লেখা। আঠারোর পৃষ্ঠায় এসে থমকে দাঁড়ালো সে। পড়েই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, "হা ঈশ্বর !"

"চু-প !" কোপেল তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দেয়।

ফাইল বন্ধ করে টর্চটা কোপেলকে ফেরত দিয়ে মিলার বললো, "বন্ধ করে দাও।"

দরজা বন্ধ করে দিলো কোপেল। আবার ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কম্বি-নেশনও বন্ধ করলো। ইটের দেওয়াল জায়গামতন রেখে চেপে দিতেই অস্ফুট আওয়াজ করে সেটা খাপে খাপে বসে গেলো। নোটের তাড়াগুলো পকেটে পুরে ফেলেছে, ওগুলো উইনজারের শেষ চারটে নকল পাসপোর্টের ফসল। বাতিদান ও নস্যির ডিবেটাও চট করে থলেতে ভরে ফেললো কোপেল।

আলো নিভিয়ে ফেলে হাত ধরে মিলারকে নিয়ে এলো জানলার কাছে। দুজনে জানলা টপকে ঘাসের ওপর এসে পড়লো। চাঁদ এখন মেঘে ঢাকা

পড়েছে। ঝোপের দিকে পা বাড়ালো তারা। মিলার তার গোল-গলা সোয়েটারের নীচে ততক্ষণে ফাইলটা লুকিয়ে ফেলেছে।

ঝোপের ধার দিয়ে দিয়ে গেটের কাছে এলো ওরা। তারপর টুপ করে গেট পেরিয়ে রাস্তায়। রাস্তায় পৌঁছেই মিলার দৌড়তে চেষ্টা করলো।

ওকে থামিয়ে দিলো কোপেল, "আঃ! আস্তে আস্তে হাঁটুন, যেন আমরা কোন পার্টি থেকে ফিরে আসছি।"

রেলস্টেশন প্রায় তিন মাইল রাস্তা। পাঁচটা বাজে প্রায় তখন। রাস্তায় দুটো একটা লোকচলাচল শুরু হয়ে গেছে। স্টেশনে পৌঁছে দেখলো সাত-টার আগে হাম্বুর্গ যাওয়ার ট্রেন নেই। কোপেল বললো বুফেতেই অপেক্ষা করবে, কফি আর ডবলপেগ কর্নলিকার খেয়ে শরীর ততক্ষণে গরম করবে।

"বেশ ভালোই মালকড়ি, হের মিলার," ও বললো, "আপনি যা খুঁজ-ছিলেন পেয়েছেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি বৈকি।"

"আচ্ছা, তাহলে মায়ের নাম করে কেটে পড়া যাক। বাই বাই, হের মিলার।"

স্কোয়্যার পেরিয়ে হোটেলে চলে এলো মিলার। জানতেও পারলো না যে দাঁড়-করানো মার্সিডিজ থেকে একজোড়া আরক্ত চক্ষু ওকে লক্ষ্য করতে থাকলো।

মিলারের কিছু খোঁজখবর নেওয়ার ছিলো কিন্তু এখন বড্ড সকাল। তাই শুয়ে পড়বার মনস্থ করলো। তিন ঘণ্টা পরে সাড়ে নটার সময় জাগিয়ে দেবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে রাখলো।

ঠিক সাড়ে নটায় ফোন বাজলো। কফি আর রোল্‌সের অর্ডার দিয়ে দিলো। কস্‌কসে গরমজলে ধারাস্নান সেরে বেরিয়ে আসতেই দেখলো খাবার হাজির। কফি খেতে খেতে ফাইলের কাগজগুলো দেখতে থাকে। প্রায় গোটাছয়েক মুখ চেনা-চেনা ঠেকলেও নামগুলো অশ্রুত। অবশ্য জানে যে নামগুলো সব অর্থহীন।

আঠারো নম্বর পৃষ্ঠা আবার খুলে দেখলো। লোকটা একটু বয়স্ক, চুলও

খানিকটা লম্বা, ঠোঁটের ওপরে গোঁফ জমানো। কিন্তু কানদুটো ঠিক সেই রকম, মুখের আদলও। তেমনি সরু সরু নাসারন্ধ্র আর ফ্যাকাশে চোখ। নামটা খুব একটা সাধারণ নাম। ঠিকানাটা খুঁটিয়ে দেখলো ; পোস্ট্যাল নম্বর দেখে মনে হয় যে শহরের কেন্দ্রস্থল সেটা, খুব সম্ভব কোন ফ্ল্যাট বাড়ি।

দশটার সময় ঠিকানায় বর্ণিত শহরের টেলিফোন এনকোয়ারিতে ফোন করলো। কপাল ঠুকে জিজ্ঞেস করলো যে অমুক ঠিকানার ফ্ল্যাটবাড়ির ম্যানেজারের ফোন নম্বর কত। আন্দাজে ঢিল মারলো কিন্তু লেগে গেলো ঠিকই। ফ্ল্যাটবাড়িই বটে এবং বেশ অভিজাত অ্যাপার্টমেণ্ট বাড়ি

ম্যানেজারকে ফোন করলো। সবিনয়ে উচ্চ সম্বোধনে তাকে ডাকতেই গলে গেলো সে। জার্মানরা এমনিতেই উপাধির খুব ভক্ত, কাজেই তার সঠিক প্রয়োগে ফললাভ হয়। বললো যে একজন ভাড়াটেকে বারবার টেলিফোন করে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে কারণ ভদ্রলোক নিজেই ওই সময়ে টেলিফোন করতে বলেছিলেন। ম্যানেজার সাহেব কি একটু সাহায্য করতে পারেন ? ওঁর টেলিফোন কি বিকল হয়ে আছে ?

ওই প্রান্তের লোকটি খুবই সদাশয়। হের ডিরেক্টর হয়তো ফ্যাক্টরিতে রয়েছেন বা সপ্তাহান্ত কাটাতে গ্রামের বাসাতেও যেতে পারেন।

কোন্ ফ্যাক্টরি ? কেন তাঁর নিজের···রেডিও ফ্যাক্টরি ? ও: হো, কি বোকা আমি, দেখুন তো. টেলিফোন ছেড়ে দেয় মিলার। এনকোয়ারি থেকে ফ্যাক্টরির নম্বর পেয়ে গেলো। ফোন ধরলো কর্তাটির সেক্রেটারি। বললো, হের ডিরেক্টর সপ্তাহশেষে তাঁর গ্রামের বাড়িতে গেছেন. সোমবার সকালে ফিরবেন। না না, সেই বাড়ির নম্বর বলা বারণ, একান্ত থাকতে পারবেন না নইলে।···মিলার মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলো।

অবশেষে রেডিও কারখানাটির মালিকের গোপন ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জানতে পারা গেলো এক পুরনো সতীর্থের কাছ থেকে লোকটি হাম্বুর্গের এক মস্তবড় সংবাদপত্রের শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক সংবাদদাতা।

মিলার বসে রইলো খানিকক্ষণ। একদৃষ্টিতে রশম্যানের মুখের দিকে

চেয়ে থাকে। নতুন নাম ও গোপন ঠিকানাটা নোটবইয়ে লিখে নিয়েছে। এখন মনে পড়ছে, এ নাম আগেও শুনেছে, রুহ্‌র অঞ্চলের একজন উঠতি শিল্পরথী; দোকানেও দেখেছে এই কোম্পানির রেডিও। জার্মানীর ম্যাপ খুলে গ্রামের হদিসটাও খুঁজে পেলো।

ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বিল মিটিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হাতে শুধু ব্রিফকেস। ভয়ানক খিদে পেয়েছে, তাই বিশাল একটা স্টেক নিয়ে বসলো।

খেতে খেতে ভাবে সারা বিকেল গাড়ি চালিয়ে রাতে কোথাও আশ্রয় নিয়ে সকালে গিয়ে মোকাবিলা করবে। লুডউইগসবুর্গের জেড-কমিশনের সেই উকিলটির নিজস্ব টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজটাও তার কাছে আছে। খবর পাঠিয়ে দেওয়া যায় এক্ষুনি কিন্তু রশম্যানের মুখোমুখি হতে চায় সে নিজে, এতদিনের এত কষ্ট তবেই সার্থক হবে। রবিবারের সকাল এই বিষয়ে বেশ সুসময়ও বটে, চমৎকার হবে।

বেরুতে বেরুতে দুটো বাজলো। স্যুটকেসটাকে জাগুয়ারের বুটে ছুঁড়ে দিয়ে, নিজের পাশে ব্রিফকেসটা রেখে, চালকের আসনে বসলো।…অসনা-ব্রুখ শহরের শেষ প্রান্ত অব্দি পেছনে পেছনে এলো একটা মার্সিডিজ। লক্ষ্যও করলো না তা। জাতীয় সড়কে উঠে জাগুয়ার গতি বাড়াতেই, পেছনের গাড়িটা শহরের দিকে আবার ফিরে এলো।

রাস্তার ধারের একটা বুথ থেকে ম্যাকেনসেন হ্যারেমবুর্গে ওয়েরউলফকে ফোন করলো।

"রওনা হয়ে গেলো এক্ষুনি। তাড়া-খাওয়া বাদুড়ের মতো ছুটেছে দক্ষিণ দিকে।"

"তোমার যন্ত্র ওর সঙ্গে যাচ্ছে তো?"

হাসলো ম্যাকেনসেন। "যাচ্ছে বৈকি। সামনের দিকের সাসপেনশনে লাগানো আছে। পঞ্চাশ মাইল যেতে হবে না, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বাছাধন, লাশ চিনতেও পারবেন না।"

"বাঃ!" খুব খুশী হ্যারেমবার্গের লোকটি, "নিশ্চয়ই খুব খাটনি গেছে তোমার, কামেরাড। যাও, শহরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাওগে।"

দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না ম্যাকেনসেনকে। বুধবারের পর আর ঘুম হয়নি তার।

মিলার কিন্তু অনায়াসে পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে গেলো, তারপর আরো একশো, কিছুই হলো না। কারণ ম্যাকেনসেন একটা জিনিস উপেক্ষা করেছিলো। কন্টিনেণ্টাল গাড়ির সাসপেনশনে লাগালে তার বোমা এতক্ষণ কখন ফেটে যেতো, কিন্তু জাগুয়ারের সাসপেনশন ভয়ানক সুদৃঢ়। জাতীয় সড়ক ধরে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে মিলারের গাড়ি ফ্রাঙ্কফুর্টের দিকে। রাস্তার উত্থানপতনে সামনের চাকা দুটোর উপরিস্থিত ভারী স্প্রিঙের পাতগুলো সামান্য একটু এগিয়ে আসে; বোমার ট্রিগারে রাখা ছোট্ট বাক্সটা কখন ভেঙে চুরচুর অথচ বিদ্যুৎবাহিত ইস্পাত খণ্ড দুটো পরস্পরকে স্পর্শ করলো না। রাস্তার ওপরে উচ্চ স্ফীতির ধাক্কা লাগলে ওরা এক মিলিমিটার পর্যন্ত কাছিয়ে এসেছে, তারপর আবার সরে গেছে।

মিলার জানতেও পারলো না মৃত্যুর কত কাছে কতবার সে এসে দাঁড়িয়েছিলো। ছুটে চললো মুনস্টার, ডর্টমুণ্ড, ওয়েৎজলার, বাড হম্বুর্গ পেরিয়ে। ফ্রাঙ্কফুর্টে এসে পৌঁছলো তিন ঘণ্টারও কম সময়ে। তারপর রিং রোড ধরে কোয়েনিগস্টাইন হয়ে টউনাস পাহাড়ের তুষারাবৃত বন্যজঙ্গলের দিকে ধেয়ে চললো।

ষোলো

পর্বতমালার পূর্বপাদদেশে ছোট্ট একটা শহরে যখন জাগুয়ারটা এসে পৌঁছলো তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাহাড়ী ঝরনার স্বাস্থ্যকর জলের জন্যে শহরটা বিখ্যাত। ম্যাপ দেখে মিলার বুঝলো যে আর মাইল কুড়ি পথ গেলেই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যাবে। অতএব রাতে আর বেশীদূর যাবে না মনস্থ করলো, বরং একটা হোটেল খুঁজে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে।

হাউপ্ট স্ট্রাস ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্ট্রাসের মোড়ে একটা হোটেল দেখলো, তার নাম 'পার্ক'। ঘর খুঁজতেই পেয়ে গেলো। পাহাড়ে স্বাস্থ্যান্বেষীর দল গরম কালেই আসে, ফেব্রুয়ারি মাসের কনকনে ঠাণ্ডা জলে কেউ আর স্বাস্থ্য ভালো করতে আসে না। তাই এন্তার খালি ঘর ছিলো। পোর্টার জানালো হোটেলের পেছনদিকে গাড়িটাকে রাখতে হবে। সেটার পরেই হোটেলের চৌহদ্দি পেরিয়ে মস্ত মস্ত গাছ আর ঘন ঝোপ। স্নান করে রাতের খানা খেতে বেরুলো। আসবার সময় হাউপ্ট স্ট্রাসে 'গ্রুন বউম' নামে একটা ভোজনালয় দেখে মনে মনে পছন্দ করে এসেছিলো।

খেতে বসে মনে হলো কেমন অবশ লাগছে নিজেকে। ক্লান্ত তো বটেই, গত চারদিনে ভালো করে ঘুমও হয়নি, কিন্তু তাছাড়াও বোধহয় আরো কিছু আছে। হয়তো স্নায়ুর দুর্বলতা। সবে গতরাত্রে সিন্দুক ভেঙে এসেছে, তার আগে হাসপাতালে মুমূর্ষু বৃদ্ধার সামনে ধর্মের নামে বিশ্রী মিথ্যাচার। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, উইনজারের বাড়িতে আবার ফিরে গেলো, পুরনো পরিচারিকার সাক্ষাৎ পেলো, ফাইলের কথা জানতে পেলো, সিঁদেলকে খুঁজে পেলো, ফাইলও পেয়ে গেলো, সব যেন কেমন সুন্দর মিলে যাচ্ছে, বিধিলিপি যেন। অথচ তাকে বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে ওডেসার লোকেরা মারাত্মক। ওরা তো জানে যে তার নাম মিলার, ড্রীসেন হোটেলের সেই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। বেয়ারকে মারবার পর কল্‌বের পরিচয় নির্ঘাত ফাঁস হয়ে গেছে। তবু কেউ তো ওর পিছে ধাওয়া করেনি। কাউকে দেখতেও পায়নি সে।

তবু ফাইল তো পেয়েছে। উইনজারের গোপন কথাগুলো একেবারে বিস্ফোরক। পশ্চিম-জার্মানীতে এই দশকের সবচেয়ে বৃহত্তম সংবাদ। নিজের মনে মনে হাসে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওয়েট্রেসটি ভাবে খদ্দেরের হাসিটি বোধহয় তার জন্যে। পরের বার ওর টেবিলের ধার দিয়ে যাবার সময় পাছা আরো দুলিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সিগির কথা মনে পড়ে মিলারের। ভিয়েনার পরে আর তার সঙ্গে কোন কথা হয়নি, গত জানুয়ারিতে একটা চিঠি লিখেছিলো, সেই শেষ। ছ সপ্তাহ হয়ে গেলো। ওকে কাছে পেতে বড় ইচ্ছে করছে।

মনে মনে ভাবে, কি আশ্চর্য, ভয় পেলেই নারীসঙ্গের স্পৃহা পুরুষদের মনে আরো প্রবল হয়। ভয় যে পেয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। কৃতকর্মের জন্যে ভয় তো রয়েইছে, তার ওপর রয়েছে আগামীকাল সকালে নির্জন পাহাড়ী বাংলোয় সেই গণ-ঘাতকটির সঙ্গে চরম সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা। ···মাথাটাথা ঝাঁকিয়ে ভয়ের ছায়াটাকে সরিয়ে ফেলতে চাইলো। সিঁটিয়ে যাবার এটা সময় নয়। জীবনে সবচেয়ে বড় সংবাদ স্কুপ করতে চলেছে, শোধবোধের পালাও তার সঙ্গে। আরো আধ বোতল ওয়াইনের ফরমাশ দিলো।

দ্বিতীয় গেলাসে চুমুক দিতে দিতে পরিকল্পনাটা আরেকবার ভেবে নেয়। সরল সহজ জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর লুডউইগসবুর্গের উকিলের কাছে একটা টেলিফোন, আধ ঘণ্টা পরে পুলিসভ্যান এসে লোকটাকে ধরে নিয়ে যাবে, বিচার এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্যে। শক্ত ধাতের মানুষ যদি হতো মিলার, তবে এস.এস. ক্যাপ্টেনকে সে নিজে হাতে খুন করতো।

ভাবতে গিয়ে মনে হলো নিজের কাছে কোন অস্ত্র নেই। যদি রশ-ম্যানের কাছে কোন দেহরক্ষী থাকে? একা হয়তো নেই সে, তবে?··· সামরিক চাকরির সময় মিলারের এক বন্ধু রাত করে ক্যাম্পে ফেরার জন্যে গার্ডরুমে বন্দী হয়েছিলো সেই রাতটা, আসবার সময় মিলিটারি পুলিসের হাতকড়া চুরি করে নিয়ে চলে এসেছিলো। পরে তার ভাবনা হলো যে তার কিটব্যাগে যদি মাল খুঁজে পাওয়া যায় তো সর্বনাশ, তাই চুপিচুপি সে সেই হাতকড়া মিলারকে দিয়ে দেয়। মিলার সেটা তার কাছে রেখে দিয়েছে সৈন্যজীবনের বন্যরাত্রির স্মারক হিসাবে। এখনো তার হাম্বুর্গের ফ্ল্যাটে ট্রাঙ্কের তলায় সেটা আছে।

বন্দুকও আছে একটা—ছোট্ট একটা সাউয়ের অটোমেটিক। সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধভাবেই কিনেছিলো সেটা; ১৯৬০ সালে যখন হাম্বুর্গের পাপচক্র প্রকাশ করে দেবার কাজে ব্যাপৃত ছিলো, তখন ছোট পাউলির দল তাকে ভয় দেখিয়েছিলো, সেই তখনকার কেনা। সেটাও হাম্বুর্গে তার টেবিলের দেরাজে তালাবন্ধ।

মদের প্রভাবে সামান্য মাথা ঘুরছিলো। বিল মিটিয়ে হোটেলে চলে

এলো। ঘরে ঢুকে ফোন করবে ভেবেছিলো, কিন্তু হোটেলে ঢুকতেই ছুটো পাবলিক বুথ দেখে সেখান থেকে ফোন করাই সাব্যস্ত করলো। অনেক বেশী নিরাপদ।

দশটা বাজে প্রায়। যে ক্লাবে কাজ করে সেখানেই সিগিকে পাওয়া গেলো। ব্যাণ্ডের বাজনা ছাড়িয়ে যাতে শুনতে পায় তাই চেঁচাতে হলো মিলারকে।

প্রশ্নের ফোয়ারা ছোটালো সিগি। কোথায় আছে, কি করছে, অ্যাদ্দিন কোন খবর দেয়নি কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলো সব এড়িয়ে মিলার তাকে বললো সে কি চায়। না না, যেতে পারবে না এখন, সিগি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু মিলারের গলার স্বরে যেন কি ছিলো, থমকে গেলো সিগি।

লাইনের ভেতর দিয়ে চিৎকার করে প্রশ্ন করলো, "ভালো আছ তো তুমি ?"

"হ্যাঁ, ভালোই আছি, কিন্তু তোমার সাহায্য দরকার। লক্ষ্মীটি, না কোরো না। অন্তত এখন না, আজ রাত্রে না।"

সামান্য বিরতি দিয়ে সিগি শুধু জানালো, "আচ্ছা, আসবো। ওদের না হয় বলে দেবো যে ভীষণ জরুরী। নিকট-আত্মীয় বা কিছু।"

"গাড়ি ভাড়া করবার মতো পয়সা আছে তো ?"

"আছে বোধহয়, নইলে কোন মেয়ের কাছ থেকে ধার করে নেবো।"

সারারাত গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় এরকম একটা দোকানের ঠিকানা জানিয়ে দিলো মিলার। বারবার বলে দিলো যেন তার নাম বলে, মালিকের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে।

"কদ্দুর এখান থেকে ?" সিগি শুধালো।

"হাম্বুর্গ থেকে ৫০০ কিলোমিটার। পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে, বড়জোর ছয়। ভোর পাঁচটায় এসে যাবে। জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেন।"

"বেশ, আসছি তাহলে।" আবার একটু বিরতি পড়লো, তারপর,··· "পিটার, সোনা···"

"কি ?"

"তুমি কি ভয় পেয়েছো কিছুতে ?"

কাঁটা চড়ে যাচ্ছে তখন, কাছে আর এক মার্কের মুদ্রাও নেই।

“হ্যাঁ,” বলেই রেখে দিলো ফোন, তক্ষুনি সেটা নিজে থেকেও কেটে গেলো।

হোটেলের আপ্যায়ন-কক্ষে রাতের বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করে বাদামী রঙের একটা শক্তপোক্ত বড় খাম আর বেশ কিছু ডাকটিকিট কিনে নিলো। ঘরে ফিরে এসে ব্রিফকেস খুলে সলোমন টউবেরের ডায়রি, উইনজারের সিন্দুক থেকে পাওয়া ফাইল আর দুটো ফটো বের করলো। ডায়রির সেই পাতা দুটো আবার নতুন করে পড়লো, যা থেকে এই অভিযান-স্পৃহা তার জন্মেছিলো। ফটো দুটোকে পাশাপাশি রেখে অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাক্স থেকে তারপরে সাদা কাগজ বের করে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট লিপি লিখলো; যাতে পাঠকের মনে কোন দ্বিধাই না থাকে যে এই তাড়াখানেক ফটো-সাঁটা-সাঁটা কাগজগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি। চিঠি, উইনজারের সিন্দুক থেকে আনা ফাইল আর দুটো ফটোর মধ্যে একটাকে খামে ভরে, ঠিকানা লিখে, সব টিকিট কটি লাগিয়ে দিলো। দ্বিতীয় ফটোটা নিজের বুকপকেটে রাখলো।

তারপর বন্ধ খাম আর ডায়রিটা ব্রিফকেসে পুরে, বাক্সটাকে বিছানার তলায় রেখে দিলো।

স্যুটকেসের মধ্যে ছোট একটা ফ্লাস্কে ব্র্যাণ্ডি ছিলো। তা থেকে সামান্য পরিমাণ ঢেলে নিলো। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছিলো, কিন্তু তরল আগুন পেটে পড়তেই স্থির হয়ে গেলো তা। বিছানায় শুয়ে পড়লো। মাথাটা ঘুরছে একটু। কিন্তু ক্রমে তন্দ্রায় ঢুলে পড়লো সে।

ম্যুনিখে ভূতলকক্ষে জোসেফ জোরে জোরে পায়চারি করছে। ভীষণ রেগে গেছে সে, অধীরও তেমনি। টেবিলে বসে বসে লিওঁ ও মোট্টি আবার ঘড়ি দেখলো। তেল আভিভ থেকে কেব্‌ল্ আসবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে।

মিলারকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। টেলিফোনে অনুরোধ করার পর অ্যালফ্রেড অস্টার বেরোথের কারপার্ক ঘুরে এসে জানিয়েছে যে

জাগুয়ার গাড়িটা নেই।

খবরটা শুনে জোসেফ গজগজ করে উঠেছিলো। "গাড়িটা দেখতে পেলে ওরা ঠিক বুঝতে পারবে যে ব্রেমেনের রুটি-কারখানার শ্রমিক ও হতেই পারে না। পিটার মিলার বলে চিনতেও যদি না পারে তাতে কি?"

পরে স্টুটগার্ট থেকে লিওঁকে তার এক বন্ধু জানিয়েছিলো যে স্থানীয় পুলিস বেয়ার নামে একজন নাগরিককে হোটেল-কামরায় হত্যা করবার জন্যে জনৈক যুবককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিবরণ শুনে স্পষ্টই বোঝা গেলো যে নিরুদ্দিষ্ট খুনী আর কেউ নয়, কল্‌বের ছদ্মবেশে মিলার। তবে ভাগ্য ভালো যে হোটেলের খাতায় কল্‌ব বা মিলার কোন নামই সে লেখায়নি; স্পোর্টস গাড়িরও কোন উল্লেখ নেই।

"অন্তত নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলে ওঠবার মতো বুদ্ধি তো করেছিলো," লিওঁ বলে।

মোট্টি জানায়, "তা তো করবেই। কল্‌ব যে তখন যুদ্ধ-অপরাধের দায়ে ফেরারী; ব্রেমেনের পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরকম অভিনয় তো করতে হবেই।"

কিন্তু তাতে ওদের লাভ কি? স্টুটগার্টের পুলিস মিলারকে খুঁজে পায়নি ঠিকই, কিন্তু লিওঁর দলও তো পায়নি! ওদের মনে বরঞ্চ আরো ভয় যে ওডেসা হয়তো এতক্ষণে আরো কাছে এগিয়ে এসেছে।

"বেয়ারকে মারবার পর বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে তার ছদ্মপরিচয় ফেঁসে গেছে, তাই আবার মিলার নামে ফিরে গেছে," লিওঁ যুক্তি দেখায়, "কাজেই রশম্যানের অনুসন্ধান ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে, অবশ্য যদি না বেয়ারের কাছ থেকে এমন কোন সূত্র পেয়ে থাকে যা তাকে রশম্যানের পথ সঠিক বাৎলে দিয়েছে।"

"তাহলে খবর দিচ্ছে না কেন?" ফুঁসে ওঠে জোসেফ, "গর্দভটা ভাবে নাকি যে সে নিজে একা একাই রশম্যানের পাল্লা নিতে পারবে?"

মোট্টি গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠে। "ও তো আর ওডেসায় রশম্যানের গুরুত্ব জানে না।"

"জানবে এবার, যদি আরো কাছে এগিয়ে যায়," লিওঁ বলে।

"ততদিনে লাশ হয়ে পড়ে থাকবে আর আমরা আবার ছকের গোড়াতে এসে পড়বো," জোসেফ গোম্‌রায়, "বোক্‌চন্দর টেলিফোন করে না কেন?"

কিন্তু সে রাতে ফোনের লাইন অন্য এলাকায় বেশ ব্যস্ত। ক্লউস উইন-জার টেলিফোন করলো রেগেন্সবুর্গের পার্বত্য অঞ্চল থেকে ন্যুরেমবার্গে ওয়েরউলফকে। খবর পেয়ে আশ্বস্ত হলো সে।

"বাড়ি ফিরে যেতে পারো তুমি," ওডেসার প্রধান তাকে জানিয়েছিলো, "যে লোকটা তোমাকে প্রশ্ন করতে আসছিলো, এতক্ষণে তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।"

জালিয়াত তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে এক দিন এক রাতের বিল মিটিয়ে অন্ধকারের রাজ্য ছেড়ে চললো পরিচিত আলোকের উদ্দেশ্যে— উত্তরদিকে, অসনাব্রুখের পথে। প্রাতরাশের সময়ে পৌঁছে যাবে; বেশ আয়েস করে খেয়েদেয়ে স্নান করে একটা ঘুম দেওয়া যাবে। সোমবার সকালে আবার ছাপাখানায় পৌঁছে যাবে, আবার ব্যবসার স্বক্ষেত্রে গিয়ে সিংহ হবে।

শোবার ঘরের দরজায় করাঘাতের শব্দে মিলারের ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মিটমিট করে চাইলো, শোবার আগে আলো নেভাতেও ভুলে গেছে। দরজা খুলে দেখে রাতের বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে সিগি।

মিলার ওকে আশ্বস্ত করে; ভদ্রমহিলা তার বৌ, বাড়ি থেকে জরুরী কাগজপত্র নিয়ে এসেছে, কাল সকালে ব্যবসার মিটিঙ আছে যে। বেয়ারাটি সরল পাহাড়ী বালক, উচ্চারণে এখনো তার দুর্বোধ্য হেসিয়ান টান, হাতের মুঠোয় বকশিশ গুঁজে নিয়ে কেটে পড়লো।

দরজা বন্ধ হতেই সিগি ওর গলা জড়িয়ে ধরে। "কোথায় ছিলে? এখানে কি করছো?..."

প্রশ্নের বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করলো খুব সহজ উপায়ে। দুজনে যখন সরে এলো তখন সিগির ঠাণ্ডা গাল দুটোয় রক্তোচ্ছ্বাস আর মিলারের মনে হচ্ছে ও যেন একটা লড়ুয়ে মোরগ, ঝুঁটি বাগিয়েই আছে।

সিগির কোটটা নিয়ে দরজার হুকে ঝুলিয়ে দিলো। কিন্তু আবার প্রশ্ন শুরু হলো।

"উঁহুঁ,···এখন নয়, প্রথম জিনিস প্রথমে," মিলার বলে। টেনে তাকে নিয়ে আসে বিছানায়। মোটা পালকের গদি তখনো মিলারের দেহের উত্তাপে উষ্ণ। খিলখিলিয়ে ওঠে সিগি। "বদলাওনি দেখছি।"

ক্যাবারের পোশাক পরেই চলে এসেছিলো। সামনের দিকে অনেকটা খোলা, তলায় শুধু চিলতে ব্র্যা। পিঠের পেছনে জিপ খুলে নিয়ে কাঁধের ফিতে নামিয়ে দেয় মিলার। সঘন নিশ্বাস, শীৎকার, সরব হর্ষধ্বনি,···এক ঘণ্টা কেটে গেলো। দুজনেই সুখী, উৎফুল্ল, ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ছে। ছোট্ট গেলাসটায় ব্র্যাণ্ডি আর জল ঢাললো মিলার। সিগি শুধু দু চুমুক খেলো, তার ওই চাকরি সত্ত্বেও কড়া পানীয়ে সে অভ্যস্ত নয়। বাকিটুকু মিলার গিলে ফেললো।

"তাহলে," সিগি এবার ফোড়ন কাটে, "প্রথম জিনিস যখন হয়ে গেলো, তখন···"

"কিছুক্ষণের মতো," মিলার পাদপূরণ করে দেয়। খিলখিল করে হাসে সিগি।

"আচ্ছা না হয় কিছুক্ষণের মতোই হলো। এখন বলো দেখি ওইরকম একটা রহস্যপূর্ণ চিঠি, ছ সপ্তাহ একেবারে চুপচাপ, এইরকম অদ্ভুত চুলের ছাঁট আর এখানে এই হেস অঞ্চলের হোটেলে—এ সবের মানে কি ?"

মিলার গম্ভীর হয়ে পড়লো। ব্রিফকেস নিয়ে খাটের প্রান্তে বসে, সম্পূর্ণ বসনমুক্ত এখন।

"শীগগিরি যখন জানতেই পারবে, তখন না হয় বলেই দিচ্ছি।"

এক ঘণ্টা ধরে বললো। ডায়রিটা আবিষ্কারের কথা থেকে আরম্ভ করে জালিয়াতের বাড়িতে সিন্দুক ভাঙা পর্যন্ত। কাগজপত্রগুলোও দেখালো। শুনতে শুনতে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়ে সিগি।

"পাগল তুমি, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। মারা পড়তে পারতে, জেলে যেতে পারতে,···কি আশ্চর্য !"

"করতেই হয়েছিলো আমাকে, উপায় নেই।"

"একটা পচা পুরনো বুড়ো নাৎসীর জন্যে ? তোমার মাথার ঠিক আছে তো? কি অদ্ভুত! এসব তো কবে চুকেবুকে গেছে, পিটার, শেষ হয়ে গেছে। তার জন্যে তুমি সময় নষ্ট করছো…কেন ?"

অবাক দৃষ্টিতে সিগি চেয়ে থাকে তার দিকে।

"হ্যাঁ, করছি," জেদ ধরেছে যেন মিলার।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে সিগি। মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চায় যে বুঝতে পারেনি।

"আচ্ছা তা না হয় হলো," আবার বলে ওঠে, "সব তো এখন শেষ। তুমি লোকটার পরিচয় জানো, কোথায় থাকে তাও জানো। হাম্বুর্গে চলে এসো, টেলিফোন করে পুলিসকে জানিয়ে দাও, তারা বাকি কাজ করবে, পুলিস আছেই তো সেইজন্যে।"

মিলার বোঝে না কি বলবে। শুধু বললো, "না, অত সহজ না। আমি সকালেই ওখানে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছো ?"

জানলার দিকে দেখিয়ে দেয় মিলার। বাইরে এখনো পুঞ্জীভূত আঁধারের মতো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। "ওর বাড়িতে।"

"ওর বাড়িতে? কেন ?" ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে সিগির চোখ, "ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো, অ্যাঁ ?"

"হ্যাঁ। কেন তা জিজ্ঞেস কোরো না, কারণ আমি তা বলতে পারবো না। তবে কাজটা আমাকে করতেই হবে।"

সিগির প্রতিক্রিয়া ওকে আশ্চর্য করে দেয়। ঝট করে উঠে হাঁটু ভেঙে বসে মিলারের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চায় মেয়েটি। মিলার তখন বালিশে মাথা উঁচু করে শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানছিলো।

"সেইজন্যেই তোমার বন্দুক দরকার, না ?" কথাগুলো ছুঁড়ে দেয় যেন মিলারের দিকে। রাগে উত্তেজনায় বুক হুটো ওঠে নামে।

"ওকে মারতে যাচ্ছো তুমি…"

"না, ওকে আমি মারতে যাচ্ছি না…"

"তাহলে ও তোমাকে মারবে। আর তুমি সেখানে যাচ্ছো একা, একটা

বন্দুক হাতে করে, ওইরকম একটা লোক, তার ওপর ওর দলবল আছে। তুমি একটা খচ্চর, একটা পচা, একটা গন্ধপড়া, অদ্ভুত…"

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায় মিলার। "অত উত্তেজিত হচ্ছো কেন? রশম্যানের জন্যে?"

"ওই বিচ্ছিরি বুড়ো নাৎসী শুয়োরটার জন্যে আমার কি? ওর জন্যে থোড়াই উত্তেজিত হচ্ছি। আমি আমার কথা বলছি। তোমার এবং আমার কথা,…উজবুক কোথাকার। ওখানে যাচ্ছো খুন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও, কেন না কোন একটা কথা প্রমাণ করবে, তোমার গবেট পত্রিকা পাঠক-গুলোর জন্যে ফলাও করে গল্প লিখবে। আমার কথা মুহূর্তের জন্যেও তোমার মনে হয় না…"

কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। দু চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন ঝরে। দু গাল দিয়ে মাসকারা গড়ায় কালো রেললাইনের মতো রেখায়।

"আমার দিকে চেয়ে দেখো তো, কি দেখছো? আরেকটা মুচমুচে মাল, ভোগ করতে মহা আরাম…না? সত্যিই কি মনে করো যে যে-কোন মাথা-খারাপ রিপোর্টারের সঙ্গে রোজ রাতে শুয়ে পড়বো যাতে সে আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে দুলতে দুলতে তার কোন অর্থহীন কাহিনীর পেছনে ছুটবে নিজের প্রাণকেও সংশয় করে? সত্যিই তাই ভাবো। তাহলে শোনো হাঁদা-রাম, আমি বিয়েয় বসতে চাই। ফ্রাউ মিলার হতে চাই। সন্তান চাই আমি। আর তুমি চললে কিনা নিজেকে খুন হতে দিতে…হা ঈশ্বর…"

খাট থেকে লাফিয়ে একদৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ভেতর থেকে সশব্দে দরজা দিয়ে দেয়।

মিলার হাঁ হয়ে শুয়ে থাকে। সিগারেটটা জ্বলতে জ্বলতে তার আঙুলে এসে ঠেকে প্রায়। এত রাগ করতে কখনো দেখেনি সিগিকে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় সে।

সিগারেটটা সিগারেট মাটিতে থেঁতলে দিয়ে বাথরুমের দরজার কাছে চলে এলো মিলার। "সিগি!"

কোনো উত্তর নেই।

"সিগি!"

কলের আওয়াজ থেমে গেলো। "চলে যাও।"

"সিগি, দরজা খোলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে!"

একটু বিরতির পর দরজার ছিটকিনি খুলে গেলো। দাঁড়িয়ে আছে সিগি, সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ, থমথমে মুখ। গাল থেকে মাসকারার কালো রেখা ধুয়ে ফেলেছে।

"কি চাও?" জিজ্ঞেস করলো।

"খাটে এসো, কথা বলতে চাই। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনেই আমরা জমে যাবো।"

"নাঃ, আবার তুমি ওইসব শুরু করবে।"

"না, করবো না, প্রমিস। কথা বলবো শুধু।" হাত ধরে ওকে বিছানায় নিয়ে এলো। উষ্ণতার আস্বাদে গুটিসুটি মেরে সে শুয়ে পড়লো। বালিশের ওপর থেকে দুটো সাবধানী চোখ মেলে মিলারকে দেখতে থাকে।

সন্দেহঘন কণ্ঠে শুধায়, "কি কথা?"

পাশে এসে শুয়ে পড়লো মিলার। কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "সিগ্রিড রাহ্‌ন, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগি বলে, "সত্যি বলছো?"

"হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। আগে কখনো কথাটা ভাবিনি, তবে আগে তো তুমি কখনো এমন রেগে ওঠোনি।"

"গশ্‌..." এমন ভাবে শব্দ করে ওঠে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না, "তাহলে তো প্রায়ই রাগ করতে হয় দেখছি!"

আবার শুধালো মিলার, "উত্তর পাবো কি আমার প্রশ্নের?"

"ও, হ্যাঁ পিটার, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বিয়ে করবো। দুজনে আমরা কত ভালো হয়ে থাকবো, দেখো।"

ওকে আবার সোহাগ করতে আরম্ভ করে দিলো মিলার।

"বললে যে আর ওসব না," সিগি মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

"শুধু একবার, আচ্ছা?"

বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলো মিলার।

বাইরে তুষারের প্রান্ত বেয়ে পুব আকাশে সোনালী আলোর রেখা

ফুটে উঠছিলো। মিলার যদি তখন ঘড়ি দেখতো তো বুঝতে পারতো সকাল ছটা পঞ্চাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সে বেচারী তখন ঘুমে আচ্ছন্ন।

আধ ঘণ্টা পরে ক্লউস উইনজার তার বাড়ির গাড়িপথ বেয়ে বন্ধ গ্যারেজের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালো। ভয়ানক পরিশ্রান্ত, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে গেছে। দেখে ভালো লাগছে।

বারবারা তখনো ওঠেনি। মনিবের অনুপস্থিতিতে একটু বেশীই ঘুমিয়ে নিচ্ছে। উইনজার হলঘরে ঢুকে ডাকাডাকি করতেই বেরিয়ে এলো সে। গায়ে স্বচ্ছ নিশাবাস। অন্য কোন পুরুষ হলে তার নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু সে বালাই নেই উইনজারের; তার বদলে সে চাইলো শুধু ভাজা ডিম, টোস্ট, জ্যাম, একপাত্র কফি এবং স্নানের ব্যবস্থা। কিন্তু কোনটাই জুটলো না তার ভাগ্যে। বারবারা এক আতঙ্ককর কাহিনী বলে গেলো। শনিবার সকালে পড়ার ঘরে ঝাড়পোঁচ করতে গিয়ে দেখে যে জানলার কাঁচ ভাঙা, রূপোর বাতিদান নেই। তক্ষুনি পুলিসে খবর দিয়েছিলো। তারা কাঁচের ওপর সুছাঁদ গোলাকার বৃত্তটি দেখে বলেছিলো যে নিঃসন্দেহে এটা কোন পেশাদারের কাজ। বারবারার কাছ থেকে যখন তারা শুনলো যে বাড়ির মালিক বাইরে গেছে, বলে গেলো—এলেই যেন তাদের খবর দেওয়া হয়, চুরি-যাওয়া জিনিসপত্র সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে।

মেয়েটির অনর্গল বাক্যস্রোত উইনজার চুপচাপ শুনে যায়। বিবর্ণ হয়ে ওঠে তার মুখের রঙ, রগের কাছে একটিমাত্র শিরা থিরথির করে কাঁপতে থাকে। ওকে কফি বানাতে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে পড়ার ঘরে গিয়ে খিল দেয়। বুঝতে আধ মিনিটও সময় লাগলো না যে সিন্দুক থেকে ফাইল উধাও, চল্লিশজন ওডেসা অপরাধীর নথি আছে যেটাতে। পাগলের মতো সিন্দুক হাঁটকায়। হতাশ হয়ে যখন সিন্দুকের কাছ থেকে ফিরে আসছে, টেলিফোন বেজে উঠলো। ক্লিনিক থেকে ডাক্তার জানালো যে রাতে ফ্রাউলিন ওয়েগেণ্ডেলের মৃত্যু ঘটেছে।

পাক্কা দু ঘণ্টা উইনজার চেয়ারে বসে রইলো। আগুনও জ্বালানো হয়নি। ফাটা কাঁচের পাল্লায় খবরের কাগজ সাঁটা হয়েছিলো, তার মধ্যে দিয়ে

বাইরের হিম ঠাণ্ডা এসে ঘরে ঢুকছে। কোন খেয়াল নেই তার, শুধু মনে হচ্ছে যেন কঠিন শীতল কটা আঙুল পাকিয়ে পাকিয়ে তাকে ধরছে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বারবার। তাকে ডাকছিলো প্রাতরাশ খেয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু কে কার কথা শোনে! চাবির ফুটোয় কান পেতে মেয়েটি শুধু শোনে তার মনিব বারবার শুধু আবৃত্তি করে চলেছে, 'আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই।'

মিলার ভুলে গিয়েছিলো। হাম্বুর্গে সিগিকে ফোন করবার আগে হোটেলে বলে দিয়েছিলো যেন ওকে নটায় ডেকে দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ নাকচ আর করা হয়নি। তাই ঠিক নটায় কর্কশ ধাতব স্বরে ফোন বেজে উঠলো। আধখোলা চোখে ফোন ধরে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো। জানতো যে না লাফালে আবার হয়তো ঘুমিয়ে পড়তো। সিগি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ধকল তো কম যায়নি। অতটা পথ গাড়ি করে এসেছে, তার ওপর প্রেমের কসরত, সর্বোপরি অ্যাদ্দিনে বাগদত্তা হতে পারবার জন্যে গর্ব এবং আনন্দ।

ধারাস্নান করলো মিলার। শেষের কয়েক মুহূর্ত হিমঠাণ্ডা জলের নীচে দাঁড়িয়ে চট করে সরে গিয়ে গরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ফেললো। সারা রাত তোয়ালেটাকে ও রেডিয়েটারের ওপর রেখে দিয়েছিলো। নিজেকে এখন অযুত ডলারের মতো দামী মনে হচ্ছে। রাতের চিন্তাভাবনা কোথায় দূর হয়ে গেছে। আত্মবিশ্বাসে এখন ভরে উঠেছে মন।

স্ল্যাক্স আর অ্যাঙ্কল-বুট পরে নিলো। গলাবন্ধ মোটা সোয়েটার পরে তার ওপরে একটা ডবল ব্রেস্টের নীল ডুফেল ওভারজ্যাকেট চড়িয়ে নিলো। এটি একটি বিশুদ্ধ জার্মান শীতবস্ত্র, নাম 'জপ্পে'। কোট আর জ্যাকেটের মাঝামাঝি। ছুদিকে ছুটো বেশ গভীর করে ত্যারচা পকেট। পিস্তল আর হাতকড়াটা তাদের মধ্যে বেশ ঢুকে যাবে। ভেতরের পকেটে ফটোটা রাখা যাবে। সিগির ব্যাগ থেকে হাতকড়াটা বের করে পরীক্ষা করে দেখলো। চাবি নেই কোন, আঁকশি ছুটো ঘুরিয়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে, তখন হয় পুলিসে এসে খুলবে, নইলে হ্যাক্‌শ দিয়ে কাটতে হবে।

পিস্তলটাকেও খুলে পরীক্ষা করলো। কোনদিনও গুলি ছোঁড়েনি, এখনো ভেতরে নির্মাতাদের লাগানো সেই গ্রীজটুকু রয়েছে। ম্যাগাজিনে গুলি ভরা আছে, সেরকমই ও রেখে দিতো। অভ্যাস করে নেওয়ার জন্যে ব্রিচটাকে কয়েকবার খুললো, বন্ধ করলো। তারপর সেফটিক্যাচের নিয়ন্ত্রণটাও ভালো করে দেখে নিলো। ম্যাগাজিন ভেতরে পুরে চেম্বারে একটা রাউণ্ড ঘুরিয়ে সেফটিক্যাচ 'অন' করে রাখলো। প্যান্টের পকেটে লুডউইগসবুর্গের উকিলটির টেলিফোন নম্বর লেখা চিরকুটটা রেখে দিলো।

বিছানার তলা থেকে ব্রিফকেসটাকে তুলে নিয়ে সাদা কাগজে একটা চিঠি লিখলো সিগির জন্যে। ঘুম থেকে উঠলে যাতে দেখতে পায়। লেখা ছিলো ঃ 'ডার্লিং, যে মানুষটার পিছু পিছু অ্যাদ্দর এসেছি তার সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছি। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখবার এবং পুলিসে যখন তাকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে, তখন সেখানে উপস্থিত থাকবার দরকার আছে আমার। দরকারটা সত্যিই গুরুতর, আজ বিকেল নাগাদ তোমাকে জানাতে পারবো। তবে যদি বিশেষ কারণ ঘটে, তুমি যা করবে তা হলো...'

সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্ভুল নির্দেশ। ম্যুনিখের যে নম্বরে টেলিফোন করতে হবে সেই নম্বর লিখে দিয়ে, ওদিককার লোককে কি বলতে হবে সেটাও লিখে রাখলো। চিঠিটার শেষে লিখলো ঃ 'কোন অবস্থাতেই আমার অনুসরণে পাহাড়ের ওপরে আসবে না। এলে আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে, অবস্থা যাই হোক। কাজেই আমি যদি দুপুরের মধ্যে না ফিরি বা তোমাকে এই ঘরে ততক্ষণে কোন টেলিফোন না করি, তুমি ওই নম্বরে টেলিফোন করবে, খবরটা জানাবে, হোটেল থেকে বিদায় নেবে, খামটাকে ফ্রাঙ্কফুর্টের যে কোন ডাকবাক্সে ফেলে দেবে, তারপর গাড়ি নিয়ে হাম্বুর্গে ফিরে চলে যাবে। ইতিমধ্যে আর কারো বাগদত্তা হয়ে পোড়ো না যেন। অঢেল ভালবাসা রইলো, পিটার।'

টেলিফোনের পাশে চিঠিটাকে খাড়া করে রেখে দিলো, ওডেসা ফাইল সুদ্ধু খামটাও। তিনটে পঞ্চাশ মার্কের নোটও রেখে এলো। সলোমন টউবেরের ডায়রিটাকে হাতে নিয়ে নীচে নেমে এলো। যেতে যেতে

পোর্টারকে বলে গেলো যে তার ঘরে সাড়ে এগারোটার সময় যেন আরেকবার ঘুম-ভাঙানোর রিং দেওয়া হয়।

সাড়ে নটায় হোটেলের বাইরে এলো। অবাক হয়ে দেখলো কি অজস্র তুষার পড়েছে রাতে। গাড়ির বুট থেকে কড়া বুরুশ বের করে ছাত, বনেট আর উইণ্ডস্ক্রিন থেকে তুষারের পুরু আস্তর ঝেড়ে ফেললো। পুরো চোক দিয়ে স্টার্ট দিলো জাগুয়ারের ইঞ্জিনে। কয়েক মিনিট সময় লাগলো ইঞ্জিন গরম হয়ে স্টার্ট উঠতে। গিয়ারে তুলে বড় রাস্তায় পড়লো। রাস্তাভর্তি বরফ—যেন তুষারের গদির ওপর দিয়ে গাড়ি চললো। চাকার তলায় নরম বরফ ভাঙার মুচমুচ শব্দ কানে আসতে থাকে। ম্যাপে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লিমবুর্গের দিকে রওনা দিলো।

সতের

সেদিন শিশু-প্রভাত ছিলো নেহাতই স্বল্পায়ু। আকাশ আবার মেঘে ঢেকে গেলো ; সকালের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেলো ধূসরতায়। মেঘের তলায় গাছের নীচে ঝকমক করছে তুষার, এলোমেলো হাওয়া বইছে পাহাড়ের ওপর থেকে।

শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠেছে। তারপরেই হারিয়ে গেছে বৃক্ষরাজির বিশাল সাগরে, রমবার্গ ফরেস্টে। গ্ল্যাস্হুট্টেনের শাখাপথ ধরলো মিলার। উচ্চশীর্ষ ফেল্ডবার্গ পর্বতের জানুদেশ বেয়ে চলে এলো স্মিট্টেন গাঁয়ের পথে। উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে পাইনের বন থেকে হা-হা করে ছুটে আসছে ঝোড়ো বাতাস।

বিশ মিনিট খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে মিলার আবার ম্যাপ খুলে বসলো। আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চায়, কোন ব্যক্তিগত এস্টেটের নির্দেশনামা দেখতে পায় কিনা। যখন পেলো, দেখলো দু পাল্লার একটা ফটক, লোহার আঁকড়া দিয়ে আটকানো ; একপাশে ফলক সাঁটা 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রবেশ নিষেধ'। ইঞ্জিন চালু রেখে, ঝুঁকে পড়ে হাত

বাড়িয়ে পাল্লা খুলে হাট করে ঠেলে দিলো ভেতর দিকে।

এস্টেটের মধ্যে ঢুকে গাড়িপথ ধরে এগিয়ে চললো। পথের তুষারে কোন রেখাপাত হয়নি। একেবারে নীচু গিয়ারে গাড়ি চালালো, কারণ বরফের নীচে আছে শুধু জমাট বালি। ছুশো গজ এগিয়ে গিয়ে দেখলো বিশাল ওক গাছের মস্তবড় একটা ডাল প্রায় আধ টন বরফের ভারে রাত্রে ভেঙে পড়েছে। ডান দিকের ঝোপঝাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সেটা, ছোটখাটো কিছু শাখাপ্রশাখা রাস্তাতেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। গাছের নীচে একটা কালো খাম্বা ছিলো, সেটা উপড়ে পড়ে আছে গাড়ি-পথের ওপর আড়াআড়িভাবে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওটাকে সরানোর চেষ্টা না করে, অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে খাম্বাটার ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেলো। সামনের চাকা ছুটো পেরিয়ে যাবার পর পেছনের চাকায় সামান্য বাম্প লাগলো।

বাধা পেরিয়ে সোজা বাড়ির দিকে চললো। ঝোপঝাড় এখন শেষ হয়ে গেছে, পরিষ্কার খানিক জায়গা। তার ওপাশে বাংলো বাড়ি; ছুপাশে বাগান, সামনে বৃত্তাকার কাঁকর-বিছানো পথ। সদর দরজার সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো। ঘণ্টা বাজিয়ে দিলো।

মিলার যখন তার গাড়ি থেকে নামছিলো, সেই সময় ক্লউস উইনজার শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলে ওয়েরউলফকে ফোন করলো। ওডেসার নেতাটির মেজাজ তখন তিরিক্ষে। এতক্ষণে তো খবর পাওয়া উচিত ছিলো যে অসনাব্রুখের দক্ষিণে জাতীয় সড়কের ওপর কোন একটি স্পোর্টস-গাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, খুব সম্ভবত পেট্রোলট্যাঙ্কে আগুন লাগার ফলে। অথচ সেরকম কোন খবরই এলো না, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ...টেলিফোনে ওধারের বার্তা শুনে ক্রমে ক্রমে তার মুখ দৃঢ় কঠিন হয়ে পড়লো।

"কি করছিলে তুমি? কি?...মূর্খ অপোগণ্ড কোথাকার?...তুমি—? কি অদ্ভুত! ফাইলটা যদি উদ্ধার না হয়, তোমার ভাগ্যে কি আছে জানো?..."

ওয়েরউলফ তার শেষ কথা কটি শুনিয়ে দিতেই অসনাব্রুখে ক্লউস উইনজার তার পড়ার ঘরে ফোনটি রেখে দিলো। উঠে গিয়ে টেবিলে বসলো। এখন বেশ শান্ত হয়ে আছে। জীবনে তার দুবার সর্বনাশ ঘটেছে, একবার যখন হ্রদের জলে তার অমূল্য কীর্তিগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলো, আর দ্বিতীয়বার আজকে। পুরনো অথচ একটা সক্রিয় লুগার তলার দেরাজ থেকে টেনে বার করলো। নলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোড়া টিপে দিলো। সীসের যে গুলিটা তার মাথাটাকে গুঁড়িয়ে দিলো সেটা কিন্তু নকল ছিলো না।

নীরব টেলিফোনটার দিকে ভয়ার্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওয়েরউলফ। ক্লউস উইনজারের হাত দিয়ে যেসব এস.এস. ফেরারীদের পাসপোর্ট বানিয়ে দিতে হয়েছে তাদের নামগুলো একে একে মনে পড়ে। সকলেই কোন না কোন অপরাধের জন্যে চিহ্নিত, গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও আছে সবায়ের নামেই, ধরা পড়লে নির্ঘাত তাদের বিচারে ঠেলবে। নথীটা প্রকাশ হয়ে পড়লে প্রচুর ধরপাকড় হবে; সাধারণ মানুষের মনে এস.এস.দের গ্রেপ্তার করা সম্বন্ধে এতদিনে যে অনীহা এসে জন্মেছে সেটা দূর হয়ে যাবে, লোকে আবার উদগ্র হয়ে উঠবে; অনুসন্ধান সমিতিগুলো আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তৎপর হয়ে উঠবে···দুর্ভোগের পরাকাষ্ঠা!

কিন্তু সবচেয়ে আগে তার কর্তব্য হলো রশম্যানকে বাঁচানো। জানে যে উইনজারের তালিকায় তার নাম আছে।···তিনবার ফ্রাঙ্কফুর্টের আঞ্চলিক নম্বর ঘুরিয়ে গোপন পাহাড়ী নিলয়ের নম্বরটা ঘোরালো, কিন্তু প্রতিবারেই সঙ্কেত পেলো নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে অপারেটরকে বলে নম্বর চাইতে সে জানালো যে লাইন নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে।

অসনাব্রুখের হোহেনজোলার্ন হোটেলে তখন ফোন করে ঠিক সময়মত ম্যাকেনসেনকে ধরলো। আরেকটু দেরি হলেই সে বেরিয়ে যেতো। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় খবরগুলো জানিয়ে দিয়ে রশম্যানের বাড়ির নির্দেশ দিয়ে দিলো। বললো, "তোমার বোমা কাজ করেনি মনে হচ্ছে। এখন প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ি চালিয়ে ওখানে যাও তো। গাড়িটাকে কোথাও

লুকিয়ে রেখে রশম্যানের কাছে কাছে থাকবে। ওখানে অস্কার নামে একজন দেহরক্ষীও আছে। মিলার যদি ফাইল নিয়ে সিধে পুলিসের কাছে যায় তো আমাদের বারোটা বেজে যাবে, কিছুই করার নেই। তবে সে যদি রশম্যানের কাছে আসে, জীবন্ত অবস্থায় তাকে ধরবে, জেনে নেবে কাগজগুলো নিয়ে সে কি করেছে। মরবার আগে খবরগুলো তার কাছ থেকে জেনে নেবেই যে করে হোক।"

ফোনবুথে টাঙানো রাস্তার ম্যাপের দিকে একঝলক দেখে নিয়ে ম্যাকেনসেন বললো, "একটা নাগাদ আমি পৌঁছে যাচ্ছি সেখানে।"

ঘণ্টাটা দুবারের বার বাজতেই দরজা খুলে গেলো। হল থেকে গরম হাওয়ার ঝলক এলো। লোকটা নিশ্চয়ই পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, কারণ মিলার দেখলো যে হলের ওধারে একটা দরজা খোলা, পড়ার ঘরে যাবার জন্যে।

একহারা চেহারার সেই এস.এস. অফিসারটি এখন বেশ মাংসল। বহু বছরের বহু আরাম মেদ জুগিয়েছে ভালোই। মুখটা টোপাটোপা, হয় মদের মাত্রার জন্যে, নইলে খোলা হাওয়ার প্রভাবে। দু পাশের চুলে পাক ধরেছে। দেখলেই মনে হয় মধ্যবয়স্ক, উচ্চমধ্যবিত্ত, স্বাস্থ্যবান এবং বেশ সৌভাগ্যশালী একজন ব্যক্তি। কিন্তু খুঁটিনাটির ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও টউবেরের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।…গম্ভীরমুখে মিলারকে নিরীক্ষণ করলো, কোন ভাবপ্রকাশ নেই। "বলুন?"

কথা বলতে প্রায় দশ সেকেণ্ড লেগে গেলো মিলারের। যেগুলো মহড়া দিয়ে রেখেছিলো, সেগুলোই মুখ দিয়ে হুট করে বেরিয়ে পড়লো।

"আমার নাম মিলার, আর আপনার এডুয়ার্ড রশম্যান।"

নাম দুটো শোনামাত্র লোকটার চোখে সামান্য ঝিলিক খেলে গেলো কিন্তু দুর্ধর্ষ সংযম তার। মুখের এতটুকু ভাববৈলক্ষণ হলো না।

চিবিয়ে চিবিয়ে বললো অবশেষে, "অদ্ভুত কথা বলছেন দেখছি। জীবনেও আমি ও নাম শুনিনি।"

এস.এস.অফিসারটির আপাত শান্ত মুখচ্ছবির পেছনে প্রচণ্ড বেগে তার

মন ধেয়ে চলেছিলো। ১৯৪৫-এর পর থেকে জীবনে বহুবার সঙ্কটের সামনা-সামনি হতে হয়েছে। বিপদে মাথা খেলে ভালোই। মিলারের নাম চিনতে পারলো, কয়েক সপ্তাহ আগে ওয়েরউলফের সঙ্গে তার এই বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিলো। প্রথমেই মনে হয়েছিলো মিলারের নাকের সামনে দরজা দিয়ে দেবে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি কোনমতে দমন করলো।

"বাড়িতে একা আছেন আপনি?" মিলার প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" সত্যি কথাই বলে রশম্যান।

"পড়ার ঘরে যাই চলুন," চাঁছাছোলা গলা মিলারের।

রশম্যান কোন আপত্তি করে না। কারণ সে জানে যে মিলারকে বাড়িতে রেখে এখন সময় কাটাতে হবে, যতক্ষণ না···

জুতোর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরে গেলো রশম্যান। গটগট করে এগিয়ে গেলো হলঘরের মেঝে দিয়ে। সামনের দরজাটা একটানে বন্ধ করে মিলারও চললো পিছু পিছু। প্রায় রশম্যানের গায়ে গায়েই পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। চমৎকার আরামপ্রদ ঘর। দরজায় পুরু করে প্যাড দেওয়া, মিলার ঘরে ঢুকেই সেটা বন্ধ করে দিলো। অগ্নিকুণ্ডে কাঠের গুঁড়ি ধিকিধিকি জ্বলছিলো।

ঘরের মাঝখানটায় এসে রশম্যান হঠাৎ থেমে গিয়ে মিলারের দিকে মুখ ফেরালো।

"আপনার স্ত্রী এখানে?" মিলার শুধায়। রশম্যান মাথা নাড়ে।

"সপ্তাহ-শেষের অবকাশে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছে।" কথাটা সত্যি। গতসন্ধ্যায় মুহূর্তের নোটিসে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় গাড়িখানা নিয়ে গেছে সে। প্রথম গাড়িটা আবার দুর্ভাগ্যক্রমে গ্যারেজে গেছে মেরামতের জন্যে। আজ সন্ধ্যায় স্ত্রীর ফিরে আসার.কথা।

রশম্যান অবশ্য জানালো না যে তার সঙ্গে থাকে ন্যাড়ামাথা বিশালদেহ এক শোফেয়ার দেহরক্ষী। সেই লোকটি, অস্কার যার নাম, আধ ঘণ্টা হলো সাইকেলে চেপে গাঁয়ে গিয়েছে টেলিফোন খারাপ হবার সংবাদটা দিয়ে আসবার জন্যে। মিলারকে এখন তাই কথাবার্তার মধ্যে ব্যস্ত রাখতেই

হবে যতক্ষণ না অস্কার ফেরে।

মিলারের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো সাংবাদিক যুবকটির হাতে পিস্তল ; সেটা সোজা তার পেটের দিকে উঁচিয়ে আছে। ভয় পেলো রশম্যান কিন্তু দাপট দেখিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

"আমারই বাড়িতে আমাকেই পিস্তল তুলে ভয় দেখাচ্ছো ?"

"তাহলে পুলিস ডাকো," তাচ্ছিল্যের সুরে মিলার বলে। হাত দিয়ে ডেস্কের টেলিফোনটা দেখিয়ে দেয়। রশম্যান কিন্তু সেদিকে গেলোই না।

"দেখছি তুমি এখনো সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটো," মিলার মন্তব্য করে, "অর্থোপেডিক জুতোতে ঢাকা পড়েছে বটে, তবে সবটা নয়। পায়ের আঙুলগুলো হারিয়ে গেলো, রিমিনি শিবিরের অপারেশনে। অস্ট্রিয়ার মাঠে মাঠে ঘুরেই ফ্রস্টবাইট হয়েছিলো,…নয় ?"

রশম্যানের চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে উঠলো কিন্তু কোন কথা বললো না।

"পুলিস যদি আসে তারা সহজেই তোমাকে সনাক্ত করে নেবে, হের ডিরেক্টর। একই রকম মুখ, বুকে বুলেটের ঘা, বাঁ বগলের নীচে ক্ষতচিহ্ন, কারণ তুমি সেখান থেকে নিশ্চয়ই ওয়াফেন এস.এস.এর ব্লাডগ্রুপের উল্কি তুলে ফেলতে চেষ্টা করেছিলে। ডাকবে নাকি পুলিস ?"

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রশম্যানের। "কি চাও তুমি মিলার ?"

"বোসো," রিপোর্টারটি বলে, "টেবিলে নয়, হাতলওলা চেয়ারটায় যাতে তোমাকে আমি চোখে চোখে রাখতে পারি। হাত দুটোকে হাতলের ওপর রাখো। গুলি করবার মতো কোন অজুহাত দিও না আমায়, কারণ, বিশ্বাস করো গুলি করতে আমার বড্ডো ভালো লাগবে।"

হাতলওলা চেয়ারে বসলো রশম্যান। পিস্তলের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। টেবিলের প্রান্তে বসে রইলো মিলার তার দিকে চেয়ে। বললো, "আলাপ শুরু করা যাক তাহলে।"

"কি নিয়ে ?"

"রিগা। আশি হাজার লোকের সম্বন্ধে—স্ত্রী পুরুষ শিশু—যাদের তুমি

সেখানে জবাই করেছিলে।"

মিলার বন্দুক ব্যবহার করতে যাচ্ছে না দেখে রশম্যান আবার স্বস্তি ফিরে পেলো। মুখে রঙ ফিরে এলো তার। মিলারের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে বললো, "মিথ্যে কথা। রিগাতে কখনোই আশি হাজারের সমস্যার সমাধান হয়নি।"

"সত্তর হাজার তাহলে? ষাট? সত্যিই কি মনে করো নাকি যে সঠিক কতজনকে হত্যা করেছো তাতে কিছু এসে যায়?"

"সেটাই তো কথা," রশম্যান বললো আন্তরিকভাবে, "কিছুই এসে যায় না তাতে, না তখন না এখন। দেখ হে, যুবক, আমি জানি না তুমি আমার পেছনে কেন এসেছো, তবে আন্দাজ করতে পারি। কেউ নিশ্চয়ই তোমার মাথায় ভাবালুতার প্রচুর বাষ্প ঠুসেছে, যুদ্ধ-অপরাধ আর ওই সমস্ত নিয়ে। ওগুলো সব বাজে কথা। স্রেফ বাজে কথা। কত বয়স তোমার?"

"উনত্রিশ।"

"তাহলে মিলিটারি সার্ভিসের জন্যে আর্মিতে ছিলে নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ। যুদ্ধোত্তর আর্মির প্রথম জাতীয় সেবকদলে ছিলাম। দু বছর ইউনিফর্ম পরে কাটিয়েছি।"

"তাহলে তো তুমি জানো আর্মি বস্তুটি কি। হুকুম যা দেওয়া হয়, তোমাকে সেটা পালন করতেই হবে। কোন প্রশ্নই নেই যে ভালো না মন্দ। আমিও হুকুম পালন করেছি মাত্র।"

"না," ধীরস্বরে মিলার বললো, "তুমি তো সৈনিক ছিলে না। তুমি ছিলে জল্লাদ। আরো সহজ করে বলতে গেলে কশাই, পাইকারিভাবে হত্যা করবার কশাই। কাজেই সৈন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা কোরো না।"

"বাজে কথা," রশম্যান আন্তরিককণ্ঠে আবার বললো, "একেবারেই বাজে কথা। আমরাও অন্যদের মতন সৈন্যই ছিলাম। তাদের মতো আমরাও হুকুম পালন করতাম। তোমরা তরুণ জার্মানেরা সব সমান। কেউ বুঝতেও চাও না যে তখন কি অবস্থা ছিলো।"

"বেশ, বলো শুনি, কি অবস্থা ছিলো?"

কথাগুলো বলতে বলতে রশম্যান চেয়ার থেকে খানিকটা ঝুঁকে এগিয়ে এসেছিলো। এখন আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। বেশ আয়েসী ভঙ্গী, বিপদের আশু সম্ভাবনা তো কেটে গেছে।

"কি অবস্থা ছিলো? জগৎকে শাসন করবার মতোমানসিকতা। আমরা জার্মানরা তো জগৎকে শাসন করেও ছিলাম। ওরা যত আর্মি পারে সব আমাদের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে কিন্তু সবাই আমাদের সামনে পর্যুদস্ত, ছত্রখান হয়ে গেছে। বহু বছর ধরে ওরা আমাদের দাবিয়ে রেখেছিলো, আমরা হতভাগ্য জার্মানরা। কিন্তু আমরা ওদের শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছিলাম,—ওদের সবাইকেই,—যে আমরা এক মহান জাত। তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বুঝতেও চাও না যে জার্মান হবার মধ্যে অহঙ্কার করবার কি আছে।

"অন্তরে একটা শিখা জ্বলে ওঠে। দামামার আওয়াজ, বাদ্যের বাজনা, পতপত করে তুলছে নিশান, একটিমাত্র লোকের পেছনে গোটা জাত এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আমরা মার্চ করে চলে যেতে পারতাম। এরই নাম হলো মহান জাতীয়তা, বুঝলে যুবক, যে জাতীয়তার উপলব্ধি তোমরা কখনো করোনি, কখনো করতে পারবেও না। আর আমরা এস.এস.এর লোকেরা ছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ, এখনো আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য এখন ওরা আমাদের ধাওয়া করে বেড়ায়, প্রথমে মিত্রশক্তিরা, তারপর বনের এই ছিঁচকাঁদুনে বুড়ীগুলো। ওরা আমাদের গুঁড়িয়ে দিতে চায়। তার কারণ ওরা জার্মানীর মহত্ত্বকে ধ্বংস করতে চায়, আর সেই মহত্ত্বে আমরা দীক্ষিত ছিলাম, এখনো আছি।

"কয়েকটা শিবিরে কি ঘটেছিলো না ঘটেছিলো তাই নিয়ে কি নাচানাচি ওদের, কত কথা, অথচ জগৎ যদি বুদ্ধিমান হতো তো কবে সেই সামান্য ঘটনাগুলো ভুলে যেতো। ইউরোপকে ইহুদী নোংরামি থেকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম বলে কি বিকট কান্না তাদের! অথচ এই ইহুদী নোংরামির পঙ্কিলতা জার্মানজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গিয়ে ঢুকেছিলো, তাদের সঙ্গে আমাদেরও কৃমি-কীট বানিয়ে রেখেছিলো। কাজেই মুক্তির জন্যে তাদের দু হাতে ধুয়ে সাফ করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। জার্মান জাত

রক্তে এবং আদর্শে খাঁটি। জগৎকে শাসন করা ছিলো তাদের মৌল অধিকার, আমাদের মৌল অধিকার। অতএব সেই জার্মান জাত এবং তাদের পিতৃভূমি জার্মানীকে আরো উন্নততর করে তোলার যে মহান প্রচেষ্টা, তাতে ইহুদী নিষ্কাশন তো ছিলো এক নেহাত ক্ষুদ্র পার্শ্বভূমিকা। মিলার, জগতে আমরা সত্যিই শ্রেষ্ঠ হতাম যদি না ওই নারকীয় ব্রিটিশ কীটগুলো এবং চিরমূর্খ আমেরিকানরা তাদের হাঁদা নাক না গলাতো। ভুলে যেও না, আমার বিরুদ্ধে যত ইতিহাসই ছুঁড়ে দাও না তুমি, তুমি এবং আমি একই দলের। একটা প্রজন্মের ফারাক থাকলেও তুমি এবং আমি দুজনেই জার্মান। এবং আমরা জার্মানরা হচ্ছি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাত। আমাদের একদা যে মহত্ত্ব ছিলো এবং কোন-না-কোন দিন যা আবার হবে, সেই সব গুণের বিশ্লেষণ করতে বসে কি কতগুলো হতচ্ছাড়া ইহুদীর ভাগ্যে কি ঘটেছিলো সেইটাই তোমার বিচারে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠবে ? বুঝতে পারছো না, বিপথচালিত মূর্খ, আমরা একই দিকে, তুমি এবং আমি, একই দলে আমরা, একই জাতি, একই ভাগ্য।"

পিস্তল তার দিকে উঁচিয়ে আছে জেনেও চেয়ার ছেড়ে উঠে রশম্যান টেবিল এবং জানলার মাঝামাঝি জায়গাটুকু পায়চারি করে বেড়ায়।

"আমাদের মহত্ত্বের নিদর্শন চাও তুমি ? তাকিয়ে দেখো আজ জার্মানীর দিকে। ১৯৪৫-এ আমরা রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, আমাদের কাঁধের ওপর তখন পুবদেশ থেকে কতগুলো বর্বর আর পশ্চিম থেকে কতগুলো আহাম্মক। আর আজ ? জার্মানী আবার উঠছে, ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবে। যতটুকু নিয়মানুবর্তিতা দেশের পক্ষে আবশ্যক তা দিতে না পারলেও, প্রতি বছর আমাদের শিল্প এবং আর্থিক ক্ষমতা আমরা বাড়িয়েই তুলছি। কোন সন্দেহ নেই তাতে। সামরিক ক্ষমতাও আমরা একদিন ফিরে পাবো যেদিন ১৯৪৫-এর মিত্রশক্তির প্রভাব আমরা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারবো। আবার আমরা তেমনিই শক্তিধর হবো। সময় লাগবে বটে, নতুন নেতারও প্রয়োজন হবে, তবে আদর্শ থাকবে সেই একই,—সেই চিরায়ত, এবং সেই দিব্যদ্যুতি···হ্যাঁ, আবার তা আসবে।

"আর জানো কি করে তা সম্ভব হবে ? আমি বলছি শোনো। নিয়ম-

নিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনা। কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, যত কঠোর তত ভালো। আর ব্যবস্থাপনা…উচ্চ সদ্‌গুণ আছে জার্মানচরিত্রে, সাহস তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম, ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয়। ব্যবস্থা করতে যে আমরা সুদক্ষ তার অগুনতি প্রমাণ আছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখো, কি দেখছো? এই বাড়ি, এই এস্টেট, রুহ্‌র অঞ্চলে এই কারখানা, খনি এবং অযুত-নিযুত এই ধরনের বৈভব, দিনের পর দিন তারা শক্তি এবং ক্ষমতা উদ্‌গিরণ করে চলেছে। চক্রের প্রতিটি ঘর্ষণে তিল-তিল শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে যা আবার জার্মানীকে ক্ষমতাবান করে তুলবে।"

"আর কারা এইসব করে তুলেছে তুমি ভাবো? হতচ্ছাড়া ইদগুলোর ওপর সহানুভূতি দেখিয়ে যারা বক্তৃতা মারছে তারা? যেসব কাপুরুষ দেশদ্রোহী সৎ দেশপ্রেমিক জার্মান সৈনিকদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে তারা? না, আমরা করেছি, আমরাই জার্মানীতে সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছি, সেই লোকগুলোই যারা বিশ-ত্রিশ বছর আগে দেশে ছিলো।"

জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে মিলারের দিকে চাইলো, চোখগুলো ধকধক করে জ্বলে ওঠে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে রাখা ভারি লোহার শিকটা কত দূরে আছে সে হিসাবও করে নিলো চোখ দিয়ে। মিলার তার চোখের সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখলো।

"আর এখন জার্মান যুবসমাজের প্রতিনিধি হয়ে তুমি কিনা এসেছো একটা বন্দুক বাগিয়ে আমার কাছে? তোমার নিজের দেশ জার্মানী, তোমার নিজের জাত জার্মান জাত, তাদের সম্বন্ধে কোন আদর্শ নেই তোমার, কোন কর্তব্য না? তুমি হয়তো ভাবছো যে আমাকে ধরতে এসে তুমি লোকের ইচ্ছাপূরণ করছো? সত্যিই কি তাই, জার্মানীর লোক কি তাই চায়?"

মিলার মাথা নাড়ে। "আমি তা ভাবি না।"

"তবে? পুলিস ডেকে যদি আমাকে ধরিয়েও দাও তারা হয়তো একটা বিচারের অনুষ্ঠান করবে। 'হয়তো' বলছি এই কারণে যে সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। করলেও এতদিন পরে বিচার, সাক্ষীসাবুদ কোথায় চলে গেছে, মরেও গেছে অনেকে। অতএব লক্ষ্মীছেলের মতো পিস্তলটা নামিয়ে রেখে বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে সত্য ইতিহাস পড়ো সেইসব দিনের। দেখবে

জার্মানীর তৎকালীন মহত্ত্ব এবং আজকের সচ্ছলতার কারণ—আমার মতো দেশহিতৈষী জার্মানেরা।"

মিলার চুপচাপ বসে বসে এই প্রচণ্ড বক্তৃতা শুনেছিলো। লোকটার ওপর বিতৃষ্ণা ক্রমে বেড়ে উঠেছে, হতভম্ব হয়ে গেছে যে তাকে সেই পুরনো আদর্শবাদের পাঠ দিচ্ছে! উত্তরে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলো; পরিচিত সাধারণ জার্মান মানুষদের কথা, যাদের চেনে না অথচ যাদের বোঝে তেমনি আরো অগণন জনগণের কথা যারা কখনোই লক্ষ-কোটি মানুষকে হত্যা করে মহান হবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোঝে না বা চায়ও না। কিন্তু কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। দরকারের সময় সেগুলো আসেও না সাধারণত। তাই সে শুধু চুপচাপ বসে বসে শুনে গিয়েছিলো।

রশম্যানের কথা শেষ হবার পর কয়েক মিনিট স্তব্ধতা কাটিয়ে মিলার বললো, "টউবের নামে কাউকে চেনো?"

"কে?"

"সলোমন টউবের। সেও জার্মান ছিলো, তবে ইহুদী। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লোকটা রিগাতে ছিলো।"

কাঁধ ঝাঁকালো রশম্যান। "মনে পড়ছে না, কতদিনের কথা। কে সে?"

"বসে পড়ো," মিলার বললো, "আর এবার থেকে বসেই থাকবে. নড়াচড়া নয়।"

অধীরভাবে কাঁধ দুলিয়ে চেয়ারে এসে বসলো রশম্যান। মিলার যে গুলি করবে না সে বিষয়ে এখন সে নিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তার সমস্যা এখন শুধু কি করে মিলারকে ফাঁদে ফেলা যায়। কোন অখ্যাত ইহুদীর বৃত্তান্ত নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না সে।

"গত বছর ২২শে নভেম্বর তারিখে হাম্বুর্গে টউবের মারা গেছে। গ্যাসে আত্মহত্যা করেছিলো সে। শুনছো কি, কি বলছি?"

"হ্যাঁ, শুনতে যখন হবেই।"

"ও একটা ডায়রি রেখে গেছে। তাতে লেখা আছে তার নিজের কাহিনী; তুমি এবং অন্যেরা কি কি করেছিলে তাদের ওপর, রিগাতে এবং অন্যান্য জায়গায়।' মুখ্যত রিগাতে। তবে জীবিত অবস্থায় আসতে পেরে-

ছিলো সে। হাম্বুর্গে ফিরে আঠারো বছর সেখানে বাস করেছিলো। মরলো তার কারণ সে স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলো যে তুমি বেঁচে আছো আর তোমার কোনদিন বিচার হবে না। সেই ডায়রি আমার হাতে এসেছিলো এবং সেই থেকেই তোমার অন্বেষণ শুরু করেছিলাম। আর আজকে আমি তোমার নতুন নামে তোমাকে পেয়েছি।"

"মৃত ব্যক্তির ডায়রির কোন সাক্ষ্যমুল্য নেই," রশম্যান গর্জে ওঠে।

"কোর্টে না থাকলেও আমার কাছে আছে।"

"সত্যিই কি তুমি এসেছো একটা মৃত ইহুদীর ডায়রি নিয়ে আমার সঙ্গে বিরোধিতা করতে?"

"না, তা নয়। একটা পৃষ্ঠা আছে সেই ডায়রিতে, আমি চাই তুমি সেটা পড়ো।"

ডায়রির একটা পৃষ্ঠা খুলে ছুঁড়ে দিলো রশম্যানের কোলে।

"তুলে নাও," গম্ভীর আদেশ দিলো মিলার, "পড়ো—জোরে জোরে।"

রশম্যান পৃষ্ঠাটি খুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। এটা ডায়রির সেই অংশ যেখানে টউবের বর্ণনা দিয়েছে কি করে রশম্যান একজন অজ্ঞাতনামা জার্মান আর্মি অফিসারকে হত্যা করেছিলো; অফিসারটির বুকে শোভা পাচ্ছিলো ওক্‌পাতার গুচ্ছসমেত নাইট্'স্ ক্রশ।

পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত পড়ে রশম্যান চোখ তুলে তাকালো। বুঝতে পারে না যেন কি ব্যাপার, হতবুদ্ধি ভাব। জিজ্ঞাসা করে, "তাতে কি? লোকটা আমাকে মেরেছিলো। আদেশ লঙ্ঘন করেছিলো সে। ওই জাহাজ চালনা করবার অধিকার আমার ওপর ছিলো, বন্দীদের নিয়ে আসবার জন্যে।"

একটা ফটো রশম্যানের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো মিলার। "এই লোকটাকে হত্যা করেছিলে?"

ফটোটা দেখে নিয়ে রশম্যান কাঁধ ঝাঁকায়।

"কি করে বলবো? কুড়ি বছর আগের কথা।"

মিলারের মুখে ধীরে ধীরে সঙ্কল্পের দৃঢ় আভাস ফুটে উঠলো। পিস্তলের

হ্যামার পেছনদিকে ঠেলে দিয়ে নলটাকে রশম্যানের মুখের ওপর উঁচিয়ে ধরলো।

"এই লোকটাই কি ?"

আবার ফটোটাকে চেয়ে দেখলো রশম্যান। "বেশ, এই না হয় সেই লোক। তাতে কি হয়েছে ?"

"উনি আমার বাবা," মিলার বললো।

রশম্যানের মুখ থেকে সব রঙ মুছে গেলো। মুখটা ঝুলে পড়লো। চোখের সামনে শুধু দু ফিট দূরে একটা উদ্যত পিস্তলের নল আর তার পেছনে একটা দৃঢ় হাত।

"হায় ভগবান," অস্ফুট স্বরে বললো, "ইহুদীদের জন্যে তাহলে তুমি আসোনি।"

"না, তাদের জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু অতটা দুঃখিত নই।"

"কিন্তু তুমি কি করে জানতে পারলে ? ওই ডায়রি থেকে কি করে জানলে যে ওই লোকটাই তোমার বাবা ? আমি কোনদিন তার নাম জানতে পারিনি, যে ইহুদীটা এই ডায়রি লিখেছে সেও জানতো না, তুমি কি করে জানলে ?"

"আমার বাবা ১৯৪৪-এর ১১ই অক্টোবর অস্টল্যাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন," মিলার বললো, "দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে শুধু এইটুকুই আমি জানতাম। তারপর আমি ডায়রিটা পড়ি। সেই একই জায়গা, একই তারিখ, দুজনের একই র‍্যাঙ্ক। তাছাড়া দুজনের বুকেই রয়েছে ওক্‌পাতার গুচ্ছওলা নাইট্'স্ ক্রশ, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্যে সর্বোচ্চ পদক। তেমন কিছু বেশী লোককে তো এই পদক দেওয়া হয়নি, আর্মি ক্যাপ্টেনদের মধ্যে তো সামান্যই। কাজেই একই দিনে একই অঞ্চলে দুজন এরকম লোকের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা লাখে একটা।"

রশম্যান বুঝলো তর্ক করে লাভ নেই। তাকিয়েই রইলো পিস্তলের দিকে, তাকিয়েই রইলো, যেন সম্মোহিত।

"তুমি আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছো। কোরো না, ঠাণ্ডা মাথায় এরকম হত্যা তুমি কোরো না।...প্লিজ, মিলার, আমি মরতে চাই না।"

মিলার সামনে ঝুঁকে পড়ে বলতে শুরু করলো :

"শোন্, দুর্গন্ধওলা কুত্তার বিষ্ঠা কাঁহিকা ! তোর বক্তৃতা শুনে আমার গা গুলোচ্ছিলো। এখন তুই শোন্ যতক্ষণে না আমি মনস্থির করি যে তুই এখানে মরবি না জীবনের বাকি দিনগুলো জেলে পচবি। শোন্···সাহস করে তো খুব বলছিলি যে তোরা সব স্বদেশহিতৈষী জার্মান ! বাগাড়ম্বরের অভাব নেই তোদের। আমি বলছি তোরা কি। ড্রেনের পোকা তোরা, নালী থেকে উঠে দেশের ক্ষমতার আসনে বসেছিলি। বারো বছর ধরে তোদের নোংরামি এমন করে দেশের মুখে মাখিয়েছিস যা ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

"তোরা যা করেছিলি তাতে সভ্যজগৎ শিউরে উঠেছিলো, আর আমাদের দিয়ে গেছিস সেই জঘন্য অপরাধের লজ্জাভার, সারা জীবন আমাদের তা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। জীবনভর তোরা জার্মানীর ওপর থুথু ছিটিয়েছিস। তোদের মতো বেজন্মারা জার্মানী আর জার্মান জনগণকে শুষে শুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে যতদিন রস ছিলো। তারপর যখন আর শোষা গেলো না, দিন থাকতে থাকতে কেটে পড়লি। এত নীচে আমাদের নিয়ে এসেছিলি যে বিশ্বাস করা যায় না। সাহস কোথায় ছিলো তোদের ? তোদের মতো কাপুরুষ জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ায় আর কখনো জন্মায়নি। নিজেদের লাভের জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনা বাধায় খুন করেছিস শক্তির লালসায়। আর তারপর পালিয়ে গেলি, বাদবাকি আমরা শুয়ে পড়ে খাবি খাই। রাশিয়ানদের কাছ থেকে পালিয়ে এলি ল্যাজ গুটিয়ে ; আর্মির লোকদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিস, গুলি করেছিস যাতে তারা যুদ্ধ চালিয়েই যায় আর তোরা পালাতে পারিস। আর তারপর ফিরিয়ে নেবার দায়িত্ব আমার।

"ইহুদী এবং অন্যদের ওপর যা করেছিলি তা যদি বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যায়ও, তবু কেউ ভুলবে না কি করে তোরা কুকুরের মতো পালিয়ে গিয়ে গর্তে সিঁধিয়েছিলি। দেশপ্রেমের কথা বলছিলি না, মানে জানিস তার ? আর আর্মির সৈন্যদের বা অন্য যারা সত্যিসত্যিই জার্মানীর হয়ে যুদ্ধ করেছিলো তাদের কামেরাড বলে ডাকছিস, আস্পর্ধা তোদের কম নয়।

"আরেকটা কথা আমি বলে দিচ্ছি জার্মান যুবসমাজের হয়ে, যাদের তোরা অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিস। আমাদের আজ যে সচ্ছলতা এসেছে দেশে তাতে তোদের কোন হাত নেই। যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক দিনভর খাটনি খাটে, জীবনে যারা কাউকে কোনদিন হত্যা করেনি, তাদেরই পরিশ্রমের ফসল এটা। কিন্তু তোদের মতো খুনে বদমাশ যারা এখনো সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে যদি সচ্ছলতার কমতি হয়ে যায় কোথাও একটু, পরোয়া নেই, তোদের আমরা উচ্ছেদ করবোই। …এবং প্রসঙ্গত তোমার অস্তিত্বও আর বেশীক্ষণ নেই।"

"আমাকে মেরে ফেলবে ?" বিড়বিড় করে ওঠে রশম্যান।

"না।"

পেছনদিকে গিয়ে টেলিফোন টেনে আনে। দৃষ্টি এবং পিস্তল দুটোই রশম্যানের ওপর। ডায়াল ঘুরিয়ে বলে, "লুডউইগসবুর্গে জনৈক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" রিসিভার কানে তুলে নেয়। নীরব সেটা।

আবার ক্র্যাডলে রেখে তুলে কানে লাগায়। কোন ডায়াল-টোন নেই।

"তার কেটে দিয়েছো ?"

রশম্যান মাথা নাড়ে।

"যদি কানেকশন কেটে দিয়ে থাকো তো এখানেই আমি তোমাকে খুঁচিয়ে মারবো।"

"না, কাটিনি, সকাল থেকে ফোন ছুঁইইনি, বিশ্বাস করো।"

ওক্‌গাছের ভূপতিত শাখাটি আর মাটিতে পড়ে-থাকা টেলিগ্রাফ খাম্বার কথা মনে পড়লো মিলারের। মৃদুস্বরে খিস্তি করে ওঠে। ঈষৎ হাসলো রশম্যান। "লাইন নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে। গ্রামে যেতে হবে তোমাকে। তাহলে কি করতে যাচ্ছো এখন ?"

"একটা বুলেট বিঁধিয়ে দিতে যাচ্ছি তোমার শরীরে যদি না আমার কথা শোনো।" গর্জে উঠলো মিলার। পকেট থেকে হাতকড়াটা বের করে; আগে ভেবে রেখেছিলো ওটা দিয়ে দেহরক্ষীর বন্দোবস্ত করবে।

ছুঁড়ে দিলো সেটা রশম্যানের দিকে।

"অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাও।"

ঠিক ওর পেছনে পেছনে অনুসরণ করে মিলারও এলো।

"কি করতে যাচ্ছো?"

"অগ্নিকুণ্ডের সঙ্গে তোমাকে বেঁধে গ্রামে গিয়ে ফোন করবো।"

অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে পেটা লোহার বাঁকানো বাঁকানো কারুকাজ দেখতে থাকে মিলার। ঠিক তক্ষুনি হাতকড়াটাকে পায়ের কাছে ফেলে দেয় রশম্যান। এস.এস.পুঙ্গব সেটা তুলে নেবার জন্যে নীচু হলো, হয়েই চট করে লোহার একটা শলাকা তুলে মিলারের হাঁটু লক্ষ্য করে মারলো ছুঁড়ে। মিলার ঠিক সময়মত সরে গেলো। শলাকাটি সাঁৎ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, রশম্যানও টাল রাখতে গিয়ে একপাশে ঝুঁকে পড়লো। দু পা সামনে এসে মিলার সঙ্গে সঙ্গে রশম্যানের নুয়ে-পড়া মাথায় ধাঁ করে পিস্তলের কুঁদো দিয়ে মারলো এক ঘা। পিছিয়ে গিয়ে বললো, "আরেকবার চেষ্টা করে দেখো, সোজা গুলি করবো।"

খাড়া হয়ে দাঁড়ালো রশম্যান। মাথার আঘাতের চোটটা সামলাতে চোখ মুখ কুঁচকে ওঠে তার।

"ডান কবজিতে একটা কড়া আটকে নাও," মিলার হুকুম ঝাড়ে। রশম্যান ঠিক তা পালন করে। "তোমার সামনে ওই যে লোহার আঙুরলতা, দেখতে পাচ্ছো? মাথা-সমান উঁচুতে। ওখানে একটা মোটা শাখা এসে লোহার পাতে আটকেছে, ওর সঙ্গে দ্বিতীয় কড়াটা লাগিয়ে দাও।"

টক করে দ্বিতীয় আঁকশি লেগে গেলো। কাছে গিয়ে মিলার তখন আগুন খোঁচাবার আঁকড়া, শলাকা সমস্ত লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয় যাতে রশম্যান সেগুলো হাতে না পায়। রশম্যানের জ্যাকেটের ওপর বন্দুকটা ধরে তার দেহ তল্লাশি করলো। আশপাশ থেকে ছোটখাটো জিনিসগুলোও সরিয়ে ফেললো যাতে ছুঁড়েটুঁড়ে জানলা না ভাঙে রশম্যান।

গাড়িপথ বেয়ে ঠিক তক্ষুনি অস্কার নামে একটি লোক সাইকেলে জোরে জোরে প্যাডেল করতে করতে আসছিলো। ফোনের লাইন অকেজো হয়ে যাবার সংবাদ দিয়ে এসেছে সে। জাগুয়ারটাকে দেখে পলকের জন্যে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। কারো তো আসবার কথা ছিলো না।

বাড়ির দেওয়ালের গায়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলো। হলঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পড়ার ঘরের আস্তর দেওয়া দরজা ভেদ করে কোন শব্দই আসে না। ভেতরের লোকেরাও তার অস্তিত্ব টের পায় না।

মিলার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। বেশ তৃপ্ত সে এখন। রশম্যান অক্ষম ক্রোধে ফুঁসছে। তার দিকে তাকিয়ে বললো, "প্রসঙ্গত একটা সংবাদ তোমাকে জানিয়ে রাখি। আমাকে যদি তখন কোনক্রমে আহত করতেও তাহলেও কোন লাভ ছিলো না তোমার। এখন এগারোটা বাজে; বারোটার মধ্যে আমি যদি কোন একটা জায়গায় না ফিরি বা টেলিফোন না করি তবে আমার দোসরকে বলে এসেছি, তোমার সম্বন্ধে পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ নথীটা ডাকবাক্সে ফেলে দেবে। কর্তৃপক্ষের ঠিকানাও লিখে রেখে এসেছি খামের ওপর। আমি এখন গ্রামে যাচ্ছি ফোন করতে, বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো। তুমি কোনমতেই বিশ মিনিটে ছাড়া পেতে পারো না, হ্যাক্‌শ দিয়ে ঘষলেও না। আমি ফিরে আসবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস চলে আসবে।"

মিলার যতক্ষণ কথা বলে যায়, রশম্যানের মনে আশার আলো দপদপিয়ে ওঠে, যেন নেভার আগে প্রদীপের অন্তিম প্রচেষ্টা। জানতো একটি মাত্রই সুযোগ আছে অস্কার যদি ফিরে এসে মিলারকে জ্যান্ত অবস্থায় বন্দী করতে পারে, তাহলে গ্রামের কোথা থেকেও জোর করে ওকে দিয়ে টেলিফোন করানো যাবে, দলিলগুলো তাহলে ডাকবাক্সে যাবে না আর। মাথার ওদিকে ম্যান্টেলপিসের ঘড়িতে চোখ রাখলো। দশটা বেজে এখন চল্লিশ।

ঘরের অন্যপাশে গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তেই দেখে চোখের সামনে গোল-গলা সোয়েটার গায়ে ওর চেয়েও লম্বা একজন মানুষ। অগ্নিকুণ্ডের ধার থেকে রশম্যান মুহূর্তে অস্কারকে চিনতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, "ধরো ওকে।"

ঘরের মধ্যে দু পা পিছিয়ে এসে মিলার বন্দুকটাকে তাগ করতে যায়। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেলো। অস্কারের একটা বাঁ-হাতি মার ততক্ষণে

পেছন থেকে সবেগে এসে ওর হাত থেকে পিস্তলটাকে ছিটকিয়ে মেঝের ওধারে ফেলে দিয়েছে। অস্কার শুনেছিলো যে ওর মনিব চিৎকার করে বলছে, 'মারো ওকে!' তাই একই সঙ্গে ওর ডান হাতের প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে মিলারের চোয়ালে লাগলো। একশো সত্তর পাউণ্ড ওজন সত্ত্বেও রিপোর্টারটি সেই ঘুষিতে ভারসাম্য হারিয়ে অনেকটা পেছনে গিয়ে ধরাশায়ী হলো। পড়তে পড়তে পা হুটো নীচুমতন একটা কাগজ রাখবার তাকে আটকে যেতেই মাথাটা গিয়ে কাঠের আলমারির একটা কোণে ধাক্কা খেলো। ন্যাকড়ার পুতুলের মতো গড়িয়ে পড়লো সে মেঝের কার্পেটের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। চোখ চেয়ে চেয়ে দুজনে শুধু দেখে। অস্কার দেখলো যে তার মনিব অগ্নিকুণ্ডের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা আর রশম্যান দেখলো মিলারের অনড় দেহ পড়ে আছে কার্পেটের ওপর, মাথার পেছন থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই রশম্যান চেঁচায়, "এই উজবুক!"

অস্কার হতভম্ব। আবার শুনলো মনিব চেঁচাচ্ছে, "এদিকে আয়।"

বিশাল দানবটা হেলতে দুলতে এসে ঘরের এপাশে দাঁড়ালো। রশম্যান খুব তাড়াতাড়ি ভেবে নিয়ে বলে, "আমাকে এই হাতকড়া থেকে খুলে দেবার চেষ্টা কর্। আগুনের লোহাগুলো কাজে লাগা।"

কিন্তু অগ্নিকুণ্ডটা সেই যুগের তৈরি যখন কারিগরেরা জিনিস বানাতো টিঁকবে বলে। অস্কারের চেষ্টার ফলে শুধু একটা লোহার শলা তেবড়ে গেলো আর বড় সাঁড়াশিজোড়া গেলো বেঁকে।

ব্যাপার দেখে রশম্যান বললো, "ওকে নিয়ে আয় তো এখানে।" অস্কার মিলারের দেহটাকে তুলে ধরতে রশম্যান তার চোখের পাতা টেনে নাড়ি দেখে বললো, "এখনো জ্ঞান আছে, তবে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। ডাক্তার যদি দেখানো যায় তাহলে অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খানিকটা সেরে উঠবে। একটা পেনসিল আর কাগজ নিয়ে আয় তো।"

বাঁ হাত দিয়ে কাগজটায় হুটো ফোন নম্বর লিখলো। সিঁড়ির তলা থেকে অস্কার একটা হ্যাকৃশ নিয়ে এসে রশম্যানকে দিয়েছে। রশম্যান

তার হাতে কাগজটা দিয়ে বললো, "যত তাড়াতাড়ি পারিস গাঁয়ে যা। হ্যুরেমবার্গের এই নম্বরে টেলিফোন করে যা যা ঘটেছে সব বলবি। আর স্থানীয় এই নম্বরটায় টেলিফোন করে ডাক্তারকে বলবি এক্ষুনি আসতে। বুঝলি ? বলবি এমার্জেন্সি। যা এখন, তাড়াতাড়ি যাবি।"

অস্কার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। রশম্যান ঘড়ি দেখলো—দশটা পঞ্চাশ। যদি এগারোটার মধ্যে অস্কার গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে পারে, ডাক্তারকে নিয়ে আসতে আসতে আন্তত সোয়া এগারোটা বাজবে, তাহলেও মিলারকে ঠিক সময়মতো হয়তো জাগিয়ে তোলা যাবে যাতে তাকে দিয়ে ফোন করিয়ে সহযোগীকে বারণ করা যায়। অবশ্য বন্দুক উঁচিয়েই ডাক্তারকে দিয়ে কাজ নিতে হবে। সময় একেবারেই টায়েটুয়ে। খুব দ্রুতহাতে রশম্যান হ্যাক্‌শ চালাতে থাকলো তার হাতকড়ির ওপর।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে অস্কার তার সাইকেলটাকে একঝটকায় তুলে নিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো। জাগুয়ার গাড়ি আছে দাঁড়িয়ে। জানলা দিয়ে দেখে ইগনিশনে চাবি ঝুলছে। মনিব বলেছে তাড়াতাড়ি করতে। অতএব সাইকেল ছেড়ে সে গাড়িতে গিয়ে বসলো। নিমেষে স্টার্ট তুলে কাঁকরের ওপর দিয়ে মস্ত বৃত্ত এঁকে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে স্পোর্টস কারটাকে সাঁ করে নিয়ে চললো। থার্ড গীয়ারে তুলে যত বেগে সম্ভব পিছল রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালালো। চোখের পলকে রাস্তায় পড়ে থাকা টেলিগ্রাফ থামটার সঙ্গে গাড়ির লাগলো ধাক্কা।

হাতকড়ার শিকলটুকুতে করাত ঘষছিলো রশম্যান, হঠাৎ শুনতে পেলো, বিস্ফোরণের ভীষণ আওয়াজ উঠলো পাইনবনে। একটা দিকে হেলে ঘাড় উঁচু করে গবাক্ষের ভেতর দিয়ে দেখলো যে বনের ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া উঠে আকাশে ছড়াচ্ছে। গাড়িপথ বা গাড়িটা তার দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও বুঝতে দেরি হলো না যে গাড়িটা গেছে। মনে পড়লো, তাকে জানানো হয়েছিলো যে মিলারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অথচ মিলার এখানে মেঝের ওপরে পড়ে,…তার দেহরক্ষী নিশ্চয়ই মারা গেছে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, আশার কোন আলো নেই। অগ্নিকুণ্ডের ঠাণ্ডা লৌহময় কারুকাজে মাথাটাকে চেপে ধরে দু চোখ বন্ধ করলো।

কয়েকবার নিঃশব্দে শুধু আওড়ালো, "তাহলে এই শেষ!" কয়েক মিনিট পরে আবার করাত চালাতে আরম্ভ করলো।···সৈন্যবাহিনীর জন্যে প্রস্তুত বিশেষ ধরনের ইস্পাত দু টুকরো হয়ে আলগা হয়ে পড়তে এক ঘন্টারও কিছু বেশি সময় লাগলো। হ্যাক্‌শয়ের দাঁতগুলো এখন একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেছে। মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলো, ডান কবজিতে শুধু একটা কড়া আটকানো। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো।

হাতে সময় থাকলে নিশ্চয়ই মেঝেয় পড়ে থাকা দেহটাকে সজোরে লাথি কষিয়ে যেতো, কিন্তু সময় একেবারেই ছিলো না। দেওয়াল-সিন্দুক থেকে পাসপোর্ট আর মোটা কয়েক তাড়া উচ্চমূল্যের নোট নিয়ে হাত-ব্যাগে কিছু কাপড়চোপড় ভরে সাইকেলে রওনা দিলো। কুড়ি মিনিট পরে জাগুয়ারের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলো যে মৃত-দেহটি তুষারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে তখনো। দু পাশে কিছু পাইন গাছ জ্বলে গেছে, ডালও ভেঙে পড়েছে।

গ্রামে পৌঁছে ট্যাক্সি নিলো; গন্তব্য ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফ্লাইট ইনফরমেসন্‌সের জানলায় এসে শুধায়ঃ

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর্জেন্টিনা যাবার ফ্লাইট আছে? না থাকলে···"

আঠারো

ম্যাকেনসেনের মার্সিডিজ যখন এস্টেটের চৌহদ্দির ভেতরে এসে ঢুকলো তখন একটা বেজে দশ মিনিট। বাড়িটার উদ্দেশে যেতে গিয়ে অর্ধেক রাস্তায় এসে দেখলো পথ বন্ধ। জাগুয়ারখানার চাকাগুলো তখনো কাত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, যদিও গাড়িটা একেবারে টুকরো টুকরো। সামনের আর পেছনের চেহারা দেখলে বস্তুটা যে একটা গাড়ি ছিলো তা বোঝা যায়, চ্যাসিসের ইস্পাতদৃঢ় গার্ডারগুলো তখনো প্রান্ত দুটোকে একসঙ্গে আটকে রেখেছে। কিন্তু মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত মাঝের পুরো অংশ নিখোঁজ। সারা জায়গাটা জুড়ে সেগুলো হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে।

গাড়িটার দুর্দশা দেখে ম্যাকেনসেনের মুখে কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কুড়ি ফিট দূরে মাটির ওপরে পোড়া জামাকাপড়ের একটা স্তূপ পড়েছিলো। সেইদিকে এগিয়ে গেলো ম্যাকেনসেন। লাশটার আকার দেখে ওর কেমন সন্দেহ হলো। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলো। তারপরেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটে চললো বাড়িটার দিকে। মার্সিডিজ ওখানেই রইলো পড়ে।

সদর দরজায় ঘন্টি না বাজিয়ে হাতল ধরে দিলো টান। সহজেই খুলে গেলো সেটা। হলঘরের মাঝে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত শুধুই নাক টেনে ঘ্রাণ নেয়; যেন ও একটা শ্বাপদজন্তু জলাশয়ে জল খেতে এসে বিপদের গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। কোন শব্দ নেই কোথাও। বাঁ বগলের নীচ থেকে লম্বা নলের লুগার পিস্তলটাকে বের করে নিয়ে তার সেফটিক্যাচ খুলে, হল থেকে অন্দরে যাবার দরজাটা খুললো।

প্রথম ঘরটা খাবার, তার পরেরটা পড়ার। আধখোলা দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়লো যে মেঝের ওপরে একটা মনুষ্যদেহ। নড়লো না কিন্তু সেইদিকে। জানে এই এক ধরনের কৌশল; টোপ সেজে একজন পড়ে থাকে আর দ্বিতীয়জন লুকিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করে। দরজার জোড়ের ফাঁক দিয়ে ভালো করে ম্যাকেনসেন লক্ষ্য করে দেখলো কেউ নেই। ঢুকলো ভেতরে।

মিলার চিৎ হয়ে পড়ে ছিলো। মাথাটা একদিকে হেলে আছে। কয়েক মুহূর্ত তার ফ্যাকাশে সাদা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে ম্যাকেনসেন। তার পর ঝুঁকে পড়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ নেবার চেষ্টা করে। অনিয়মিত ক্ষীণ নিঃশ্বাস। মাথার পেছনে জমে থাকা চাপ-চাপ রক্ত, কার্পেটে রক্তের দাগ,—ম্যাকেনসেন আন্দাজ করে নেয় ব্যাপারটা কি ঘটেছিলো।

দশ মিনিট ধরে বাড়িটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজলো সে। দেখলো যে শোবার ঘরের ড্রয়ারগুলো খোলা, স্নানঘর থেকে দাড়ি কামাবার সরঞ্জামও উধাও। পড়ার ঘরে ফিরে এসে দেখে যে দেওয়াল-সিন্দুকের গহ্বরটা শূন্য··· টেবিলে বসে ফোন তুলে নিলো। কয়েক মুহূর্ত ধরে সেটা কানে চেপে রেখে রাগে খিস্তি করে উঠলো। সিঁড়ির নীচ থেকে যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুঁজে নিতে কোন অসুবিধাই হলো না। যা যা দরকার সেগুলো নিয়ে মিলারের

ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে খোলা জানলা টপকে নীচে নেমে গেলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো তার টেলিফোনের তারের ছেঁড়া প্রান্ত ছটোকে আবিষ্কার করতে। ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে সেগুলোকে টেনে বার করে জোড়া লাগালো। নিজের হাতের কাজটুকু পরখ করে নিয়ে যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন আবার গাড়িপথ ধরে হেঁটে হেঁটে বাড়িটাতে ফিরে এলো। ডেস্কে এসে টেলিফোন তুললো। ডায়ালটোন পেলো এবারে। হ্যুরেমবার্গের নম্বর ঘোরালো তখন।

ভেবেছিলো ওয়েরউলফ বোধহয় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু ফোনের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো যেন বিশেষ কোন আগ্রহই নেই তার। জঙ্গী সার্জেণ্টের কায়দায় যা যা দেখেছে সব জানিয়ে দিলো—ধসে-যাওয়া গাড়ি, দেহরক্ষীর লাশ, কার্পেটে পড়ে থাকা ভোঁতা হ্যাক্‌শ, মেঝেতে অচেতন মিলার। বাড়ির মালিক যে নিরুদ্দেশ সে খবরও জানালো।

"বেশী কিছু নিয়ে যাননি তিনি, স্যার। রাত কাটাবার জন্যে কিছু জিনিসপত্র, আর খোলা সিন্দুক থেকে হয়তো কিছু টাকা।...আমি সাফ-সুফ করে রাখতে পারি সব, যদি চান তো তিনি ফিরে আসতে পারেন।"

"না, ফিরবেন না তিনি," ওয়েরউলফ জানায়, "তুমি ফোন করবার আগের মুহূর্তেই তো আমি তাঁর টেলিফোন রেখে দিলাম। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমান-বন্দর থেকে ফোন করেছিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে মাদ্রিদের ফ্লাইট ধর-ছেন। সেখান থেকে আজ সন্ধ্যাতেই বুয়েনস আয়ার্স..."

"কিন্তু তার দরকার কি?" ম্যাকেনসেন আপত্তি করে ওঠে, "মিলারকে আমি কথা বলতে বাধ্য করাবো, জেনে নেবো কাগজগুলো কোথায়। গাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তো কোন ব্রিফকেস নেই, ওর কাছেও না। শুধু মেঝেতে একটা ডায়রি মতন পড়ে আছে। বাকি কাগজগুলো নিশ্চয়ই কাছেভিতে কোথায় রেখে এসেছে।"

"না, বহু দূরে," ওয়েরউলফ বলে, "কোন একটা ডাকবাক্সের ভেতরে।"

ক্লান্ত বিষণ্ণ সুরে ওয়েরউলফ ওকে জানিয়ে দেয় মিলার জালিয়াতটার কাছ থেকে কি জিনিস চুরি করেছিলো, আর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ফোন করে রশম্যান তাকে কি বলেছে। "ওই কাগজগুলো কাল সকালের মধ্যেই বা

কুজোর মঙ্গলবার নাগাদ কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়ে পৌঁছবে। তার পর থেকে ওই তালিকায় যাদের নাম আছে তারা সকলেই যে-কোন মুহূর্তে পুলিসের হাতে ধরা পড়তে পারে। ওর মধ্যে আছে, তুমি এখন যে বাড়ি থেকে কথা বলছো তার মালিক রশম্যানের নাম, আমার নাম এবং আরো অনেকের নাম। সারা সকাল ধরে আমি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়।"

"তাহলে···এখন আমরা কি করবো ?" ম্যাকেনসেন শুধায়।

"স্রেফ হারিয়ে যাও। তোমার নাম নেই, কিন্তু তালিকায় আমার নাম আছে, অতএব আমাকে পালাতে হবে। তোমার ফ্ল্যাটে ফিরে যাও যদ্দিন না আমার উত্তরাধিকারী এসে তোমার সঙ্গে সংযোগ করে। তা বাদে, সব শেষ এখন। ভালকান পালিয়ে গেছে আর ফিরবে না। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা পরিকল্পনা এখন বাতিল, যদি না আর কেউ এসে সেটাকে সামাল দিতে পারে।"

"ভালকান কি ? পরিকল্পনা কি ?"

"বলছি, এখন সবই শেষ হয়ে গেলো, বলতে আর আপত্তি কি ? রশম্যানের ছদ্মনাম ভালকান, তাকেই মিলারের হাত থেকে বাঁচানোর ভার ছিলো তোমার ওপর···" সংক্ষিপ্ত কয়েকটা বাক্যে ওয়েরউলফ ওকে ভালকান, এবং প্রকল্প সম্বন্ধে সব বুঝিয়ে দিলো। শুনে শিস দিয়ে ওঠে ম্যাকেনসেন। মিলারের অনড় দেহের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আঃ, ছোকরা দেখছি সবাইকে একেবারে হল্‌হলে করে মেরে রেখে দিয়েছে।"

ওয়েরউলফ আবার তার গাম্ভীর্য যেন খুঁজে পায়। "ওখানকার সব কিছু পরিষ্কার করে রাখো, কামেরাড, কোন চিহ্ন যেন না থাকে। সেই যে একটা আবর্জনা পরিষ্কারের দল তুমি একবার আনিয়েছিলে, মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, তাদের কোথায় পাওয়া যাবে তাও আমি জানি। এখান থেকে বেশী দূরে নয়।"

"বেশ, তাদের ডেকে এনে সব সাফ করিয়ে রেখো। আবার বলছি, কোন চিহ্ন যেন না থাকে। লোকটার বৌ আবার আজ রাত্রে ফিরে আসবে ওই বাড়িতে, সে যেন কিচ্ছু টের না পায় কি ঘটেছিলো। বুঝেছো ?"

"হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তারপরে তুমি হাওয়া হয়ে যাবে, বুঝলে?…হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ওই খচ্চর মিলার ব্যাটাকে যাবার আগে খতম করে যেও। একেবারে জন্মের মতো, বুঝেছো তো?"

ম্যাকেনসেন চোখ ছোট করে মিলারের অচৈতন্য দেহের দিকে একবার চায়, তারপর বলে, "হ্যাঁ, বেশ আনন্দ পাবো তাতে।"

"আচ্ছা, তাহলে বিদায়। সৌভাগ্য আশা করছি হে তোমার।"

ফোনটা নির্বাক হয়ে গেলো। ম্যাকেনসেন রিসিভার রেখে পকেট থেকে একটা ঠিকানার খাতা বের করে তার পাতা উল্টে গেলো। একটা নম্বর দেখে ডায়াল করলো। ওদিক থেকে সাড়া এলে নিজের পরিচয় দিয়ে লোকটাকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে কমরেডশিপের জন্যে সে আগে কোন সুকার্য করেছিলো, অতএব এবারেও আরেকবার তার সাহায্য বাঞ্ছনীয় কোথায় আসতে হবে বলে জানিয়ে দিলো যে এসে কি কি দেখতে পাবে

"গাড়ি আর তার ভেতরের লাশটাকে পাহাড়ী রাস্তা থেকে অতল খাদের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। প্রচুর পেট্রোল ঢেলে দিও, বিরাট অগ্নি কাণ্ড হয় যেন। লোকটার দেহে কোন সনাক্ত-চিহ্ন রেখে যেয়ো না পকেট হাতড়ে সব নিয়ে যেও, হাতঘড়িটা সুদ্ধু।"

"বুঝলাম," ফোনের মধ্যে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "ট্রেলার আর উইঞ্চ নিয়ে আসবো।"

"হ্যাঁ, আরেকটা কথা। বাড়িটার পড়ার ঘরে দেখবে মেঝেতে আরেকটা লাশ। রক্তমাখা কার্পেটও পাবে। সেগুলো সরিয়ে ফেলবে। গাড়ির মধ্যে নয়, বড় একটা ঠাণ্ডা হ্রদের গভীরে পতন। ভালোমত ওজন ঝুলিয়ে দেবে। কোন চিহ্ন যেন না থাকে। বুঝলে?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে। পাঁচটায় আসবো আমরা, সাতটায় চলে যাবো দিনের আলোয় ওধরনের মাল নিয়ে যেতে আমি রাজী নই।"

"বেশ," ম্যাকেনসেন বলে, "তোমরা আসার আগে কিন্তু আমি চলে যাবো। ঘাবড়িও না, যা বলে গেলাম ঠিক তাই দেখতে পাবে এখানে।"

টেলিফোন রেখে দিয়ে ডেস্ক থেকে সরে এলো। মিলারের কাছে এসে

দাঁড়িয়ে লুগার পিস্তলটাকে বের করে গুলির খোপ দেখে নেয়। নেহাতই যান্ত্রিক অভ্যাস, কোন প্রয়োজন ছিলো না, জানতো গুলি ভরাই আছে।

এক হাত দূর থেকে পিস্তলটাকে মিলারের অনড় কপালের ওপর তাক করে ধরলো। দেহটাকে উদ্দেশ্য করে শেষ খিস্তি করে ওঠে, "শালা, কাগের বাচ্চা !"

বছরের পর বছর ধরে বন্যজন্তুর জীবনযাপন করে ম্যাকেনসেন আজ পেয়েছে বুনো চিতাবাঘের অনুভূতি, নইলে ও সেই কবে খতম হয়ে যেতো। ওর অগুন্তি ইয়ারদোস্ত আর শত্রুপক্ষের চর যেখানে মর্গের টেবিল শোভা করেছে সেখানে ও এখনো জীবিত, কারণ তার ওই হিংস্রজন্তুর শ্বাপদপ্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির বলে ঠিক এই মুহূর্তে বোঁ করে ঘুরে গেলো খোলা জানলার দিকে, বন্দুক হাতে তৈরী, অথচ জানলা থেকে যে অস্পষ্ট ছায়াটুকু এসে মেঝের কার্পেটে পড়েছিলো তা কিন্তু ওর নজরেও পড়েনি। কিন্তু জানলার লোকটা নেহাতই অস্ত্রহীন।

"তুমি কোন্ বেজন্মা হে ?" চিৎকার করে ওঠে ম্যাকেনসেন। বন্দুক উঁচিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যূহের মধ্যেই নিজেকে কিন্তু ঢেকে রাখে।

লোকটা নীচু খোলা জানলাটায় দাঁড়িয়ে ছিলো। মোটরসাইকেল আরোহীর মতো পরনে কালো চামড়ার প্যান্ট আর জ্যাকেট। বাঁ হাতে হেলমেটের খাটো কানাতটা ধরে সেটাকে পেটের ওপর চেপে ধরে আছে। ম্যাকেনসেনের পায়ের কাছে শায়িত দেহটার দিকে একনজর দেখে নিয়ে তার বন্দুকের দিকে চোখ রাখলো।

নির্দোষ ভঙ্গীতে শুধু বললো, "আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।"

"কে ডেকেছে ?" হাঁক পাড়লো ম্যাকেনসেন।

"ভালকান," লোকটা বললো, "আমার কামেরাড, রশম্যান।"

ঘোঁৎ করে ঢোঁক গিলে নিয়ে ম্যাকেনসেন বন্দুক নামালো।

"ওঃ !...তা তিনি চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন ?"

"পেচ্ছাব করে ফেলেছেন তিনি। দক্ষিণ-আমেরিকার দিকে চলেছেন এখন। মতলবটা গোটাগুটি বাতিল। আর এ সবের জন্যে দায়ী এই শালা

খচ্চর রিপোর্টার।"

আবার বন্দুকের নলটা মিলারের দিকে তাক করে ধরলো।

"ওকে শেষ করে দিচ্ছো?" লোকটি শুধায়।

"নিশ্চয়ই। শালার বেজন্মার বাচ্চা আমাদের পরিকল্পনার তেশ মেরে দিয়েছে। রশম্যানকে ফাঁস করেছে, অনেক সব কাগজপত্তর পুলিসের হাওয়ালা করেছে। হারামজাদা!···তোমার নামও যদি ওই ফাইলে থাকে, কেটে পড়ো বাবা এক্ষুনি।"

"কোন্ ফাইল?"

"ওডেসা ফাইল।"

"না, আমি সে ফাইলে নেই।"

"আমিও নেই।"···ফুঁসে ওঠে ম্যাকেনসেন, "কিন্তু ওয়েরউলফ আছে, আর তার হুকুম হলো এই ব্যাটাকে খতম করে যাওয়া।"

"ওয়েরউলফ?"

ম্যাকেনসেনের মনের মধ্যে ছোট্ট একটা বিপদঘণ্টা বাজতে থাকে। তাকে একটু আগেই বলা হয়েছে যে জার্মানীতে এক ওয়েরউলফ আর সে ছাড়া আর কেউই ভালকান প্রকল্পের খবর জানে না। আর যারা জানে তারা সবাই দক্ষিণ-আমেরিকায়। ধরেই নিয়েছিলো যে আগন্তুক সেখান থেকে এসেছে কিন্তু তাহলেও তো তার ওয়েরউলফের কথা জানা উচিত।··· চোখ দুটো কুঁচকে উঠলো তার।

প্রশ্ন করলো, "তুমি বুয়েনস আয়ার্স থেকে আসছো?"

"না।"

"কোত্থেকে এসেছো তাহলে?"

"জেরুজালেম।"

ম্যাকেনসেনের আধ সেকেণ্ড লাগলো কথাটার তাৎপর্য বুঝতে। কিন্তু মরার পক্ষে আধ সেকেণ্ডই যথেষ্ট। লুগার তুলে সে গুলি ছুঁড়তে গিয়েছিলো কিন্তু তার আগেই হেলমেটের ভেতরকার ফোম রবার পুড়িয়ে ওয়াল্‌থারের গুলি ছুটলো। ৯ মিলিমিটারের প্যারাবেলাম গুলিটা একটুও গতি শ্লথ না করে ফাইবার গ্লাসের ভেতর দিয়ে অবাধে এসে ম্যাকেনসেনের বক্ষাস্থিতে

লাগলো। এমন জোর আঘাত সেই গুলির যেন খচ্চরের চাঁট। হেলমেটটা মাটিতে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো লোকটার ডান হাত থেকে নীল ধোঁয়ার কুয়াশা ছিঁড়ে আবার গুলি ছুটলো।

ম্যাকেনসেনের দেহ যেমন মস্ত তেমনি তার শরীরের শক্তি। বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও সে গুলি করতো। কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা এসে তার ডান ভুরুর দু ইঞ্চি ওপরে কপাল ফুটো করে ঢুকে গেলো। তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ম্যাকেনসেন আর তাতেই সে মারাও গেলো।

সোমবার বিকেলের দিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট জেনারেল হসপিটালের একটা প্রাইভেট ওয়ার্ডে মিলারের জ্ঞান ফিরলো। আধ ঘণ্টা চুপচাপ পড়ে থাকার পর একটু একটু করে চেতনার উন্মেষ হয়। বুঝতে পারে মাথায় পুরু ব্যাণ্ডেজ। খাটের কাছে দেখলো একটা গোল স্যুইচ। দাবিয়ে দিতেই একজন নার্স এসে হাজির। ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকার উপদেশ দিয়ে গেলো সে, কারণ ওর মাথা থেকে নাকি প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

কাজেই নীরবে শুয়ে থাকলো। ক্রমে ক্রমে মাঝ সকাল পর্যন্ত গত কালের ঘটনাগুলো মনে পড়লো টুকরো টুকরো হয়ে। তারপর কিন্তু সব ফাঁকা। কয়েক বার আবার তন্দ্রা এলো। জাগলো যখন তখন বাইরে অন্ধকার আর খাটের পাশে বসে আছে একজন লোক। লোকটা ওর দিকে চেয়ে হাসলো।

মিলার তার মুখের দিকে তাকিয়েই দেখে। তারপর বলে, "আপনাকে তো আমি চিনি না।"

"হোক, আমি আপনাকে চিনি।"

মিলার ভাবে। ভাবতেই থাকে। অল্প অল্প স্ফুট-অস্ফুট ভাবনা মিলে-মিশে একাকার। অবশেষে বলে ওঠে, "হ্যাঁ, আপনাকে আমি দেখেছি। অস্টারের বাড়িতে, লিওঁ আর মোট্টির সঙ্গে।"

"ঠিক। আর কি মনে পড়ছে?"

"প্রায় সবকিছুই। স্মৃতি ফিরে আসছে।"

"রশম্যান?"

"হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পুলিসকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

"রশম্যান পালিয়ে গেছে। দক্ষিণ-আমেরিকায়। সবকিছু এখন শেষ। কাহিনী সমাপ্ত।···বুঝতে পারছেন?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে মিলার। "না, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বিরাট কাহিনী পেয়েছি আমি। লিখবো এখন।"

সাক্ষাৎপ্রার্থীটির মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো। ঝুঁকে পড়লো সে। "শুনুন, হের মিলার। আপনি নিতান্তই অ্যামেচার, বেঁচে যে আছেন সেটা আপনার ভাগ্য। কিচ্ছু লিখতে যাবেন না আপনি। তার একটা কারণ হলো যে লেখবার মতো কিছুই নেই আপনার। টউবেরের ডায়রি আমি পেয়েছি, সেটা আমি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, কারণ সেখানেই ওটাকে মানায়। কাল রাতে আমি সেটা পড়েওছি। আপনার জ্যাকেটের পকেটে একজন আর্মি ক্যাপ্টেনের ফটো পেয়েছি। আপনার···বাবা,—না?"

মাথা নাড়লো মিলার।

"তাহলে ওটাই কারণ। তাই না?" ইস্রায়েলের চরটি প্রশ্ন করলো।

"হুঁ।"

"ওঃ!···যাক, আমি কিন্তু দুঃখিত। মানে, আপনার বাবার সম্বন্ধে। ভাবিনি যে কোন জার্মান সম্বন্ধে এই কথাটা আমি কোনদিন বলবো।··· হ্যাঁ, এখন ফাইলের ব্যাপারটা কি বলুন তো? ওটা কি বস্তু?"

মিলার ওকে আনুপূর্বিক বলে গেলো।

"যাচ্চলে, তাহলে আমাদের হাতে দিলেন না কেন? আপনি সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ। এত কষ্ট করে আপনাকে ওখানে ঢোকালাম আমরা, আর যেই কিছু পেলেন সোজা নিজের লোকদের হাতে তুলে দিলেন। ওই খবরগুলো আমরা কত কাজে লাগাতে পারতাম।"

"কারো না কারো কাছে তো ওগুলো পাঠাতে হতো, সিগির মাধ্যমে। তার মানে, ডাক মারফত। আপনারা আবার এত চালাক যে লিওঁর ঠিকানাটা পর্যন্ত আমাকে দেননি।"

জোসেফ মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে।···তা যাক, আপনার কিন্তু কোন কাহিনী নেই বলবার মতো। কোন প্রমাণই নেই। ডায়রিটা চলে

গেছে, ফাইল গেছে। শুধু আপনার মুখের কথাই রইলো তো। কেউ বিশ্বাস করবে না এদেশে, এক ওডেসা ছাড়া। আর তারা আবার তাহলে আপনার পেছনে লাগবে। হয়তো সিগি বা আপনার মা, তাঁরাই হয়ে উঠবেন তাদের লক্ষ্যবস্তু। জানেন তো ওরা কি নির্মম ?"

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে মিলার। "আমার গাড়ি কোথায় ?"

"ওঃ ! ভুলে গিয়েছিলাম আপনি খবরটা জানেন না।"

গাড়িতে বোমা বসানোর কথাটা বললো জোসেফ। কেমন করে সেটা ধসে গিয়েছিলো, সেই খবরও দিলো।

"বললাম যে ওরা ভীষণ নির্মম, বদমায়েশের ঘুঘু একেকটা। গাড়িটাকে খাদের মধ্যে পাওয়া গেছে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়। আরোহীর দেহ সনাক্ত করা যায়নি, তবে আপনার নয়। আপনার কাহিনী হলো যে জনৈক ব্যক্তির অনুরোধে আপনি তাকে লিফট দিয়েছিলেন, সে আপনাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে আপনার গাড়ি নিয়ে পালায়। হাসপাতালের এঁরা স্বীকার করবেন যে একজন মোটরসাইকেল আরোহী রাস্তার ধারে আপনাকে পড়ে থাকতে দেখে অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলো। আমাকে অবশ্য তাঁরা চিনতে পারবেন না ; তখন আমার মাথায় ছিলো হেলমেট, চোখে গগল্‌স্। সরকারী বিবৃতি এইটেই এবং এইটেই টিঁকে থাকবে। পাকাপাকি বন্দোবস্ত যাতে হয় সেজন্যে আমি ঘণ্টা দুই আগে জার্মান প্রেস এজেন্সিকে টেলিফোন করি, ভাব দেখাই যেন আমি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ, এই একই কাহিনী তাদের বিবৃত করেছি। বলেছি যে আপনি অজ্ঞাত কোন হিচহাইকার কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন, দুর্বৃত্তটি আপনার গাড়ি নিয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন দুর্ঘটনায় পড়ে গাড়িসুদ্ধ ধ্বংস হয়ে গেছে।"

জোসেফ উঠে দাঁড়ালো, যাবার জন্যে তৈরি। মিলারের দিকে চোখ নামিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার দারুণ ভাগ্য। আপনার বান্ধবীর কাছ থেকে, বোধহয় আপনারই নির্দেশমতো, খবরটা যখন পাই তখন বেলা দুপুর। উন্মত্তের মতো মোটরসাইকেল ছুটিয়ে মুনিখ থেকে ওই পাহাড়ী টিলার বাড়িটায় আসি। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পৌঁছই, আড়াই ঘণ্টায়। কাঁটায় কাঁটায়ই

ঠিক কথা, কারণ কাঁটার এক চুল এদিক-ওদিক হলে আপনি মরতেন। এক ব্যাটা বন্দুক উঁচিয়ে আপনাকে গুলি করতে যাচ্ছে, আমি পৌঁছলাম।”

ঘুরে গিয়ে দোরের হাতলে হাত রাখে।

“আমার একটা কথা মানুন। গাড়ির ওপর ইন্সিওরেন্স দাবি করুন, একটা ফোকসওয়াগেন কিনুন, হাম্বুর্গে ফিরে যান, সিগিকে বিয়ে করুন, ছেলেপিলে হোক, সাংবাদিকতার পেশায় লেগে থাকুন। পেশাদারদের সঙ্গে কখনো বাজিমাত করতে যাবেন না।”

জোসেফ চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরে নার্স ফিরে এলো। “আপনার জন্যে একটা টেলিফোন এসেছে।”

সিগির ফোন। শুধু কান্না আর হাসি, হাসি আর কান্না, দমকে দমকে। অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি তাকে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে পিটার ফ্রাঙ্কফুর্ট জেনারেল হসপিটালে আছে।

“এক্ষুনি রওনা হচ্ছি, এই মুহূর্তে।” টেলিফোন রেখে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা বাজলো।

“মিলার? আমি হফম্যান বলছি। এক্ষুনি সংবাদপ্রচারবার্তার টেপে দেখলাম যে তোমার মাথায় চোট লেগেছে? ভালো আছো তো?”

“ভালো আছি, হের হফম্যান,” মিলার জানায়।

“বাঃ! কদ্দিনে সেরে উঠছো?”

“কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবো। কেন?”

“জবর খবর আছে, তুমি ঠিক পারবে। বুঝলে, জার্মানীর কিছু বড়-লোকের দুলালী স্কি করতে গিয়ে হামেশা সুদর্শন তরুণ স্কি-শিক্ষকদের দিয়ে পেট বাঁধিয়ে ফেলছে। ব্যাভেরিয়ায় একটা ক্লিনিক আছে তাদের মুক্ত করে দেয়—বেশ মোটা ফি, বাপের কাছে একটি কথাও নয়। মনে হচ্ছে তরুণ ষাঁড়গুলোর সঙ্গে ক্লিনিকের একটা রফা আছে, বেশ খানিকটা ভাগ তারাও পায়। উত্তেজনাভরা কাহিনী হে—বরফে ব্যভিচার কিংবা আবার ল্যাঙে অনাচার। কবে আরম্ভ করতে পারো?”

মিলার ভেবে নেয়। “পরের সপ্তাহে।”

“বাঃ, খাসা! হ্যাঁ, শোনো, ওই যে তোমার ওই নাৎসী-শিকার, তাতে

পেলে কিছু ? লোকটাকে খুঁজে পেয়েছিলে? কোন কাহিনীটাহিনী আছে ?”

“না, হের হফম্যান,” আস্তে কথা বলে মিলার, “কোন কাহিনীই নেই।”

“নেই ?···আচ্ছা, ঠিক আছে। হাম্বুর্গে দেখা হবে আবার।”

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে জোসেফের বিমান লণ্ডন হয়ে তেল আভিভের লদ বিমানবন্দরে যখন পৌঁছলো তখন মঙ্গলবারের সন্ধ্যা। সবে গোধুলি নেমেছে। গাড়িতে করে দুজন লোক এসে ওকে তুলে নিয়ে গেলো হেড-কোয়ার্টারে। কর্নেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো যিনি করমর‍্যাণ্ট থেকে কেব্‌ল্‌টা পাঠিয়েছিলেন। প্রায় রাত দুটো বেজে গেলো আলোচনা শেষ হতে হতে; স্টেনোগ্রাফার সবকিছু লিখে নিলো। কাজ শেষ হলে কর্নেল পিঠ এলিয়ে বসলেন আয়েস করে। চরটিকে একটি সিগারেটও দিলেন।

বললেন, “ভালোই কাজ করেছো। আমরাও কারখানাটা পরীক্ষা করে দেখে কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—বেনামে অবশ্য। গবেষণা বিভাগটা উঠিয়ে দেওয়া হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষ যদি নাও দেন তো আমরা দেবো। তবে ওরা দেবে। বৈজ্ঞানিকেরা জানতো না কাদের হয়ে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ করবো, বেশীর ভাগই রাজী হয়ে যাবে তাদের গবেষণার ফলাফল নষ্ট করে ফেলতে। কারণ তারা জানে কাহিনীটি যদি প্রচার হয়ে যায়, জার্মানীতে আজ জনমত ইস্রায়েলের সপক্ষে। অন্যান্য শিল্প-উদ্যোগে তারা কাজ পেয়ে যাবে, মুখ বন্ধ রাখবে। বনও মুখ খুলবে না, আমরাও না। মিলারের খবর কি ?”

“সেও মুখ খুলবে না। কিন্তু রকেটগুলোর কি হচ্ছে ?”

নাক-মুখ দিয়ে কর্নেল খানিকটা ধুঁয়ো ছাড়লেন। বাইরের দিকে চেয়ে নিশাকাশে তারার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

“আমার মনে হয় ওগুলো আর উড়বে না। অন্তত ৬৭-র গ্রীষ্মকালের মধ্যে নাসেরকে তৈরি হতেই হবে। ভালকান কারখানার গবেষণাকর্ম যদি বন্ধ হয়ে যায় তো অন্য একটা কেন্দ্র স্থাপনা করে রকেটগুলোর গাইডেন্স সিস্টেম বানানো ৬৭-র গ্রীষ্মের আগে কিছুতেই সম্ভব নয়।”

“তবে তো বিপদ কেটেই গেছে।”

কর্নেল হাসলেন। "বিপদ কখনো কাটে না। শুধু রূপ বদলায়। হয়তো এই বিশেষ বিপদটি কেটেছে, কিন্তু বড়গুলো এখনো আছে। হয়তো আমাদের আবার যুদ্ধে নামতে হতে পারে, সেটা শেষ হলে আবার।…যাক, তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। বাড়ি যাও এখন।"

দেরাজ খুলে তিনি কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ এগিয়ে দিলেন। লোকটিও ততক্ষণে টেবিলের ওপরে তার জাল জার্মান ছাড়পত্র, টাকাকড়ি, মনিব্যাগ, চাবির গোছা সব রেখে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পোশাক ছেড়ে নিলো। জার্মান পোশাকগুলো উর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে জিম্মা করে গেলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্নেল সস্মিত মুখে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে বললেন, "দেশে তুমি স্বাগত, মেজর উরি বেন শউল।"

নিজের বেশভূষায় নিজের পরিচয়ে ফিরে এসে খুব স্বস্তি পায় মেজর। ১৯৪৭-এ ইস্রায়েলে এসে পালমাখে ঢুকে এই পরিচয় প্রথম গ্রহণ করেছিলো, এইটাই আজ তার নিজস্ব পরিচয়।

ট্যাক্সি নিয়ে শহরতলীতে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলো। এইমাত্র তার যে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ছিলো ফ্ল্যাটের চাবি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার শয়নকক্ষে স্ত্রী রিভকার ঘুমন্ত দেহটা ছায়া-ছায়া দেখা যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা কম্বলটা উঠছে নামছে। বাচ্চাদের ঘরে উঁকি মেরে এলো। ওরা ঘুমোচ্ছে, ওর দুই ছেলে, ছ বছরের শ্লমো আর দু বছরের দভ।

বৌয়ের পাশে গিয়ে বিছানায় ঢুকতে ভীষণ ইচ্ছা করছিলো। কয়েকদিন ধরে ঘুমোবে। কিন্তু এখনো একটা কাজ বাকি। হাতের বাক্সটা রেখে দিয়ে চুপচাপ পোশাক ছাড়লো। অন্তর্বাস এবং মোজা ছেড়ে ফেলে কাপড়ের আলমারি খুলে ধোওয়াগুলো পরলো। ইউনিফর্মের ধোওয়া প্যাণ্ট পরে নিয়ে কালো চকচকে বুটের ফিতে বাঁধে। খাকী শার্ট আর টাই বেঁধে নিয়ে তার ওপর ব্যাটল-জ্যাকেট পরে নেয়। তার একদিকে শোভা পাচ্ছে প্যারাট্রুপ অফিসারের ইস্পাত-চকচকে পাখা আর পাঁচটা লড়াইয়ের রিবন—সিনাই এবং সীমান্তের অপর পারের যুদ্ধের স্মারক।

সবশেষে মাথায় চাপালো লাল বেরেট। পোশাক পরা তার এখনকার

মতো শেষ। একটা ব্যাগে কিছু জিনিস পুরে নিলো। বাইরে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে যখন উঠলো তখন পুব আকাশে সামান্য রুপোলী রেখা।

ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ হয়ে গেছে সেদিন। শীতের মাস শেষ হতে মোটে তিনদিন বাকি। তবু মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে, সুন্দর বসন্তের পথ যেন আকাশে বাতাসে।

তেল আভিভের পুবদিক ধরে গাড়ি চালিয়ে জেরুজালেমের রাস্তায় এসে পড়লো। উষার শান্তসমাহিত এই ক্ষণটুকু তার বড় ভালো লাগে, চারদিকে কেমন অদ্ভুত শান্তি আর পরিচ্ছন্নতা। মরুভূমিতে পাহারা দিতে দিতে কতবার এরকম ব্রাহ্মমুহূর্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে; কতবার কত অরুণোদয় দেখেছে; মৃদু সমীরে স্নিগ্ধ হয়ে গেছে দেহ; ভয়াবহ জ্বালাময় তাপের সূচনাও নেই, না হানাহানি ঈর্ষাদ্বেষ মৃত্যুর। দিনের মধ্যে এইটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠক্ষণ।

দু ধারে সমতল উর্বর ভূমি, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে জুডিয়ার গৈরিক পাহাড়ের দিকে। রামলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো গ্রামখানা জাগছে। রামলের পরে সেইসব দিনে ছিলো লাক্রন সেলায়েন্ত ঘুরে একটা বাঁক, জর্ডানের সৈন্যবাহিনীকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। মাইল পাঁচেকেরও বেশী ঘুরতে হতো সেই রাস্তা দিয়ে।···বাঁদিকে দেখতে পেলো আরব লিজিয়নের জন্যে প্রাতরাশের যোগাড় হচ্ছে। নীল ধোঁয়ায় নরম পালক ছড়াচ্ছে বাতাসে।

জেরুজালেমের শেষগিরি যখন অতিক্রম করলো, তখন আবু গশ গ্রামে অল্প কয়েকজন আরব শুধু ঘুম ভেঙে উঠেছে। সূর্য এখন পূর্ব দিগন্ত ছাড়িয়ে দ্বিধাবিভক্ত শহরটির আরব অংশের পর্বতশীর্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তার গন্তব্যস্থল ছিলো ইয়াদ ভাশেমের সমাধিমন্দির। গাড়িটাকে প্রায় সিকি মাইল দূরে রেখে বাকি পথটুকু হেঁটেই গেলো। রাস্তার দু ধারে উঁচু-উঁচু গাছ, যারা বানাতে সাহায্য করেছিলো। সেই ভিন্নধর্মী লোকদের স্মৃতিতে রোপিত। বিশাল সিংহদ্বারে এসে পৌঁছলো, ঝকঝকে পেতলের তৈরি। ষাট লক্ষ ইহুদী মৃত্যুকে বরণ করেছিলো। পবিত্রভূমিতে ধর্মের এই কীর্তি স্থাপনা করতে।

বৃদ্ধ দ্বারী তাকে জানালো যে এখনো সময় হয়নি খোলবার। কিন্তু যখন বোঝালো কি চায় সে, আর আপত্তি করলো না। স্মৃতিগৃহের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দু ধারে চেয়ে চেয়ে দেখলো। পরিবার-পরিজনদের জন্যে আগেও প্রার্থনা জানাতে এসেছে এখানে, কিন্তু এই ঘরের বিরাট বিরাট গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালগুলো তাকে সব সময়েই অভিভূত করে।

রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেলো। ধূসর পাথুরে মেঝেতে কালো কালো অক্ষরে লেখা নামগুলোর দিকে চেয়ে দেখে। হিব্রু এবং রোমান, দুরকম অক্ষরই রয়েছে। বেদীতে আলো নেই, কিন্তু অনির্বাণ দীপশিখাটি কৃষ্ণপাত্র থেকে তখনো সমুত্থিত।

সেই আলোয় মেঝের ওপরে লেখা নামগুলো নজরে পড়ছে। অজস্র নাম: অউসউইৎস, ত্রেব্লিঙ্কা, বেলসেন, র‍্যাভেনসব্রুখ, বুখেনওয়াল্ড··· সংখ্যাতীত। অবশেষে পেলো যা খুঁজছিলো। রিগা।

মাথায় ইয়ারমুলকা ঢাকবার প্রয়োজন ছিলো না, কারণ তার মাথায় রয়েছে লাল বেরেট। সেটাই যথেষ্ট। ব্যাগ থেকে পাড়-বসানো একটা রেশমী শাল বের করলো,—ট্যালিথ। আলটনার বৃদ্ধ লোকটির জিনিস-পত্রের মধ্যেও এই রকম একটা শাল দেখেছিলো মিলার, কিন্তু সেটা কি বস্তু বুঝতে পারেনি। কাঁধে জড়িয়ে নিলো ট্যালিথ।

ব্যাগ থেকে প্রার্থনাপুস্তক বের করে এনে ঠিক জায়গামতন খুললো। পেতলের রেলিঙের কাছে গিয়ে এক হাতে রেলিঙটাকে আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে প্রার্থনাপুস্তক নিয়ে, শাশ্বত দীপের জাজ্বল্যমান শিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পাঁচ হাজার বছরেরও পুরনো স্তোত্র থেকে আবৃত্তি করলো:

'ইসগাদ্দাল
ভেয়িসকাদ্দাস
শেমেয় রাব্বাহ্···'

এইভাবে তার মৃত্যুর একুশ বছর পরে, ইস্রায়েল সৈন্যবাহিনীর একজন মেজর, প্রতিশ্রুত ভূমির পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, সলোমন টউবেরের আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্দিশ পাঠ করলো।